

CHETANA LAHAR - Bengali Magazine of DAFODWAM  
(Democratic Action Forum Of Dalits, Women & Minorities.)

# চেতনা

একটি ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা

- অবহেলা যতদিন, সংরক্ষণ ততদিন
- শ্রেণী সংগ্রাম-শ্রেণী ঐক্য বজায় রেখে এস.সি., এস.টি. ও.বি.সি., সংখ্যালঘু, মহিলাদের অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলুন
- সাম্রাজ্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত করুন
- উন্নয়নের বাহনায় অমানবিক উচ্ছেদ বন্ধ হোক
- বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ঘটান

DAFODWAM thinks that India is a de facto upper caste Hindu state and Brahminism derived from MANU SANGHITA is still the guiding philosophy of the Indian ruling classes. Until the abolition of the caste system and discrimination based on gender and community there is no chance of the victory of class struggle in whatever form.

Beside taking programmes of rights of Dalits, Women and Minorities (Religious and Linguistics) DAFODWAM is in the area of publication of books on concerned subjects in different languages without support from any foreign / Government(s) fund.

For Correspondence :

ananta acharya  
DAFODWAM  
30/2, N. P. Road, Kolkata - 700 055  
West Bengal, India  
Ph : (0) 9331858854

E-mail : dafodwam.dafodwam@gmail.com  
chetanalahar@rediffmail.com

Exchange Price : 125/-

Edited and Published by ananta acharya on behalf of DAFODWAM  
30/2, N. P. Road, Kolkata - 700 055, and Printed at Saakhhar Madhan - 4, D.P.S. Rd., Kolkata - 700 033



Karl Marx  
1818 - 1883



Jyoti Ba Phule  
1827 - 1890



Rokeya  
1880 - 1932



Periyar  
1897 - 1973



B. R. Ambedkar  
1891 - 1956



Bhagat Singh  
1907 - 1931

বর্ষ - ৫ • মুখ্য সংখ্যা - জানুয়ারী ২০১৫ - জুন ২০১৫

# চেতনা

## সম্পাদকীয়

### স্বপ্ন বেচো না

আমরা ভালো নেই। এই সময়ে “আছে দিন” আসার সম্ভাবনা অতি আশাবাদীরাও দেখছেন না। আর্থ রক্তের মিথ্যা অহমিকা প্রচার করে গত শতাব্দীর যে স্বৈরাচারী শক্তি সারা পৃথিবীতে তাম্বু চালায়েছিল, তাদের ভারতীয় মানস সন্তানদের রমরমা এখন। জাতিয়তাবাদ (ন্যাসনালিজম) ও সমাজবাদ (সোস্যালিজম)-এর জয়গান গেয়ে নাৎসীবাদ পৃথিবীর এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্তরের মুখ্য আতঙ্কবাদীদের জন্ম দিয়েছিল। বর্ষ হিন্দু জাতিয়তাবাদ ও সমাজবাদের নামে উন্নয়নের বাক চাতুরী আজ ভারতীয় নাৎসীদের ক্ষমতা দখলের চাবিকাঠি। অপরদিকে দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষ প্রতিদিন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, সর্বোপরি মর্যাদা হারাচ্ছেন, প্রান্তবাসীদের আন্দোলনে যাদের থাকার কথা সেই মার্কসবাদী, আন্দোলনবাদী, পেরিয়ারবাদী এমনকি সংখ্যালঘু সমাজের নেতৃগণ নিজেদের দায়িত্ব পালনে সংগত কারণেই ব্যর্থ হচ্ছেন।

আমরা যারা অতি ক্ষুদ্র পরিসরে সেতুবন্ধে কাঠবেড়ালের কাজ করছি তাদের হতাশ করা সহজ নয়। সরকারী মার্কসবাদীরা “শ্রেনীসংগ্রামের নমঃ” উচ্চারণ করতে করতে একদিন শ্রেনীসংগ্রামই ভুলে যাবে—এ আমরা জানি। আন্দোলনবাদীদের ক্ষমতা লিপ্সু অংশ মনুবাদীদের লেজুরবৃত্তি করবে তা আমরা জানি। জাত ভেদ ব্যবস্থা, বর্ষ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্য না পেলে সমাজ বিবর্তনের মৌলিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অল্পজনের কুশাসন বহুজনের নিগ্রাহীনতার কারণ ঘটায়। বর্ষব্যবস্থা ( ) ও বর্গব্যবস্থা ( ) উচ্ছেদের সংগ্রাম একই সাথে চালানো যায়। এই স্বপ্নই আমাদের পাথেয়। ‘আলু’ ‘পটল’ বেচা যায় ‘স্বপ্ন’ বেচা যায় না।

한글서체: 12pt, 14pt, 16pt, 18pt, 20pt, 22pt, 24pt, 26pt, 28pt, 30pt, 32pt, 34pt, 36pt, 38pt, 40pt, 42pt, 44pt, 46pt, 48pt, 50pt, 52pt, 54pt, 56pt, 58pt, 60pt, 62pt, 64pt, 66pt, 68pt, 70pt, 72pt, 74pt, 76pt, 78pt, 80pt, 82pt, 84pt, 86pt, 88pt, 90pt, 92pt, 94pt, 96pt, 98pt, 100pt, 102pt, 104pt, 106pt, 108pt, 110pt, 112pt, 114pt, 116pt, 118pt, 120pt, 122pt, 124pt, 126pt, 128pt, 130pt, 132pt, 134pt, 136pt, 138pt, 140pt, 142pt, 144pt, 146pt, 148pt, 150pt, 152pt, 154pt, 156pt, 158pt, 160pt, 162pt, 164pt, 166pt, 168pt, 170pt, 172pt, 174pt, 176pt, 178pt, 180pt, 182pt, 184pt, 186pt, 188pt, 190pt, 192pt, 194pt, 196pt, 198pt, 200pt, 202pt, 204pt, 206pt, 208pt, 210pt, 212pt, 214pt, 216pt, 218pt, 220pt, 222pt, 224pt, 226pt, 228pt, 230pt, 232pt, 234pt, 236pt, 238pt, 240pt, 242pt, 244pt, 246pt, 248pt, 250pt, 252pt, 254pt, 256pt, 258pt, 260pt, 262pt, 264pt, 266pt, 268pt, 270pt, 272pt, 274pt, 276pt, 278pt, 280pt, 282pt, 284pt, 286pt, 288pt, 290pt, 292pt, 294pt, 296pt, 298pt, 300pt, 302pt, 304pt, 306pt, 308pt, 310pt, 312pt, 314pt, 316pt, 318pt, 320pt, 322pt, 324pt, 326pt, 328pt, 330pt, 332pt, 334pt, 336pt, 338pt, 340pt, 342pt, 344pt, 346pt, 348pt, 350pt, 352pt, 354pt, 356pt, 358pt, 360pt, 362pt, 364pt, 366pt, 368pt, 370pt, 372pt, 374pt, 376pt, 378pt, 380pt, 382pt, 384pt, 386pt, 388pt, 390pt, 392pt, 394pt, 396pt, 398pt, 400pt, 402pt, 404pt, 406pt, 408pt, 410pt, 412pt, 414pt, 416pt, 418pt, 420pt, 422pt, 424pt, 426pt, 428pt, 430pt, 432pt, 434pt, 436pt, 438pt, 440pt, 442pt, 444pt, 446pt, 448pt, 450pt, 452pt, 454pt, 456pt, 458pt, 460pt, 462pt, 464pt, 466pt, 468pt, 470pt, 472pt, 474pt, 476pt, 478pt, 480pt, 482pt, 484pt, 486pt, 488pt, 490pt, 492pt, 494pt, 496pt, 498pt, 500pt, 502pt, 504pt, 506pt, 508pt, 510pt, 512pt, 514pt, 516pt, 518pt, 520pt, 522pt, 524pt, 526pt, 528pt, 530pt, 532pt, 534pt, 536pt, 538pt, 540pt, 542pt, 544pt, 546pt, 548pt, 550pt, 552pt, 554pt, 556pt, 558pt, 560pt, 562pt, 564pt, 566pt, 568pt, 570pt, 572pt, 574pt, 576pt, 578pt, 580pt, 582pt, 584pt, 586pt, 588pt, 590pt, 592pt, 594pt, 596pt, 598pt, 600pt, 602pt, 604pt, 606pt, 608pt, 610pt, 612pt, 614pt, 616pt, 618pt, 620pt, 622pt, 624pt, 626pt, 628pt, 630pt, 632pt, 634pt, 636pt, 638pt, 640pt, 642pt, 644pt, 646pt, 648pt, 650pt, 652pt, 654pt, 656pt, 658pt, 660pt, 662pt, 664pt, 666pt, 668pt, 670pt, 672pt, 674pt, 676pt, 678pt, 680pt, 682pt, 684pt, 686pt, 688pt, 690pt, 692pt, 694pt, 696pt, 698pt, 700pt, 702pt, 704pt, 706pt, 708pt, 710pt, 712pt, 714pt, 716pt, 718pt, 720pt, 722pt, 724pt, 726pt, 728pt, 730pt, 732pt, 734pt, 736pt, 738pt, 740pt, 742pt, 744pt, 746pt, 748pt, 750pt, 752pt, 754pt, 756pt, 758pt, 760pt, 762pt, 764pt, 766pt, 768pt, 770pt, 772pt, 774pt, 776pt, 778pt, 780pt, 782pt, 784pt, 786pt, 788pt, 790pt, 792pt, 794pt, 796pt, 798pt, 800pt, 802pt, 804pt, 806pt, 808pt, 810pt, 812pt, 814pt, 816pt, 818pt, 820pt, 822pt, 824pt, 826pt, 828pt, 830pt, 832pt, 834pt, 836pt, 838pt, 840pt, 842pt, 844pt, 846pt, 848pt, 850pt, 852pt, 854pt, 856pt, 858pt, 860pt, 862pt, 864pt, 866pt, 868pt, 870pt, 872pt, 874pt, 876pt, 878pt, 880pt, 882pt, 884pt, 886pt, 888pt, 890pt, 892pt, 894pt, 896pt, 898pt, 900pt, 902pt, 904pt, 906pt, 908pt, 910pt, 912pt, 914pt, 916pt, 918pt, 920pt, 922pt, 924pt, 926pt, 928pt, 930pt, 932pt, 934pt, 936pt, 938pt, 940pt, 942pt, 944pt, 946pt, 948pt, 950pt, 952pt, 954pt, 956pt, 958pt, 960pt, 962pt, 964pt, 966pt, 968pt, 970pt, 972pt, 974pt, 976pt, 978pt, 980pt, 982pt, 984pt, 986pt, 988pt, 990pt, 992pt, 994pt, 996pt, 998pt, 1000pt, 1002pt, 1004pt, 1006pt, 1008pt, 1010pt, 1012pt, 1014pt, 1016pt, 1018pt, 1020pt, 1022pt, 1024pt, 1026pt, 1028pt, 1030pt, 1032pt, 1034pt, 1036pt, 1038pt, 1040pt, 1042pt, 1044pt, 1046pt, 1048pt, 1050pt, 1052pt, 1054pt, 1056pt, 1058pt, 1060pt, 1062pt, 1064pt, 1066pt, 1068pt, 1070pt, 1072pt, 1074pt, 1076pt, 1078pt, 1080pt, 1082pt, 1084pt, 1086pt, 1088pt, 1090pt, 1092pt, 1094pt, 1096pt, 1098pt, 1100pt, 1102pt, 1104pt, 1106pt, 1108pt, 1110pt, 1112pt, 1114pt, 1116pt, 1118pt, 1120pt, 1122pt, 1124pt, 1126pt, 1128pt, 1130pt, 1132pt, 1134pt, 1136pt, 1138pt, 1140pt, 1142pt, 1144pt, 1146pt, 1148pt, 1150pt, 1152pt, 1154pt, 1156pt, 1158pt, 1160pt, 1162pt, 1164pt, 1166pt, 1168pt, 1170pt, 1172pt, 1174pt, 1176pt, 1178pt, 1180pt, 1182pt, 1184pt, 1186pt, 1188pt, 1190pt, 1192pt, 1194pt, 1196pt, 1198pt, 1200pt, 1202pt, 1204pt, 1206pt, 1208pt, 1210pt, 1212pt, 1214pt, 1216pt, 1218pt, 1220pt, 1222pt, 1224pt, 1226pt, 1228pt, 1230pt, 1232pt, 1234pt, 1236pt, 1238pt, 1240pt, 1242pt, 1244pt, 1246pt, 1248pt, 1250pt, 1252pt, 1254pt, 1256pt, 1258pt, 1260pt, 1262pt, 1264pt, 1266pt, 1268pt, 1270pt, 1272pt, 1274pt, 1276pt, 1278pt, 1280pt, 1282pt, 1284pt, 1286pt, 1288pt, 1290pt, 1292pt, 1294pt, 1296pt, 1298pt, 1300pt, 1302pt, 1304pt, 1306pt, 1308pt, 1310pt, 1312pt, 1314pt, 1316pt, 1318pt, 1320pt, 1322pt, 1324pt, 1326pt, 1328pt, 1330pt, 1332pt,

ସଂଖ୍ୟା ୫୫୮, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧

• ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

ডা.রা.জি.য়ের পড়াশোনা—রানকুং ভট্টাচার্য—৬৪

এবীলনাথকে হাইজ্যাক করতে চাইছে বর্ণাক্ত সংঘ—আশীষ নাহিতী—৭২

শাশিমাণ্ডের দলিত সমস্যা সমাধান কোন পথে?—মনোরঞ্জন ব্যাপারী—৮৩

૧૨૫૧ 'શાહુજી' નામ

শ্রীচীন ভারতে বাস্তবেই সব ছিল নরেন্দ্র মোদীর বিজ্ঞান চর্চা—গুরুপ্রদান কর—১০১

মোদি সরকারের 'আজ্ঞা দিন' বৃহৎ মানিকমের জন্য পৌষমান, কিন্তু জনগণের জন্য

ଅର୍ଦ୍ଧନାଶ—ଅନାଶ ବ୍ରାହ୍ମ—୧୦୮

আমেরিকার বিবেকানন্দ : একটি ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা—কবিজ চৌধুরী—১১৬

‘নিম্নকরণ’ কলিত ইতিহাসে বাংলার ‘নমঃশূন্যের’ প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নক্ষপাতিদের

ଅଭିଯୋଗ—ମୁନିଞ୍ଜ କୁମାର ସ୍ବାୟ—୧୫୮

রেনেসাঁস ও বাংলার মুসলমান সমাজ—শক্তিসাফন মুহোপাধ্যায়—১৭০

পরিচয়ের সংকট পরিচয়ের রাজনীতি—অর্কপ্রভ সান্যাল—১৯০

চুনি কেটিল যদি বেঁচে থাকতো—সোমনাথ ভট্টাচার্য—১৯৭

বাংলা ভাষার শব্দ-মিত্র—সমুদ্র বিশ্বাস—২০২

**गद्य :**

ଆନିବାସୀ ରମଣୀ ତୁମି—ପ୍ରତିଭା ସଂଗ୍ରହ—୨୭୭

କାଳୋର ଧାତୁ ଗୁହ-ପ୍ରାଦେଶ—ମୁଖ୍ୟାଳୟର ବିଭାଗ—୨୫୮

कविता :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার—উৎপাদন বিভাগ—২৫৩

শাসনে, পরিবর্তনে—সব্যসাচী গোস্বামী—২৫৪

লালবাড়ী—সব্যসচী গোহামী—২৫৫

শালবাসার ইস্তাহার—সব্যসাচী গোস্বামী—২৫৬

২৮।সংহিতার উদ্ভবপৰ্বে—সংগ্ৰহিণী ভারতী—২৫৮

ଏମେ ଏମେ — ଚଷ୍ଟାଶିନୀ — ୨୭୧

4. **उत्तर :**

মুগা/মেথী—হর্যবর্জ্জন চৌধুরী—২৬৩

अवधि : ३

ସୁଧାଂଶୁରାଜର ବିପଦର ଶବ୍ଦ—ଶକ୍ତିକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାମାଣିକ—୨୫୭

গাড়ির অঙ্গন থেকে পথে-ঘাটে শনিপুজার তাৎপর্য—ধীরেন্দ্রনাথ বাসু—২৮০

ଆମିନତାବାଦ ଓ ସହାୟତା—ସନୋହର ମୌଳି ବିଶ୍ୱାସ—୨୪୭

गान्धर्वनी भस्मभाय्यत्र काश्मिनी—मुशालु कुमार—२७४

১১৬৭। সঙ্গিতে মতেরা আন্দোলনের প্রভাব—জীবনকমার সরকার—৩১২

শব্দ: **আর শব্দ—অনন্ত আচার্য—৩৩০**

# ধর্মঘট

আম্বেদকর

ভাষান্তর : উৎসাহ আহমেদ

বাধ্যবাধকতার পক্ষে সমর্থনমূলক কৈফিয়ত দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী এই দেশে যে সব ধর্মঘট ঘটেছিল তার কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে শুরু করেছেন এবং এই দেশে যে সব ধর্মঘট হয়েছে তা প্রতিপাদন করার জন্য দেখিয়েছেন যে, ধর্মঘটগুলি এত ধন-ঘন হত এবং এমন ভরসার আকারে হত, যার জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলকে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন এমন দেখা দিয়েছে। ধর্মঘটের সংখ্যা, শ্রমজীবী মানুষের তার সঙ্গে জড়িত হওয়া এবং শ্রমদিবস বিনষ্ট হওয়ার সংখ্যাগুলিকে আমি পরীক্ষা করেছি এবং একথা বলতে একটুও দ্বিধা নেই যে, ধর্মঘট সংক্রান্ত সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা বলতে চেয়েছেন তা আমি বিশ্বাস করি না। বোম্বাই শহরে যে-সব ধর্মঘট হয়েছে, সেগুলির ওপর মনোনিবেশ করছি। শ্রম দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'লেবার গেজেট' পত্রিকার মার্চ সংখ্যাটি আমার কাছে এখানে আছে। এই সংখ্যার ৫৪১নং পৃষ্ঠায় বোম্বাই প্রদেশে কত ধর্মঘট হয়েছিল তার সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত, প্রথম স্তরে দেওয়া আছে শিল্পবিরোধের সংখ্যা। দ্বিতীয়ত, এতে কতজন শ্রমজীবী মানুষ জড়িত ছিল, তার সংখ্যাও প্রদত্ত হয়েছে এবং তৃতীয়ত, কত শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে তার সংখ্যাও আছে। এইসব পরিসংখ্যানের ওপর দৃষ্টি ফেলে আমি নিশ্চিত যে, যে-কোনও মানুষ নিজেই দেখতে পাবে যে, শিল্পবিরোধ বেড়ে যাওয়া দূরের কথা, প্রতি বছর ক্রমশ কমে আসছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯২১ সালে বোম্বাইতে শিল্পবিরোধ ছিল ১০৩টি, ১৯২২ সালে ১৪৩টি, ১৯২৩ সালে ১০৯টি; এবং ১৯২৪ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে সংখ্যাটি নেমে এসেছিল ৫০-এ; শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। তারপর আসুন ১৯২৮ সালে, সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়াল ১৪৪-এ। ১৯২৯ থেকে কার্যত ১৯৩৭ পর্যন্ত সংখ্যাটি ওঠা-নামা করেছিল ৮৮ থেকে ৫৩-এর মধ্যে। শিল্পে যে গুণগোল ও বিকলতা (Dislocation) ঘটে থাকতে পারে তার পরিমাপের বিচার কিন্তু ধর্মঘটের সংখ্যা দিয়ে যে মাপা যায় না, তা আমি স্বীকার করি। এখানে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া আছে তা থেকে আমি দেখতে পাই

যে এমন অনেক ঘটনা আছে, যে ক্ষেত্রে ধর্মঘটের সংখ্যা কম হলেও তুলনামূলকভাবে জর্জরিত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি এবং নষ্ট হওয়া ঘণ্টার পরিমাণও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এরপর শ্রমদিবস নষ্টের দিনের সংখ্যাকে মানদণ্ড হিসাবে নিলে, যাকে একমাত্র মানদণ্ড বলা যায়, দেখতে পাই যে সবচেয়ে খারাপ বছরটি ছিল ১৯২৮ সাল, যে বছরে ২৪০ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। দ্বিতীয় খারাপ বছরটি ছিল ১৯২৫ সাল, যখন ১১০ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। তৃতীয়টি ১৯২৯ সাল যখন ৮০ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আরও অগ্রসর হলে, ১৯২৯ সাল পার হয়ে এলে ১৯৩৪ সালের যে-সব ধর্মঘট হয় তার সংখ্যা, শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার সংখ্যা এবং জর্জরিত থাকা শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা থেকে দেখা যাবে যে, পরিস্থিতির মধ্যে ব্যস্তবিক-ই এমন কিছু ছিল না, অন্তত আমি যা দেখতে পারি, যা এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল কলা যেতে পারে, যা সরকারের যে-কোনও সদস্যকে উদ্ভিগ্ন করে তুলতে সক্ষম। একমাত্র খারাপ বছরটি ছিল ১৯৩৭ সাল। আগের বছরের তুলনায় অবশ্য কিছুই নয়। আমি জেনেছি যে, এটা ঘটার পিছনে ছিল আহমেদাবাদ নগরের ১৫ দিন ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। অতএব, আমার প্রথম নিবেদন এই যে, এর সমর্থনে সরকার বা মাননীয় ধর্মঘট। অতএব, আমার প্রথম নিবেদন এই যে, এর সমর্থনে সরকার বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমন কোনও কৈফিয়ত পেশ করেননি যা অন্তত এই সদস্যকে এবং অন্তত আমাকে প্ররোচিত করতে পারে ১৯৩৪ সালের এই আইনের শর্তাবলিতে এত বড় মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে সম্মতি দিতে যা বাধ্যতামূলক সালিশি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার জন্য এতটাই মরকারি।

বিধেয়কের অন্যান্য শর্তাবলির প্রসঙ্গে এসে যে শর্তটি আমি উল্লেখ করতে চাই, তা হল ধর্মঘট সংক্রান্ত, যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সদস্যের এই পক্ষ, বিশেষ করে যে পক্ষের আমি প্রতিনিধিত্ব করছি, সেই পক্ষ তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে, কয়েকটি পরিস্থিতিতে ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করেছে এই শর্তগুলি। যে শর্তগুলি ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করেছে সেগুলি সন্নিবেশিত আছে এট বিধেয়কের ৬২নং খণ্ডে, যা এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বণ্ড। এতে কলা হয়েছে

"৬২(১) ধর্মঘট বেআইনি হবে যদি তা শুরু হয় বা চলতে থাকে

(ক) সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে ১নং তফসিলে বর্ণিত কোনও শিল্প শ্রমিকের বিষয়ের সঙ্গে জড়িত এই ধরনের বিষয়ের সঙ্গে জড়িত স্থায়ী নির্দেশের আওতা

না থাকা অনুসারে শ্রম-কমিশনারের কাছে পেশ করা বিবরণি তার দ্বারা বা কোনও শিল্পবিরোধ সংক্রান্ত আদালতের দ্বারা মীমাংসিত হয়েছে, অনুসরণ ক্ষেত্রে, তা বা ২৬নং ধারার অধীনে এই ধরনের স্থায়ী নির্দেশ কার্যকর হবার তারিখ থেকে ৭৫ বছর সময় অতিক্রান্ত হবার আগে;

(খ) ২৮নং ধারার শর্তানুসারে নোটিস না দিয়ে;

(গ) শুধু এই কারণে যে, মালিক কোনও স্থায়ী নির্দেশের শর্ত পালন করেননি এ কোনও অবৈধ পরিবর্তন ঘটিয়েছে;

(ঘ) সেইসব ক্ষেত্রে, যেখানে ২৮নং ধারার শর্তানুসারে নোটিস দেওয়া হয়েছে এবং যেখানে এই ধরনের পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনও একমত হয়নি ৩৪ নং ধারায় উল্লিখিত মামলার বিকাশ নিবন্ধক (Registrar) কর্তৃক গৃহীত হবার আগে;

(ঙ) সেই সব ক্ষেত্রে, যেখানে ধর্মঘটের সঙ্গে জর্জরিত শিল্পবিরোধ সম্পর্কে সালিশি মামলা শুরু হয়ে গেছে, এই ধরনের মামলার সমাপ্তির আগে;

(চ) সেই সব ক্ষেত্রে, যেখানে এই বিরোধ বা এই ধরনের বিরোধ সম্পর্কে লিখিত নিবেদন (Submission) ৪৩নং ধারা অনুসারে নিবন্ধীভুক্ত (Registered) হয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ধরনের নিবেদন সম্পূর্ণভাবে নাকচ হয়; অথবা

(ছ) রোয়েদাদ (Award), মীমাংসা, নিবন্ধীভুক্ত চুক্তির শর্তাবলি উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে।

২। যে-সব ক্ষেত্রে যে-কোনও শিল্পবিরোধ সম্পর্কে সালিশি মামলা সম্পূর্ণ হয়েছে এই ধরনের বিরোধ সংক্রান্ত ধর্মঘট অবৈধ বিবেচিত হবে যদি তা এই ধরনের মামলার পরিসমাপ্তির দুই মাস অতিক্রান্ত হবার পর কোনও এক সময় শুরু হয়।"

অতঃপর, এই বণ্ডটিকে ফলাফল করার জন্য অবৈধ ধর্মঘটে প্রায় দেড় বিক্রমে এই বিধেয়কে কিছু দৃষ্টান্তের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়েছে। এই বণ্ডগুলি হল ৬৬ এবং ৬৭। বণ্ড ৬৬-তে কলা হয়েছে :

"শিল্প-আদালত কর্তৃক ঘোষিত কোনও ধর্মঘটে যোগদান করা বা ধর্মঘটী কোনও কর্মচারী দোষী সাব্যস্ত হলে, উভয় প্রকারের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে সেই সময়কালের জন্য যা ছয়মাস পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে বা জরিমানা আরোপিত বা উভয়-ই হতে পারে।"

৬৭নং খণ্ডে বলা হয়েছে :

"যদি কোনও ব্যক্তি শিল্প-আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত কোনও ধর্মঘট বা তালাবন্ধ (Lock out) করে বহিষ্কার-এ অন্যান্য অংশগ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত বা উত্তেজিত করে, সেই ধরনের ধর্মঘট বা লকআউট শুরু হয়েছে বা হয়নি, দেখা দাব্যন্ত হলে, উভয় প্রকারের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে সেই সময়-কালের জন্য যা ছয় মাস পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে বা জরিমানা আরোপিত বা উভয় প্রকারের হতে পারে।"

ব্যাখ্যা : "এই ধারার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, কোনও ধর্মঘট বা লকআউটের জন্য যদি কেউ চাঁদা দেয়, সংগ্রহ করে বা তহবিলের জন্য আবেদন জানায় তবে ধরে নেওয়া হবে যে, সে এই ধরনের ধর্মঘট বা লকআউটের প্রসারকল্পে কাজ করেছে।"

বলা হয়েছে যে, এই খণ্ডগুলি ন্যায়সঙ্গত, কারণ ধর্মঘট করার অধিকার বলতে তেমন কিছুই নেই এবং তাই শ্রমিকরা যাকে ধর্মঘটের অধিকার বলে তাঁর জন্য শাস্তিদানের ব্যাপারটা অবশ্যই নীতিশাস্ত্র বা ব্যবহারিক শাস্ত্রের নিয়মাবলির উল্লঙ্ঘন নয়। প্রথম বিচার্য বিষয়টি হবে এই বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি বণ্ডন করা এবং অগ্রাহ্য করা। এক্ষেপে যাতে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটি সুস্পষ্ট করতে পারি তার জন্য আমি কয়েকটি প্রাথমিক প্রস্তাব দিয়ে শুরু করব। প্রথমত, আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই 'ধর্মঘট' শব্দটি সত্যিই কী বুঝি আমরা? এর অর্থ কী? আমার মতে 'ধর্মঘট' পরিভাষাটির অর্থ কুন্সার চেম্বার করাটা ভালো। সাধারণ জনগণের ভাষায় 'ধর্মঘট' চাকরির চুক্তিভঙ্গ করা জুড়া আর কিছু নয়। যখন কোনও কর্মী ধর্মঘট করে, তার একটাই অর্থ হল এই যে সে চাকরির চুক্তিভঙ্গ করেছে, তার চেয়ে বেশি এতে আর কিছু বলা নেই। পরবর্তী যে প্রশ্নটি আমি উত্থাপন করতে চাই তা এই : চাকরির এই চুক্তি লঙ্ঘন করার বিষয়টির মোকাবিলা বর্তমান ভারতীয় সংবিধির আইন অনুসারে করা যায় কি? ভারতীয় আইন ধর্মঘট করার এই অধিকারকে স্বীকার করে কি করে না? এবং যদি করে, তবে কীভাবে, আর যদি শাস্তি দেয়, তবে কীভাবে শাস্তি প্রদান করে? এ ক্ষেত্রেও আবার আমি একটা প্রাথমিক প্রস্তাব দিয়ে শুরু করব এবং সেই প্রাথমিক প্রস্তাবটি হল এই যে : কোনও কার্য বা কোনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা (Omission) দেওয়ানি অপকৃত্য (Civil wrong) হতে পারে বা তা অপরাধও হতে পারে এবং প্রথম যে প্রশ্নটি আমি উত্থাপন করতে চাই—সেই

বিষয়টি সম্পর্কে আমি বিশেষ আলোচনা করতে সত্যিই ইচ্ছুক কারণ এ ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে কোনও রকম সন্দেহের অবকাশ রাখতে চাই না—প্রথম যে প্রশ্নটি উত্থাপন করছি চাকরির চুক্তিভঙ্গ করা কি দেওয়ানি অপকৃত্য (Civil wrong)? আইন এর যা উত্তর দিচ্ছে তা হল এই : হ্যাঁ, এটা একটা দেওয়ানি অপকৃত্য। এই দেওয়ানি অপকৃত্যের জন্য যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেই ক্ষুদ্র মানুষটির সুরাহার উপায় কী? এটাই হবে পরবর্তী প্রশ্ন। এ-ক্ষেত্রেও উত্তর হবে এই যে, শ্রমজীবী মানুষ কর্তৃক চুক্তিভঙ্গের ফলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিটির জন্য আইন দুটি প্রতিকারের ব্যবস্থা রেখেছে, আর সেগুলি হল ক্ষতিপূরণ এবং সুনির্দিষ্ট ত্রাপ (Specific Relief)। এক্ষেপে যদিও আইন এক বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য দুটি প্রতিকারের, যথা ক্ষতিপূরণ ও নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করে রেখেছে, তবুও যেখানে কোনও দেওয়ানি অপকৃত্য ঘটবে সেখানে একটি ব্যবস্থা আছে যা বিশেষ করে চাকরির চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন কোনও ব্যক্তি চাকরির চুক্তিভঙ্গ করে, সে-ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিটি কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে, সুনির্দিষ্ট ত্রাপের দাবি সে করতে পারে না, এবং আদালতও তাকে কোনও সাহায্য দিতে পারে না, যার দ্বারা ব্যক্তিটিকে তার পূর্ব স্বীকৃত চাকরির চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করা যায়। বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণের অধিকারী। মহাশয়, দেওয়ানি অপকৃত্য হিসাবে চাকরির চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারে এটাই বর্তমান অবস্থা। এই দেওয়ানি অপকৃত্যের জন্য মালিক ক্ষতিপূরণের বেশি আর কিছু পেতে পারে না।

চাকরির চুক্তিভঙ্গকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করলে প্রশ্ন ওঠে : এটা কি অপরাধ? চাকরির চুক্তিভঙ্গ প্রসঙ্গে ভারতীয় আইনে এ যাবৎ কী কী ব্যবস্থার কথা আছে? মহাশয়, সুস্পষ্টীকরণের স্বার্থে সদনের সামনে কীভাবে আমাদের ভারতীয় আইন এই বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা নিয়েছে তার ইতিহাসের সামান্য অংশ পেশ করা প্রয়োজন। চাকরির চুক্তিভঙ্গ সম্পর্কে ভারতীয় আইন প্রথম যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা হল ১৮৫৯ সালের ত্রয়োদশ আইন; এর নাম ছিল 'শ্রমজীবী মানুষের চুক্তিভঙ্গ আইন' (Workmen's Breach of Contract Act)। এটি গৃহীত হয় ১৮৫৯ সালে, বিদ্রোহের অনতিকাল পরেই বা বিদ্রোহ চলারকালীন। এই আইনটি কেন গৃহীত হয়েছিল, তার কারণ এর পরেই সদনকে জানাচ্ছি। এছাড়া ভারতীয় দণ্ডবিধিতে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের উল্লেখ আছে যা এই বিষয় সম্পর্কিত। যথা,

অপরাধ হিসাবে চাকরির চুক্তি-ভঙ্গ এবং ঐ ধারাগুলি হল ৪৯০, ৪৯১ এবং ৪৯২। ১৮৫৯ সালের ত্রয়োদশ আইনটির প্রয়োগ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। এটা প্রযোজ্য ছিল দক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পীদের ক্ষেত্রে। এর প্রয়োগ হত যে-ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পীরা, যারা তাদের নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে অগ্রিম নিয়েছিল এবং পরে যে দায়িত্বভার তারা গ্রহণ করেছিল তা পালনে অস্বীকার করেছিল, সে ক্ষেত্রে। এটা নির্দেশিত হত পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে। ব্রিটিশ সরকারকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যখন বিদ্রোহ চলছিল, তখন সামরিক বিভাগ বহু দক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পীদের নিয়োগ করেছিল এবং তাদের টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল এই আশায় যে, তারা যে-সব কাজ করার দায়িত্ব নিয়েছিল তা পূরণ করবে। কিন্তু ভীতির কারণেই হোক বা অন্য কোনও পরিস্থিতির কারণেই হোক, ঐ দক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পীরা তাদের নিজ-নিজ গ্রামে চলে যায় এবং অগ্রিম নেওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছিল। ঐ ধরনের ঘটনাগুলিকে এর আওতার মধ্যে আনার জন্য ১৮৫৯ সালের এই আইনটি গৃহীত হয়েছিল। চাকরির চুক্তিভঙ্গ করলে অপরাধ হিসাবে গণ্য করার জন্য এই আইনটি গৃহীত হলেও, কদাচিৎ তার প্রয়োগ হয়েছিল, তার প্রমাণ নথিভুক্ত আছে। এটা সত্যিই এমন এক আইন ছিল না যা জনগণকে শাস্তির আওতায় আনতে পারত। মহাশয়, এই আইনের পরবর্তী ইতিহাসও খুব চিত্তাকর্ষক। এই আইনটি যা ১৮৫৯ সাল থেকে এক বিধিবদ্ধ সংবিধিরাপে অটল ছিল, আমি যা আগে বলেছি, সেই মতো কখনও তা কার্যকর করা হয়নি এবং তা ১৯২০ সালের ভারত সরকারের দ্বাদশ আইনের দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল। সংশোধনী আইনটি অত্যন্ত হিতকর দুটি নীতি প্রবর্তিত করেছিল। এই আইনে একটি হিতকর নীতি বা প্রবর্তিত হয়েছিল তা হল এই যে, চাকরির চুক্তি ভঙ্গের জন্য একজন কারুশিল্পীকে শাস্তি দেবার আগে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে ভার দেওয়া হত চুক্তিটির ন্যায্যতা সম্পর্কে তদন্ত করার, যাতে ম্যাজিস্ট্রেট যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, চুক্তিটি অন্যায্য ছিল, তবে নিয়োগকর্তার কাছ থেকে অগ্রিম নেওয়া সত্ত্বেও অবাধ্য কর্মজীবীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকত না। এটাই প্রথম পরিবর্তন যা ঘটেছিল ১৯২০ সালের আইনটি প্রবর্তিত হবার ফলে। তারপর ১৯২০ সালের আইন কর্তৃক যে দ্বিতীয় হিতকর ব্যবস্থাটি অকলঙ্কিত হয়েছিল তা এই যে, অসার

খর্দাট আনার জন্য নিয়োগকর্তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেটকে, যে ব্যবস্থাটি মূল আইনে ছিল না।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারার প্রসঙ্গে যে তিনটি ধারার কথা আমি উল্লেখ করেছি তার এক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। ৪৯০ নং ধারাটি সমুদ্রযাত্রা বা যাত্রার সময়ে চাকরির চুক্তিভঙ্গ সংক্রান্ত। এর প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে। এই ধারাটি চাকরির সব রকম চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না; এটি প্রযোজ্য হত শুধুমাত্র নাবিকদের ক্ষেত্রে যারা সমুদ্র যাত্রায় বা সফরে যেত। স্পষ্টতই, নাবিকের চাকরির গোশায়ে এই ধরনের ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত জরুরি ছিল, কারণ তার অবাধ্যতা পরিষেবার ওপরই নির্ভর করত সমুদ্রযাত্রার সাফল্য ও নিরাপত্তা। অপর ধারাটি, অর্থাৎ ৪৯১নং ধারাটি ছিল অসহায় ব্যক্তিদের চাহিদা মেটাবার জন্য নিযুক্ত শ্রমিকদের চুক্তিভঙ্গ সংক্রান্ত। যেমন, এটা প্রযোজ্য হত সেই আয়ার ওপর যে খাদ্যশস্য শিল্পের পরিচর্যার ভার নিয়েছিল, এটা প্রযোজ্য হত সেই ভূতোর ওপর যে শ্রম নিয়েছিল পশু ব্যক্তির এবং যে নিজের ভার নিয়ে নিতে পারে না এমন ব্যক্তিরা চাহিদাগুলি পূরণ করার। এটা ছিল ৪৯১নং ধারা। অতঃপর, ৪৯২নং ধারার আওতায় ছিল সেই সব চাকরির চুক্তিভঙ্গ যে ক্ষেত্রে যেখানে একজন ভৃত্যকে তার মালিকের বরচে দূরদেশে পাঠান হত কাজ করতে। এই তিনটি ব্যবস্থা আইনে পরিণত করা হয়েছিল যখন ভারতীয় দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়। এক্ষেত্রে মহাশয়, খর্দাটের পরিণত হবার পর থেকে এই তিনটি ধারার ইতিবৃত্ত কী ছিল? ইতিবৃত্তটি হল এই রকম : ১৯২৫ সালের তৃতীয় আইনের বলে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডল ৪৯০ নং ধারা ৪৯২ ধারাকে রদ করে দিয়েছিল। ঐ ধারাগুলি আর প্রযোজ্য ছিল না এবং ঐ ধারানুসারে চাকরির যে-সব চুক্তিভঙ্গ অপরাধ বলে গণ্য হত সেগুলি আর অপরাধ বলে বিবেচিত হত না। অতঃপর, ভারতীয় দণ্ডবিধির যে ধারাটি রয়ে গেল সেটি হল ৪৯১নং ধারা। যার জন্য, ভারতে এখন আইন বোঝাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, যাতে চাকরির চুক্তিভঙ্গের আইন হিসাবে ক্ষতিপূরণের বললে স্বতন্ত্রভাবে শাস্তিমূলক পরিণাম অর্জিত আছে যে ধারাতে সেটি ৪৯১নং ধারা এবং আমার মতে হয় না, এই সদনের কোনও ক্ষমতা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলবেন, যদি তিনি জানতে পারেন যে, এর প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল অসহায় ব্যক্তি এবং নিজের ওপর নিজে নিতে পারে না এমন ব্যক্তির বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

অন্তঃপর মহাশয়, চাকরির চুক্তিভঙ্গের ফলে যে আইনগত অবস্থার উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধে এ যাবৎ আমি যা বলেছি, তার পূর্ণ মূল্যায়ন করার পর যা আমার মত তা হল, ঐ নিষিদ্ধ শব্দ 'ধর্মঘট'-এর প্রচলিত বর্ণনা মাত্র। তা হলে অবস্থার কী দাঁড়াচ্ছে? অবস্থার এইরকম দাঁড়াচ্ছে—চাকরির চুক্তিভঙ্গ কোনও অপরাধ নয় এবং ৪৯১নং ধারার অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় আইনানুসারে তা দণ্ডনীয় নয়। যার অর্থ এটা শুধু এক দেওয়ানি অপকৃত্য : এটা কোনও অপরাধ নয়। এবং উপরন্তু, এটা এমন একটা দেওয়ানি অপকৃত্য যে, এর জন্য প্রতিবার হিসাবে শুধু ক্ষতিপূরণ চাওয়া যেতে পারে, নির্দিষ্ট কার্যটি সম্পাদনের দাবি অবশ্যই করা যেতে পারে না। এটার ওপর-ই আমি জোর দিতে চাই। এক্ষেপে, যতটা সম্ভব গুরুত্ব আরোপ করা যায় ততটা আরোপ করে এই সন্দেহ যে প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত বিচার-বিবেচনা করবে সেই প্রকৃতি হল : কেন ভারতীয় আইন চাকরির চুক্তিভঙ্গকে অপরাধ বলে গণ্য করছে না? এবং কেনই বা ভারতীয় আইন নির্দিষ্ট কার্যটি সম্পাদন করার ব্যবস্থা করছে না? সন্দেহের অন্য সদস্যরা যে উত্তর-ই দিতে পছন্দ করুন না কেন, আমার উত্তরটি অত্যন্ত সহজ-সরল। আমার উত্তরটি এই, ভারতীয় বিধানমণ্ডল চাকরির চুক্তিভঙ্গকে অপরাধ বলেছে না। কারণ বিধানমণ্ডলের ধারণা যে, এটাকে অপরাধ বলে স্বীকার করলে একজন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করা যেতে পারে; [এবং তাকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারে। অতএব ধর্মঘটকে দণ্ড দিতে যাওয়াটা, আমার মতে, শ্রমিককে ক্রীতদাসে পরিণত করা ছাড়া আর কিছু নয়। দাসত্ব কী? যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংজ্ঞা অনুসারে ক্রীতদাসত্ব আইনজিক দাসত্ব ছাড়া আর কিছু না। এবং এটাই আইনজিক দাসত্ব। এটা নীতিশাস্ত্রের পরিপন্থী; এটা ব্যবহারশাস্ত্রেরও পরিপন্থী। মহাশয়, ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রণেতারা যে আমার সদা-উদ্ভাবিত ধারণাগুলি—যথা ৪৯০, ৪৯১ এবং ৪৯২ ধারার শর্তগুলির খসড়া রচনার সময় যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন, যা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানকার শীর্ষ-টীকা (Head Note) থেকে। তাঁদের মনে বিবেকের দংশন নুপরিপুষ্ট ছিল এবং এমন কী ৪৯০, ৪৯১ এবং ৪৯২ ধারায় সন্নিবেশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবস্থাগুলিকেও আইনের রূপ দেওয়া যা ত হবে কি না এ নিয়ে তাঁরা অনেক ভেবেছিলেন। উল্লেখ্য অসংখ্য ধর্মঘট ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রণেতারা বলেছিলেন, যার শিরোনাম "চাকরির চুক্তিভঙ্গ"

অপরাধমূলক উন্নয়ন।"

"সাধারণভাবে (চাকরির) চুক্তিভঙ্গ করা অপরাধ হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়, বরং তা শুধু দেওয়ানি মামলার বিষয়বস্তু হতে পারে—এমন চিন্তাধারার আমার ব্যবহার-শাস্ত্রের সঙ্গে সাধারণভাবে একমত। এইসাধারণ নিয়মের অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম আছে। কিছু চুক্তি আছে যা ভঙ্গ করলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বা খুব বেশি ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা মেটানো যায় এবং সেগুলি এমন ব্যক্তিদের দ্বারাও করা সম্ভব, যাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ প্রায় একেবারেই সম্ভব নয়। এই ধরনের চুক্তিভঙ্গ আমাদের অভিমতে শাস্তিমূলক আইনের অধীনে আনাই সম্ভব।"

শাস্তিযোগ্য কর্মে অবহেলার মতো বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পর্কে তাঁরা যে ব্যাপক সমীক্ষা করেছেন, তা থেকে তাঁরা দেখেছেন যে, অত্যন্ত নীতিশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একমাত্র যে কাজগুলির জন্য শাস্তি দেওয়া যেতে পারে সেগুলি হল এই তিনটি ব্যবস্থা এবং এর অতিরিক্ত আর কিছু না।

এক্ষেপে, একথা কলা হয়েছে যে, ধর্মঘট করার অধিকার বলতে তেমন কোনও অধিকার নেই। আমার উত্তর এই যে, এই ধরনের বিবৃতি তেমন মানুষের কাছ থেকেই আসতে পারে যিনি সত্যি-সত্যিই জানেন না ধর্মঘট কী। যদি সদস্যরা 'ধর্মঘট' শব্দটির যে অর্থ আমি করেছি অর্থাৎ চুক্তিভঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়—এই অর্থটি মেনে নিতে প্রস্তুত থাকেন তবে আমি বলব যে, ধর্মঘট শুধু স্বাধীনতার অধিকারের অন্য নাম। এটা চাহিলা অনুযায়ী মনোমতো শর্তে পরিবেশের স্বাধীনতার অধিকার ছাড়া আর কিছুই না। একবার এই স্বাধীনতার অধিকারের দাবি মেনে নেওয়ার অর্থ হল অপরিহার্যভাবে ধর্মঘট করার অধিকারকে মেনে নেওয়া। কারণ, আগে যা বলেছি, ধর্মঘটের অধিকার স্বাধীনতার অধিকারের নামান্তর মাত্র। এটা অনেকটা রাজাদের ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার হিসাবে উল্লেখ করে এক ধরনের পরিহাস বর্ধিত হয় এই ধারণার ওপর। মহাশয়, উত্তরে আমি শুধু একটা কথাই বলব যে, শুধু কাবিক ভাষা বা বর্ণাঢ্য বর্ণনা দিয়ে যুক্তিকে খারিজ করা যায় না; ঐ ধরনের পরিণতি কোথাও ঘটতে দেখিনি আমি—আইনের আদালতে তো আদৌ নয়। যদি আপনি মেনে নেন যে, স্বাধীনতার অধিকার ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার, তা হলে আমি দাবি করব যে, ধর্মঘটের অধিকারও ঈশ্বরদত্ত অধিকার। আরও বেশ, বেশ এগিয়ে

আমি বলব যে, যদি ১০ জন বা ২০ জন বা ২০০ জন মানুষ যুগপৎ ধর্মঘট ঘোষণা করে, তবে আইনের ক্ষেত্রে তেমন কিছু হেরফের ঘট না।

আমি জানি হয়তো কেউ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ ক নং ধারার উল্লেখ করবেন এবং এই প্রসঙ্গটি বর্জন করার আগে ঐ বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করছি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ ক নং ধারাটির বিষয়বস্তু হল যড়যন্ত্র। আমি জানতে উৎসুক যে, অন্য পক্ষের সদস্যরা এ সম্বন্ধে যুক্তি দোত্রে চান কি না যে, ধর্মঘট করার অধিকার থাকতে পারে না, কারণ একদল শ্রমিকের ধর্মঘট হল যড়যন্ত্র। যদি তাঁরা তা করেন, আমি অপর তরফের ঐ ভদ্রলোকদের, যারা একদল শ্রমিকের ধর্মঘট করার অধিকার নেই এ কথা বলার কারণ হিসাব ১২০ ক নং ধারার ওপর নির্ভর করতে চান, তাঁদের আমি বলব, ধর্মঘট বা ও যড়যন্ত্র তা প্রমাণ করতে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁরা বলছেন ধর্মঘট যড়যন্ত্র, ততক্ষণ ১২০ ক নং ধারা প্রযোজ্য হবে না এবং আমি জোর দিয়ে বলছি যে ধর্মঘট যড়যন্ত্র নয়।

দুর্ভাগ্যবশত ভারতে চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত মামলার হুদিস পাইনি আমরা। আমার গবেষণার ফলস্বরূপ একটা মামলাও আমি পাইনি, যেখানে যড়যন্ত্রের ভিত্তিতে ১২০ ক ধারায় ধর্মঘটীয়া প্রেপার হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে ব্রিটিশ আইন থেকে আমি কিছু সমর্থন খুঁজে পেয়েছি, যাতে যড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মঘটেরও আলোচনা আছে এবং স্কোলোসার (Schollosser) রচিত 'ট্রেড ইউনিয়নগুলির আইনগত অবস্থা' নামক গ্রন্থ থেকে একটা ছোট অংশ আমি জানাবো ৭৬ পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদটি :-

“শ্রমিকদের অবস্থা উন্নততর করার জন্য, অতএব ধর্মঘট এবং অনুরূপ এক অভিপ্রায়-বিশিষ্ট গঠিত দল নিজের থেকে সাধারণ আইনে বেআইনি হয় না। এই রকম প্রস্তাবের কোনও ভিত্তি নেই যে, ধর্মঘট স্বয়ং অবৈধ বেআইনি ইংলন্ডের আইন অনুসারে। এ কথা সত্য যে, প্রায়ই এরকম অনুশাসন বাক্য পাওয়া যায় যার বক্তব্য হল, শ্রমিকদের অবস্থা উন্নততর করার জন্য এক অভিপ্রায়-বিশিষ্ট দলগঠন সাধারণ আইনে বেআইনি, কিন্তু এইভাবে রচিত বিধি-নিয়ম আদালত কখনও আইন হিসাবে মেনে নেয়নি এবং প্রখ্যাত বিচারকরা বিচ্ছিন্ন মনোভাব প্রকাশ করেছেন। পুরো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রমিকদের অবস্থা উন্নততর করার জন্য এক অভিপ্রায়-বিশিষ্ট দল গঠনকে সাধারণ আইনের পরিপন্থী হিসাবে গণ্য

করেনি কোনও আদালত এবং শ্রমিকদের অবস্থা উন্নততর করার প্রচেষ্টাতে বাধা দিয়ে ধারাবাহিকভাবে যে-সব বৈধানিক আইন রচিত হয়েছিল তার একটাও সাধারণ আইনের ওপর ভিত্তি করার বা ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। সত্রটি ক্রম হবে (Rex vs. Mawbay) মামলার বিচারক গ্রোসেজ (Grosej) প্রসঙ্গ ক্রমে যে বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন তা যদি আমরা মেনে নিই, তবে ১৯২৫ সালের ‘কমবিনেশন আইন’ (Combination Act 1925) দ্বারা আইন পরিষদ কর্তৃক সবকটি সংবিধিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার আগে পর্যন্ত উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে কোনও ক্কার-বিভাগীয় অনুশাসন-বাক্য ছিল না। আইন সম্বন্ধে সিদ্ধান্তগুলি, যেগুলি সম্প্রতি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে, এবং যা পূর্ববর্তীকালের স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে রচিত, সেগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। ১৮২৪ সালের পর থেকে কর্তৃপক্ষের প্রভাব এই মতবাদের বিপক্ষে ছিল। ধর্মঘট নিজে নিজের মধ্যে সংযোজিত।”

এই রায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ :

“এক বেআইনি উদ্দেশ্যসাধনের জন্যও না বা বেআইনি উপায়ে বৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও না। এ বিষয়ে আইন খুব সুস্পষ্ট যে, নিজেরদের সুরক্ষার জন্য শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হবার অধিকার আছে, যখন ঐ ঐক্যবদ্ধতা তাদের সেই সুবিধা পাইয়ে দিতে পারে আইনের সাহায্য নিয়ে যা তারা দাবি করতে পারত না। শ্রম ও শর্তাবলি সম্পর্কে নির্বাচনের অধিকার, যা প্রয়োগ করা যেতে পারে।”

এই বিষয়টির ওপর-ই আমি জোর দেবার চেষ্টা করছিলাম :

“এবং এককভাবে ঘোষণা করুক, পরামর্শ করার পর অনেকে বৌদ্ধভাবে কাজ করতে পারে এবং যুগপৎ তাদের পছন্দ সম্বন্ধে ঘোষণা করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলি উপলব্ধি করার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের জন্য তার ভিত্তিতে আইনসম্মতভাবে কাজ করতে পারে।

ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া অবশ্যই সব সময়ে অবৈধ নয় এবং চুক্তিভঙ্গ করে যদি ধর্মঘট শুরু করা হয় এবং ঐভাবে ভাঙ্গা চুক্তির মেয়াদ যদি উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে নতুন শর্তে নতুন পরিষেবার চুক্তি করতে অস্বীকার করার ফলে যদি তাদের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় তবে তারপরও শ্রমজীবী মানুষদের সমর্থন করে ধর্মঘট চালু রাখতে যদি কেউ সাহায্য করে, তবে সে আদৌ কোনও অবৈধ

কাজ করছে না।

এইভাবে সংগঠন গঠিত হয়।

এই বিষয়টি সম্পর্কেই আমি সদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, কারণ এর সঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ ক নং ধারার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, “যা অপরের ক্ষতির কারণ হতে পারে তা বেআইনি হতে পারে, বিশেষ করে যখন ঐক্যবদ্ধতার মূল লক্ষ্যটি হল ক্ষতিসাধন করা,” —শব্দগুলি হল “যখন ঐক্যবদ্ধতার লক্ষ্য ক্ষতিসাধন।”

“এবং যখন ক্ষতিসাধন করা হচ্ছে, তখন বড়বস্তুর জন্য মোকদ্দমা করা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা-আলাদাভাবে যে প্রণালি মীমাংসা করা হবে তা হল এই যে, পরিণামী ক্ষতিটি কতটা পরিমাণে এক বৈধ ঐক্যবদ্ধতার সহায়ক এবং ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধতার স্থায়ী কতটা?”

অতএব আমার নিবেদন এই যে, ধর্মঘটকে ১২০ ক ধারার আওতায় আনার জন্য অভিযোজনার পক্ষ থেকে যা প্রমাণ করা জরুরি হবে তা হল এই, ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষতিসাধন করা। যদি ধর্মঘট থেকে কেবল ক্ষতিসাধন-ই হয়, তবে তা ১২০ ক ধারা অনুসারে ধর্মঘটকে বেআইনি সংগঠনে পরিণত করা হবে না। অতএব আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, ধর্মঘটকে শাস্তি দিয়ে এই বিধেয়ক শ্রমিকদের দাসত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনছে এবং এছাড়া আর কিছুই করেছে না।

আমার বিচার-বুদ্ধি অনুসারে এই বিধেয়ককে কলা উচিত ‘শ্রমিকদের সাধারণ স্বাধীনতার নিলসন আইন’ (The Workers’ Civil Liberties Suspension Act)। এটিই হবে এর উপযুক্ত শিরোনাম। অনেকের মনে এমন ধারণা আছে যে, এই নিলসন মাত্র দুই মাসের জন্য—যতদিন না পর্যন্ত সালিশি মামলা শেষ হচ্ছে—এবং তারপর শ্রমিকদের স্বাধীনতা থাকবে ইচ্ছামতো ধর্মঘট করার। মন্তব্য, আমি বলতে চাই যে, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমার বক্তব্য এই যে, কার্যকর করার পর এই বিধেয়কের শর্তগুলি এনে দেবে চিরস্থায়ী দাসত্ব আর শ্রমিকরা কোনওদিন-ই ধর্মঘট করতে পারবে না। শর্তগুলি বেথা বাক। প্রথমত, বিধেয়কে কলা আছে যে, এই আইন বলবৎ হবার পর এক বছরের মধ্যে আলৌ কোনও ধর্মঘট করা চলবে না। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, একজন বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন শ্রমিক যদি তা মেনে নেয়, অথবা পরিস্থিতি যাই হোক না কেন একজন বিচার-

এই সম্পন্ন শ্রমিক যদি তা মেনে না নেয়, এক বছরের জন্য পূর্ণ দাসত্ব থাকছেই। দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত শর্তগুলির দ্বারা শ্রমিকরা নিয়ন্ত্রিত হবে। ঐ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ নেই, সরে যাওয়ারও পথ নেই। এক বছর উত্তীর্ণ হবার পর কী হবে? ঘটবে এই : আপনাকে নোটিস দিতে হবে; এর ফলে সময়ের একটা অংশ চলে যাবে যার মধ্যে ধর্মঘট করা যাবে না। তারপর নোটিস দেবার পরে উত্তর দেওয়ার জন্য সময় দেওয়া হবে। উত্তর দেবার সময়-কালের মধ্যে ধর্মঘট করা চলবে না। তারপর শুরু হবে সালিশি-প্রক্রিয়া। যদি উভয় পক্ষ সৌভাগ্যবান হয়, যদি উভয় পক্ষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তবে তা দুই মাস পর্যন্ত চলতে পারে। কিন্তু বিধেয়কে বলা আছে, এর মেয়াদ চার মাস পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। অতএব শ্রমিকদের নালিশের কারণ উদ্ভূত হবার তারিখ থেকে চার মাস এবং কার্যত পঁচিশ দিন—আমার হিসাবে ভুল হল সংশোধন করে নেব, কারণ আমি খুঁজিমাটি ব্যাপারগুলি দেখে নিতে পারিনি—শ্রমিকরা কিছুই করতে পারবে না। সে আলোচনা করবে না, বক্তৃতা দেবে না, সংগঠন করবে না, সে কিছুই করবে না। এই সময়ের জন্য একটি শব্দ কলা বা একটি ভাষণ দেওয়া বা কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রকৃত্তীকরণও দণ্ডনীয় হবে। ধরা যাক যে, চার মাস এবং পঁচিশ দিনের এই দীর্ঘ সময়কালের জন্য কোনও সালিশি করা হল না—আমার মতে গর্ভধারণ কালের মতো দীর্ঘসময়—তাহলে কী হবে? সালিশির মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পর শ্রমিককে শুধু দুই মাস সময় দেওয়া হবে ধর্মঘট করার জন্য। আমি জানি না যে, এই বিধেয়কের উদ্দেশ্য আমার মাননীয় বন্ধু কী মনে করেন যে, ছত্রভঙ্গ হওয়া শ্রমিকদের পক্ষে লড়াইয়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দুই মাস কি খুব দীর্ঘ সময়? শ্রমিকদের জগতে আমি একজন বেশ সক্রিয় কর্মী ছিলাম। আমি নিজেকে খেত-মজদুর মনে করতে পারি না, তাই ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত করার ব্যাপারে কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা আমার জানা নেই। কিন্তু বোম্বাই নগরীতে পর্যবেক্ষক হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে পরিস্থিতিটা দেখে এটা বলতে আমার বিন্দুমাত্র বিধা নেই যে, কোণঠাসা অবস্থায় রাখা হয়েছে এমন শ্রমিক সংস্থার জন্য দুই মাস সময় সত্যিই অপরাধ। বিশেষ করে যাদের ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে চার মাস ও পঁচিশ দিন ধরে ধর্মঘট করার জন্য নিজেদের দলীয় শক্তিকে সমবেত করতে। যদি তারা দুই মাসের জন্য ধর্মঘট না করে, তবে কী হবে? ঘটবে এই যে, আইনের

চোখে ধরে নেওয়া হবে যে তারা পরিস্থিতিটা মেনে নিয়েছে। আবার যদি তারা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং নতুন নালিশের কারণ খুঁজে পায়, তবে আইন বলে যে আবার তাদের চার মাস ও পঁচিশ দিন অপেক্ষা করতে হবে এবং সালিশি-প্রক্রিয়া চলতে দিতে হবে। অপেক্ষা করো এবং দেখে যাও আমরা কী করি? চার মাস ও পঁচিশ দিন ধরে অপেক্ষা করো এবং দেখে যাও, যদি মনে করো ধর্মঘটে যেতে পারো, তবে তা করো দুই মাসের মধ্যে। যদি না করো এবং দুই মাসের পর অন্য কোনও নালিশের কারণ তুলে ধরো, তবে আবার চার মাস ও পঁচিশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। মহাশয়, আমি জানতে চাই যে, কোরো-না নিষেধাজ্ঞার এই অন্তঃসূত্র চিরকালের জন্য শ্রমিকদের পূর্ণ ক্রীতদাসত্ব চিরস্থায়ী ক্রীতদাসত্ব দেবে কি দেবে না? এটা যদি শ্রমিকদের জন্য ক্রীতদাসত্ব প্রবর্তনের বিধেয়ক না হয়, তবে আমি জানতে চাই কোন ধরনের বিধেয়ক ক্রীতদাসত্বের প্রবর্তন করবে? ধর্মঘটের সঙ্গে সংযুক্ত বিধেয়কের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে এইটুকুই কলার ছিল।

অতঃপর মহাশয়, এই বিধেয়কের যে সব শর্তাবলি ধর্মঘটের সঙ্গে সংযুক্ত তার সঙ্গে ১৯২৯ সালের 'বাণিজ্য-বিরোধ আইন' (Trade Dispute Act) শর্তাবলির তুলনা করা প্রয়োজন এবং আমি মনে করি তা শিক্ষাগ্রস্ত হবে। এই আইনেও ধর্মঘটের অধিকারের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে এবং ফলে ঐ আইনের শর্তাবলির সঙ্গে এই বিধেয়কের শর্তাবলি তুলনা করা যথেষ্ট শিক্ষাগ্রস্ত হবে, হার ফলে সন্দেহ কৃত্যে পারবে কোন পথে আমরা অগ্রসর হচ্ছি বা আমরা ক্রীতদাসত্বের দিকে এগোচ্ছি কি না। মহাশয়, ১৯২৯ সালের আইনটি শ্রমিকদের ধর্মঘট করার ব্যাপারে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে এবং এর দুটি ধারা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়। ১৯২৯ সালের আইন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কৃত সাধারণ ধর্মঘটকে শাস্তি দিতে পারে। আইনটির ১৬নং ধারা, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেশি প্রাসঙ্গিক। অপর ধারাটি হল ১৫নং ধারা, যা কিনা নোটিসে ধর্মঘটকে শাস্তি দিতে পারে। আপতদৃষ্টিতে কিনা নোটিসে ধর্মঘটকে শাস্তি দেবার প্রস্তে ১৯২৯ সালের আইন এবং এই বিধেয়কের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু, মহাশয়, এর অতিরিক্ত একটি বিধেয়ক অপরটি থেকে ততটাই ভিন্নধর্মী যতটা ভিন্নধর্মী চক-বাড়ি এবং পনির। একটির সঙ্গে অপরটির কোনও সম্পর্ক নেই এবং তুলনামূলকভাবে একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হবে না যে, এই

বিধেয়কটি প্রতিক্রিয়াশীল এবং অযোগ্যমী এবং এই বিধেয়কের রচয়িতা ১৯২৯ সালের আইনের রচয়িতার চেয়ে অনেক বেশি সতর্কশীল।

১৯২৯ সালের আইনের ১৫নং ধারার শর্তগুলির তুলনা করা যাক। এই বিষয়টির সঙ্গে যৌর্য পরিচিত আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন যে, ১৯২৯ সালের আইনের ১৫নং ধারাটি শুধু জনহিতকর কার্যাবলির জন্য সীমাবদ্ধ। এই আইন সব রকমের ধর্মঘটকে শাস্তি দেয় না, দেয় শুধু জনহিতকর কৃত্যগুলিতে করা ধর্মঘটকে এবং আমার মতে এটাই হল এই বিধেয়ক ও ১৯২৯ সালের আইনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। এক্ষেপে মহাশয়, আমি এই প্রশ্নটি করতে চাই যে, ১৯২৯ সালে গৃহীত ব্যবস্থা থেকে এই ব্যতিক্রম কি কোনও ভাবে বাঞ্ছনীয়? আমি মনে করি যে, এই বিধেয়ক যখন ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলে পেশ করা হয়েছিল, তখন কংগ্রেস দলের অবস্থা কেমন ছিল, তার বর্ণনা দিয়ে প্রসঙ্গটির অবতারণা বাঞ্ছনীয় হবে। মহাশয়, যে বিধেয়কটি শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ সালের আইনে পরিণত হয়েছিল তার শর্তাবলি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক নিযুক্ত 'প্রবর সমিতি'র (Select Committee) প্রতিবেদন আমি কষ্ট করে খুঁজে বের করেছি এবং পড়েছি এবং একদিকে আমলাতন্ত্র, আমি এই পরিভাষাটি ব্যবহার করছি এই জন্য যে বিপরীত পক্ষ এর সঙ্গে সুপরিচিত এবং অন্যদিকে কংগ্রেস দলের এই দুটি প্রতিযোগী প্রতি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ রেখে জানতে চাই, যখন ১৯২৯ সালের আইনটি আলোচনাধীন ছিল তখন বিতর্কের বিষয়টি কী ছিল? আমি দেখতে পাচ্ছি যে পার্থক্যের কারণ ছিল দুটি। সরকার চাইছিল যে, জনহিতকর কৃত্যগুলিকে সংজ্ঞা নির্ধারণের ভার তাদের হস্তে ওপর ছেড়ে দিতে হবে। জনহিতকর বলতে কী বুঝায়, তার সংজ্ঞা খোদ আইনটির মধ্যে সন্নিবেশিত করতে চাইছিল না সরকার এবং তাঁদের মতে জনহিতকর কৃত্যগুলিকে পরপর উল্লেখ করতেও সরকার প্রস্তুত ছিল না। তাঁদের বক্তব্য ছিল, জনহিতকরতা এবং তাঁর গুরুত্ব নির্ভর করে বিষয়ের পরিস্থিতির ওপর। যুগ এবং পরিস্থিতি অনুসারে তার তারতম্য হতে পারে। যে পরিবেশে এক সময়ে জনকল্যাণমূলক নয়, তা অন্য সময়ে জনকল্যাণমূলক হয়ে উঠতে পারে এবং তাঁরা মনে করতেন যে, তাঁদের চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে তাঁরা যা চান, সেই মতো পরিস্থিতিটিকে নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যে অনিশ্চিত অবস্থায়

রেখে দেওয়া সরকার, যা সরকারের ইচ্ছানুসারে নির্ধারিত হবার অপেক্ষায় থাকবে। সেই সময়ে কংগ্রেস দুটি বিষয়কে সমর্থন করেছিল। তার একটি হল এই যে, আমলাতন্ত্রের ইচ্ছার ওপর কিছুই ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং আমলাতান্ত্রিক উদ্দেশ্যসাধনে সেগুলিকে কাজে লাগানো যাবে না এবং তার ফলে কংগ্রেস দল এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যে, ইচ্ছামতো কাজ করার অধিকার সরকারের ওপর ছাড়া উচিত নয়। ১৫নং ধারার পরিধির মধ্যে যে-সব জনকল্যাণমূলক কাজকে আনতে হবে, সেগুলিকে অবশ্যই খোদ আইনের জন্য উল্লেখ করা উচিত। ১৯২৯ সালে বিধেয়কটি যখন উত্থাপিত হয়েছিল তখন দ্বিতীয় যে পদক্ষেপ কংগ্রেস দল নিয়েছিল তা এই—দল বলেছিল যে, জনকল্যাণমূলক কাজের শ্রেণী বিভাগটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং জনকল্যাণমূলক পরিষেবার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার জন্য কোনও ধর্মঘটকে অবৈধ করা যাবে না। দল এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে, এটা সীমাবদ্ধ থাকবে শুধু তার-ই মধ্যে যাকে বলা হয় 'সামাজিক নিরাপত্তা কৃত্যক' (Social Security Services)। ১৯২৯ সালে এটাই ছিল অবস্থা। এই প্রতিযোগিতার সরকার একটি বিষয় ছেড়ে দিয়েছিল। তারা জনকল্যাণমূলকতার বিষয়টিকে আইনের অন্যই সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে রাজি হয়েছিল এবং তাই মহাশয়, আইনের একটি ব্যাখ্যামূলক খণ্ড ২নং ধারাতে পাঠেছেন জনকল্যাণের সংজ্ঞাটিকে এবং সেখানে কী কী বিষয় জনকল্যাণমূলক তা সমিতিবেশিত হয়েছে। এর সঙ্গে কিছু যুক্ত করা বা বাদ দেওয়ার স্বৈচ্ছাবিকার সরকারের। নেই। অন্য প্রসঙ্গটি, অর্থাৎ পরিষেবার শ্রেণীটিকে সংকীর্ণ করে আনা যার মধ্যে ধর্মঘটের অবৈধতা সীমাবদ্ধ থাকবে, সে সম্বন্ধে সরকার সন্মত হয়নি। সরকার বলেছিল যে, তা জনকল্যাণমূলক কৃত্যক পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়া উচিত এ নিয়ে তাদের যে সূত্র আছে তা অটল থাকবে এবং সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল জেতেনি, কিন্তু সেটা আমার বাদানুবাদের পক্ষে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ আমার মূল যুক্তি হল এই যে, ১৯২৯ সালে ধর্মঘটের বৈধতাকে শুধুমাত্র 'সামাজিক নিরাপত্তা কৃত্যক'র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাটিকে সমর্থন জানিয়েছিল। মহাশয়, আমি 'প্রবর সমিতি'র প্রতিবেদন থেকে কংগ্রেস সদস্যদের লেখা কিছু কার্যবৃত্ত (Minutes) পাড়ে শোনাতে চাই। আমার বিশ্বাস, ঐ সময়ে মাননীয় সদস্য শ্রীযমুনাদাস মেহতা কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন। তবে আমি সূনিশ্চিত নই।

এই হল শ্রীযমুনাদাস মেহতা, শ্রীএম. এস. শেব আরেঙ্গার শ্রী এস. সি. মিত্র এবং শ্রী ভি. ভি. যোগিয়ার লেখা কার্যবৃত্তের একাংশ :  
“বিধেয়কটি সম্পর্কে ‘প্রবর সমিতি’র মৌলিক আপত্তিগুলি প্রভাবহীন থেকে গেছে। আমরা মনে করি, ১৫নং এবং তৎপরবর্তী খণ্ডগুলি বাণিজ্যিক বিরোধের মীমাংসা করা দুরের কথা, বরং সেগুলির সংখ্যা বাড়িয়েই যাবে; সেগুলি নিয়োগকর্তা ও নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্কে তিক্ত করে তুলবে, এবং অনুরূপ আইন-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সেই সত্যতাই প্রতিপাদন করে যে, সেগুলি আমলাতন্ত্রের পক্ষে অপ্রিয় রাজনৈতিক প্রচারকে চূর্ণবিচূর্ণ করার কাজে ব্যবহার করা হবে। যদি এই বিধেয়কের উদ্দেশ্য হয় দেশে প্রকৃত মজদুর আন্দোলনকে দীক্ষিত করা ও লালন করা, তবে ১৫নং খণ্ড নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে।”

এই দৃষ্টিভঙ্গিই তারা নিয়েছিলেন যে, জনকল্যাণমূলক কৃত্যকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও কোনও ধর্মঘটকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। মতভেদ-বিশিষ্ট কার্যবৃত্তে আরও বলা হয়েছে :

“ঐ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বার্থ হওয়ার আমরা এই প্রতিবাদী কার্যবৃত্তকে সংযোজিত করতে বাধ্য ছিলাম। ১৪নং খণ্ড পর্যন্ত বিধেয়কটি সংশোধিত চলিয়েছে তদন্তকারী আদানত ও সালিশি পর্যদের মাধ্যমে শিল্পবিরোধের মীমাংসা করার ব্যাপারে। আমাদের বিশ্বাস, বিধেয়কের ঐ অংশটি সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, তা ‘প্রবর সমিতি’ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত ও শক্তিশালী। ঐ খণ্ড পর্যন্ত বিধেয়কের প্রায় বস্তুগুলি পরিবর্তন করা হয়েছে তা একে আরও পক্ষপাতশূন্য ও ন্যায়সঙ্গত করে উঠতে সাহায্য করেছে। অবশ্য আমরা ২(ঘ) নং খণ্ডে প্রদত্ত ‘জনকল্যাণ কৃত্যক’ের সংজ্ঞাটিকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখিনি। ঐ সংজ্ঞাটি ১৫নং খণ্ডের-ই আনুযায়িক পরিণাম মাত্র এবং তাই ঐ খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেই তাকে দেখা উচিত। আমাদের বিশ্বাস যে, ঐ খণ্ডটি নিয়োগকর্তা ও নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য মধুর সম্পর্কের প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। যে-কোনও জন-পরিষেবা ‘জনকল্যাণমূলক সম্পর্কের প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। যে-কোনও জন-পরিষেবা ‘জনকল্যাণমূলক পরিষেবা’, হতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিনা নোটিসে ঐ ধরনের পরিষেবাতে ধর্মঘট করলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ বলে ধরা হবে। এটা নয়, ঐ ধরনের পরিষেবাতে তালাবন্দি (Lock Out) করাকেও অপরাধ

হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে ধর্মঘটকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলার বিরুদ্ধে বৃদ্ধি প্রভাবিত হয় না। আমরা বুঝতে পারি না যে ডাক, তার বা দূরভাষ পরিষেবার, কিংবা যে-কোনও রেলপথ পরিষেবার ধর্মঘটকে অপরাধ আখ্যা কেন দেওয়া হবে? নিঃসন্দেহে এই ধরনের ধর্মঘট অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং আমাদের সাধারণের সুখ-স্বচ্ছন্দ্য বাধা হয়ে ওঠে, কিন্তু তাই বলে যদি একদল মানুষ আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন মেটাতে অস্বীকার করে, আর কেউ যদি এই দলটিকে অপরাধী বলে, বিশেষ করে বন্ধন ধর্মঘটীরা মনে করে যে, এই-সব সুখ-স্বচ্ছন্দ্য ও সুবিধাগুলি একমাত্র তাদের অধঃপতন ও দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে মিটিতে পারে, তবে এই দাবিটি সম্পূর্ণ অসঙ্গত হবে। ফ্রন্টিয়ার মেল এবং অনুরূপ বিলাসবহুল পরিষেবাগুলি সমাজের কাছে এমন-ই গুরুত্বপূর্ণ যে, সে-সব জায়গায় ধর্মঘট করা অবৈধ হওয়া উচিত একথা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে?"

উদ্ধৃতির বাকি অংশ :

"১৯৫৭ খণ্ডে সম্মিলিত মতবাদের মতো একটি অন্যান্য মতবাদকে আইন পরিষদের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেওয়ার অর্থ বিশ্বের কাছে ঘোষণা করা যে, মানবজাতির একটা বড় অংশের উচ্চতর বৈতনিক ক্রীতদাস হয়ে থাকা এবং জেলে যাওয়ার শাস্তির সম্ভাবনা নিয়ে তারা ধর্মঘট করতে পারে। আমাদের দেশের নিজেদের বিকাশের ব্যাপারে আমরা সবাই অত্যন্ত ব্যাকুল, কিন্তু এই খণ্ডে প্রস্তাবিত নিষেধের পদ্ধতির দ্বারা অবশ্যই নয়। জল সরবরাহে, আলো এবং স্বাস্থ্য-বাবস্থার মত পরিষেবাগুলি যে সমাজের মূল অস্তিত্বের জন্যই প্রয়োজনীয়, একথা আমরা মানি এবং এই ধরনের পরিষেবার যে-কোনও ধর্মঘট সবরকম বৈধ উপায়ে নিরুৎসাহ করা উচিত, এই জন্য নয় যে, সেগুলি 'জনকল্যাণমূলক পরিষেবা', বরং এই জন্য যে, সেগুলি হল 'সামাজিক নিরাপত্তা পরিষেবা' (Social Security Services), এবং সমাজের নিজস্ব অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কাউকে তার স্বার্থসিদ্ধি করতে দেওয়া যেতে পারে না। তাই যদি 'সামাজিক নিরাপত্তা পরিষেবাগুলিতে' ধর্মঘট করার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করে তাকে অবৈধ করা হয়, তবে আমরা তার বিরোধিতা করব না..."

মহাশয়, সেই সময় কংগ্রেস সদনরা এই মনোভাব-ই গ্রহণ করেছিলেন। মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সংযোজিত প্রতিবাদী কার্যবৃত্ত থেকে একটা অংশ আমি

পড়ে শোনাতেও চাইব। তিনি উদারপন্থী। আমি এটার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছি এও জন্য। এমনকী মধ্যপন্থীরা যারা কংগ্রেসের নীতি এবং কর্মপন্থা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন না, ১৯২৯ সালে কী বলেছিলেন সেটা আপনারা জানতে পারবেন। তিনি যা বলেছেন :

"জনকল্যাণমূলক পরিষেবার ধর্মঘট সম্পর্কিত ১৯৫৭ খণ্ড কিনা নোটিসে পরিষেবার শর্ত উল্লঙ্ঘন করায় ধর্মঘটকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে। কিনা নোটিসে শুধু সেই সব পরিষেবার যেখানে কাজ বন্ধ করলে মানুষের স্বাস্থ্য অথবা জীবন বিপদগ্রস্ত হতে পারে, যেখানে আচমকা ধর্মঘট করার চেষ্টা হলে দণ্ডনীয় হবে যদি কলা হয়, তবে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রটি তত্ত্বগতভাবে সুস্পষ্ট হবে, কার্যত এই শর্তটি বাতিল হওয়া সত্ত্বেও জনকল্যাণমূলক পরিষেবার সংজ্ঞাটি, যে বাতিলকরণ সরকারকে অব্যবহৃত ক্ষমতা দিতে পারত যে কোনও পরিষেবাকে জনকল্যাণমূলক সেই সংজ্ঞাটি পরিষেবা হিসাবে ঘোষণা করতে, সেই সংজ্ঞাটি এখনও অন্তর্ভুক্ত করে সেই সব পরিষেবাকে যেখানে আচমকা ধর্মঘট, সেই ধর্মঘট যে অসুবিধারই সৃষ্টি করুক না কেন, জীবনে বিপদের আশঙ্কা সৃষ্টি করবে না। যে-কোনও সংস্থার আচমকা ধর্মঘট যতটা আবাসিক-ই হোক না কেন, সেগুলিকে দণ্ডনীয় করার কোনও ভিত্তি নেই, বিশেষ করে যেখানে ধর্মঘটগুলি সামাজিক সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে না। এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে সামাজিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিপন্ন করা আচমকা ধর্মঘটগুলির প্রতিকারের ব্যবস্থা রেখেছে প্রদেশগুলি। ধর্মঘট ছাড়াও, যদি কোনও চুক্তিভঙ্গ করা হয়, তবে সেটাও কঠোর হাতে দমন করা যাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির সাহায্যে..."

মনোভাব এটাই ছিল শ্রীকৃষ্ণকর। কিনা নোটিসে ধর্মঘট করার অধিকার খর্ব করে রাখা যে উচিত এই প্রস্তাবে আমিও একমত, তবে তা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত সামাজিক নিরাপত্তা পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে, জনকল্যাণমূলক পরিষেবার ক্ষেত্রে নয়। এটির সঙ্গে ব্রিটিশ আইন সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে আমি সদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তার প্রতি, যাকে বলা হয় 'জরুরিকালীন ক্ষমতা আইন, ১৯২০' (Emergency Powers Act of 1920)। যুদ্ধ শেষ হওয়ার এক বা দুই বছর পর ব্রিটিশ সংসদ এটি পাশ করেছিল। সেখানেও সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল জরুরিকালীন অবস্থার মোকাবিলায় উদ্দেশ্যে প্রবিধান (Regula-

tion) তৈরি করার। ঐ আইন থেকে দুই-একটি ধারা ১নং ধারা বলছে :

“যদি কোনও সময়ে সম্রাটের মনে হয় যে, কোনও ব্যক্তি বা একদল মানুষ এমন কোনও কাজ করেছে বা প্রত্যক্ষভাবে ভীতি প্রদর্শন করেছে এমনভাবে এবং এমন ব্যাপক হারে যা বিঘ্নিত করতে পারে সরবরাহ ও বণ্টনকে...”

আমি এই বিশেষ শব্দগুলি সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণে ইচ্ছুক :

‘পাদা, জলা, জ্বালানি বা আলো বা যানবাহনের মাধ্যমগুলির ব্যাপারে এবং সামাজিক সম্প্রদায় বা সামাজিক সম্প্রদায়ের কোনও একটি অংশকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করে...’

“(সে ক্ষেত্রে) সবার উদ্‌ঘোষণার (Proclamation) দ্বারা ঘোষণা করতে পারেন যে, জরুরি অবস্থা চলছে।”

তারপর ২নং ধারা বলছে :

“যে-ক্ষেত্রে সরকারীভাবে অবস্থার উদ্‌ঘোষণা হয়েছে এবং যতদিন উদ্‌ঘোষণা বলবৎ থাকছে, ততদিন পর্যন্ত সম্রাটের রাজসভার পক্ষে সামাজিক সম্প্রদায়ের জন্য জীবনযাত্রার জন্য আবশ্যকীয় বস্তুগুলির সংগ্রহের্থে প্রবিধান করা বৈধ হবে এবং ঐ উদ্‌ঘোষণাগুলি... সরকারকে ... সেই ধরনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ অথবা আরোপ করতে পারে যা সবার প্রয়োজন বলে গণ্য করছেন...”

যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হল এই যে, এই সব কিছুই সামাজিক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা এবং জন নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই করার গ্রহণ করা হত, যে বলি আপনি ধর্মঘটের অধিকার সীমিত করে রাখতে চান এবং ধর্মঘটকে অবৈধ বলেন, তবে তা আপনি শুধুমাত্র সেইসব পরিষেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন যার ওপর সামাজিক সম্প্রদায়ে জীবনযাত্রার পোষকতা নির্ভর করে। এক্ষেত্রে, এটা সুস্পষ্ট যে এই বিধেয়কটি প্রতিটি বানিজ্য, প্রতিটি শিল্প পর্যন্ত প্রসারিত। রসিকতা করার জন্য আমি কিছু বলতে চাই না, তবে আমার কন্ঠ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য বলতে চাই যে—ধরা যাক আগামী দিনে, ভারতীয় নারীরা—আশা করব তাঁরা তা করবেন না—যদি তাঁদের ওষ্ঠ রঞ্জিত করার রীতি গ্রহণ করেন এবং কিছু প্রজ্ঞাপকর্তা অর্থ উপার্জনের পেছনে ছেঁটেন তাঁদের চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে এবং যদি এই আইনের অধীনে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে, তবে এর শর্তাবলি তাঁদের মাধ্যম

ডেমোক্লিসের (Democles) তরবারির মতো বুলবে। কেউ কি জোর দিয়ে বলতে পারেন যে, ওষ্ঠ-রঞ্জনী (Lip-stick) শিল্প জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য এবং তাতে ধর্মঘটের অধিকার খর্ব করতে হবে, কারণ কিছু নারী তাদের ওষ্ঠে প্রচলিত রঙ লাগানোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? মহাশয়, এই সরকার ১৯২৯ সালে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা পরিষেবার ধর্মঘটের ব্যাপারে দণ্ডনানের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারে বিসর্জন-ই শুধু দেয়নি, তারা ১৯২৯ সালের আইনের শর্তগুলিকে অতিক্রম করে আমলাতন্ত্রকে পরাক্রান্ত করেছে। শেষ পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের অন্তত বোধোদয় হয়েছিল বরং কলা চলে দায়িত্ববোধ জেগেছিল এ কথা অনুভব করতে যে, ধর্মঘট করার অধিকার এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, জন-নিরাপত্তার আওতাভুক্ত চৌহদ্দির বাইরে ধর্মঘটকে দণ্ডিত করা উচিত নয় এবং এখানে এমন এক বিধেয়ক এসেছে, আমি পুনরাবৃত্তি করছি, যা ওষ্ঠ-রঞ্জনী শিল্পে ধর্মঘটকে শাস্তিযোগ্য করতে পারে।

এত কিছু করা হচ্ছে কীসের জন্য? এইসব হতভাগা শ্রমজীবী মানুষদের ওপর তাঁরা যে এতসব দুঃখ-দুর্দশার বোঝা চাপাতে চাইছেন, তা থেকে আমাদের কী লাভ হবে? আমি যা দেখছি তাতে ফল হবে কিছু ভুললোকের, বিধেয়ক যাদের আখ্যা দিয়েছে বিরোধ-নিবারক, তাঁদের টেবিলে প্রতীক্ষা করা ৪ মাস এবং ২৫ দিনের জন্য। এর অতিরিক্ত আর কিছু আমার চোখে পড়ছে না। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, এই বিধেয়কটি উপস্থাপন করার অন্যতম কারণ হল এই যে, পাওনা সম্বন্ধে মালিক ও শ্রমিক সংস্থার জন্যে দর কবাকবির দায়িত্বটা সরকার নিজের কাঁধে নিতে চাইছে। মনে হয়, এই মর্মেই তিনি কিছু একটা বলেছেন। যদি আমার ভুল হয়, আশা করব তিনি তা শুধরে দেবেন।

আইন করে শ্রমিক-মালিকের জন্যে দর কবাকবিকে নিয়ন্ত্রণ করতে আমি একপটে বলব—এইসব প্রবিধানগুলির (Regulation) কাজ কী? দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতাতে (Civil Procedure Code) পাদা পাদা প্রবিধান আছে। মামলাকারীরা কি সেগুলি সম্বন্ধে আগ্রহী? মামলাকারী শুধু তার মামলার ফলাফলে আগ্রহী। সবরকম রীতিনীতি সহ, সবরকম ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া সহ নোটিস পাঠাবে, নোটিস পাবার পর কী হবে, লিখিত জবাব (written statement) কে পসড়া করবে এবং আরও অন্যান্য কাজ—ক্ষুধার্ত শ্রমজীবী মানুষটি অন্তত এ সবে

আগ্রহী নয়।

সে রকম কিছু বলছি না। আমি যা বলছি তা এই, যে সব ব্যবস্থা তাঁদের জন্য করা হয়েছে, তার জন্য তাঁদের আরও তৎপর হওয়া উচিত ছিল, সাহস করে তাঁদের বলা উচিত ছিল “আপনারা রাজি হোন বা না হোন, বাধ্যতামূলকভাবে আমরা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে নেব।” এটা অন্য ব্যাপার, তাতে আমি রাজি হই বা না হই। যদি আপনারা এই রকম মনোভাব নিতেন, তা হলে অবশ্যই আমি বুঝতে পারতাম, তা হলে অবস্থাটা দাঁড়াতে এই রকম, যে ৪ মাস ও ২৫ দিন পরে আপনি একটা নির্দিষ্ট ফলাফল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতেন।

যথেষ্ট করেছেন আপনারা এবং এই বিধেয়কে আর এক পদক্ষেপ নেবার জন্য আপনাদের কুণ্ঠিত হওয়ার দরকার নেই।

এ সব কীসের জন্য? আপনাকে কয়েকটা পর্যায়ে যথা, একজন নিবন্ধক, একজন বিরোধ-নিবারক, উভয় পক্ষ রাজি থাকলে বিরোধ-নিবারকদের একটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এটা শুধু কিছু অমায়িক ডব্রলোকের সামনে হাজির হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা ছাড়া আর কিছু না। যাঁরা বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মিলি করে কথা বলবেন এবং হয়তো তাদের মন-মেজাজ প্রসন্ন করে দিতে পারবেন যদি এ কথা বলা যায়, যে কিছু পেতে চায় এমন একজন ক্ষুধার্ত মানুষের মন কি এতে প্রসন্ন হবে? এ-রকম আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার বিচারে এটা সম্পূর্ণ নিষ্ফলতা, এমন একটা চরম নিষ্ফলতা যার কোনও প্রত্যক্ষ ফল আদৌ হতে পারে না। এর একমাত্র প্রত্যক্ষ ফল এই হবে যে, এই ৪ মাস ও ২৫ দিন দেরি করিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত শ্রমিককে ধর্মঘটে যেতে অসমর্থ করে তুলবে। এখানেও আবার আমি ১৯৩৪ সালের ‘বোম্বাই আইন’ (Bombay Act of 1934) ও বর্তমান বিধেয়কের মধ্যে যে বৈপরীত্যটি আছে তার প্রতি সদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মস্তশয়, ১৯৩৪ সালে বিধেয়কটি যখন আলোচনামূলক ছিল, তখন এমন প্রস্তাব উঠেছিল যে আপস-মীমাংসা চলাকালীন ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ করা হোক। এই মর্মে এক প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। মাননীয় স্যার রবার্ট বেগ। এমন কী তাঁর ওপর চাপ দেওয়া হয়েছিল ধর্মঘট নিষিদ্ধ না করলেও অন্তত ধর্মঘট বিরোধীদের বাধা দেওয়ার জন্য যে পিকেটিং করা হয় তা যেন নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু তিনি এর পক্ষহীন হতে পারেননি। আপাত

১৯৩৬ বর্ষেই আমি তার ভাষণের একটা অংশ। বোম্বাই বিধান পরিষদ বিতর্কের বস : চতুর্থ, পৃষ্ঠা ১৮০-তে তিনি যা বলেছেন তা এই :

“পিকেটিং-এর বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত একটা ব্যাপার আমি উল্লেখ করতে চাই। ১৯৩৬ বর্ষে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে বিরোধ-নিবারক প্রক্রিয়া চলাকালীন তাদের পাবলিক কাজ করতে অথবা দায়িত্ব পালন করতে, “যখন ঐ কাজ বা দায়িত্ব পালনটি বিরোধ-নিবারক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত” বাধা দেওয়ার জন্য ব্যক্তি বিশেষকে যাতে উৎপীড়ন করা না হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, সরকারের এটাই অভিপ্রায় ছিল যে, বিরোধ-নিবারক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবার পর কারখানায় পিকেটিং করার অনুমতি দেওয়া হবে না। এমনকী যদি ধর্মঘটও চলতে থাকে, তবে সব কারখানা চত্বরে পিকেটিং বন্ধ করতে হবে। যদি দুটি পক্ষ মীমাংসায় আসতে চায়, সে ক্ষেত্রে এটাই বাঞ্ছনীয় পদক্ষেপ হবে বলে বিবেচিত হয়েছিল। অপর পক্ষে তালাবন্দি (Lock out) করে কারখানায় শ্রমিকদের ঢুকতে না দেওয়ার ব্যাপারে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে এ রকম বিবেচিত হত যে, পিকেটিং করার অধিকার অনেকটা পবিত্র অধিকারের মতো এবং বিস্তারিত ও সম্যক বিচার-বিবেচনার পর আমরা একটা সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে মনস্থ করেছি ১৯৩৬ বর্ষ থেকে সেই সব শব্দগুলিকে বাদ দিতে যেগুলি কারখানার গেটে পিকেটিং নিষিদ্ধ করে।”

এই দৃষ্টান্তই তিনি নিরেখেছিলেন এবং মস্তশয়, আমি গুরুত্ব দিয়েই বলছি যে, যদি ধর্মঘট অনুমোদিত হয় তবে বিরোধ-নিবারকের সম্ভাবনা বাড়বে। আমার মনে হয় এই দিকটি নিয়ে আদৌ কোনও বিচার-বিবেচনা করা হয়নি। যখন একজন নিয়োগকর্তা জানে যে তার নিজের শক্তি সংগঠিত করে নেবার জন্য ৪ মাস এবং ২৫ দিন সময় পাচ্ছে, যখন সে জানে যে ৪ মাস ২৫ দিনের মধ্যে কোনও শ্রমিক সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পারে না, কোনও শ্রমিক প্রস্তুত হতে পারে না এবং আরও জানে যে ধর্মঘট করার জন্য শ্রমিক সময় পাচ্ছে মোটে দুই মাস, তখন কেন সেই নিয়োগকর্তা বিরোধ-নিবারকের জন্য প্রস্তুত হবে? উৎসাহ দেবার কিছু নেই, চাপ দেবার কিছু নেই, এই রকম পরিস্থিতিতে মীমাংসায় আসতে চাইবার মতো কোনও আগ্রহ নিয়োগকর্তার থাকে না। বিধেয়কটির মাননীয় উপস্থাপক যদি মনে করে থাকেন, এবং তাঁর লক্ষ্য যদি এই হয় যে, বিরোধ নিবারণে প্রশাসনিক ব্যবস্থা

ফলপ্রসূ হোক, প্রত্যক্ষভাবে সুফলদায়ক হোক, যা উভয়পক্ষের পক্ষে গ্রহণীয় হবে, তবে আমি বলব, যে সঠিক পদ্ধতিটি গ্রহণ করা উচিত তা হবে স্যার রবার্ট বেল কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি। যথা, ধর্মঘট চলার অনুমতি দেওয়া, অন্যভাবে বলালে বলতে হয়, বর্তমান আইনের ব্যবস্থাটিকে অব্যাহত রাখা। এখানে সরকার সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও নিতে প্রস্তুত নয়, যা আমলারা নিয়েছিল। আমলারা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল তা হল এই যে, ধর্মঘটে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই যখন একটি জনপ্রিয় সরকার, যে দাবি করে শ্রমিকদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছে, যে সেই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করে না, যে দৃষ্টিভঙ্গি এমন একজন নিয়েছে যাকে তারা সব সময়ে আমলা বলে গণ্য করেছে, শ্রমিকের প্রতি, দেশের কল্যাণের প্রতি যাদের আদৌ কোনও আগ্রহ নেই। এটা যদি গণতন্ত্র হয় বেশ তো, হতেও তো পারে, কিন্তু আমি এটাকে গণতন্ত্র বলি না—যে গণতন্ত্র শ্রমিক শ্রেণীকে দাস করে রাখে, যে শ্রেণী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, জীবনধারণের উপকরণ থেকে বঞ্চিত, যে-কোনও সংগঠন শক্তি থেকে বঞ্চিত, জ্ঞান-বুদ্ধি বিরহিত, আমার মতে সেটা গণতন্ত্র নয়, গণতন্ত্রে পরিহাস মাত্র। বিধেয়কের প্রধান-প্রধান ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে এতটা বলাই যথেষ্ট।

বিধেয়কের আরও কিছু ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই এবং এই ব্যবস্থাগুলি সন্নিবেশিত আছে ৪ থেকে ২০নং খণ্ডে। এই খণ্ডগুলি দেখলে দেখা যাবে যে, তাতে চারটি বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ আছে। সেগুলি উল্লেখ করে বিভিন্ন ইউনিয়নের—যোগাভাসম্পন্ন ইউনিয়ন, নিবন্ধীভূত ইউনিয়ন, প্রতিনিধিত্ব-মূলক ইউনিয়ন। মহাশয়, এই বিধেয়কের আগেকার খসড়াটা পড়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। আগেকার ঐ খসড়ার কিছু ভিন্নতর বাগ্-বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন অনুভূমিক (Horizontal) ইউনিয়ন, শীর্ষদেশীয় (Vertical) ইউনিয়ন, তির্যক (Diagonal) ইউনিয়ন এবং উল্লম্ব (Perpendicular) ইউনিয়ন। আমি বুঝি যে, ঐ সব বাগ্-বৈশিষ্ট্য পরিত্যক্ত হয়েছে। গণিত শাস্ত্রে কখনও আমার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল না এবং অকশ্যই জ্যামিতি সম্পর্কে জ্ঞানও ছিল অতি অল্প এবং আমি মনে করি যে, বাগ্-বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের ফলে আমরা যে সামান্য পরিমাণে উপকৃত হয়েছি তার জন্য মাননীয় উপস্থাপক এবং যারা এই বর্তমান বিধেয়কটি রচনা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানানো সঠিক কাজ হবে। এই খণ্ডগুলি অপর যে বিষয়টি নিয়ে

আলোচনা করে তা হল, বিভিন্ন শ্রেণীর ইউনিয়নগুলির নিবন্ধন (Registration) করার প্রতিবন্ধ (terms), ও শর্তাবলি এবং পদ্ধতি। তৃতীয়ত হল, এই স্বীকৃত ইউনিয়নগুলি বা নিবন্ধিত ইউনিয়নগুলিকে প্রতিনিধিত্বমূলক ইউনিয়ন হিসাবে ঘোষণা করার প্রতিবন্ধ ও শর্তাবলি এবং পদ্ধতি। এবং চতুর্থত হল, ইউনিয়নের নিবন্ধনের জন্য এবং সেটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক ইউনিয়ন হিসাবে ঘোষণার গাঠনকরণের জন্য শর্তাবলি। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, বিধেয়কের প্রধান বিষয়গুলির সঙ্গে এই খণ্ডগুলির কোন ধরনের ব্যবহারিক সম্পর্ক আছে? বিধেয়কের প্রধান বিষয়গুলি এই, প্রথমত, বাধ্যতামূলক বিরোধ-নিবারণ, দ্বিতীয়, বিরোধ-নিবারণ প্রক্রিয়া চলাকালীন ধর্মঘটের জন্য শান্তি প্রদান। আমার ধারণা, এই বিধেয়কের মূল উদ্দেশ্য হিসাবে এই দুটি প্রসঙ্গের আলোচনায় এই খণ্ডগুলির ও অন্যান্য খণ্ডগুলির মধ্যে কোনও যৌগ সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। বিধেয়কটির শিরোনামের প্রসঙ্গে এসে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, বিধেয়কটি তার উদ্দেশ্যটি প্রকাশ করার পরিবর্তে সেটা শুধু রাখার চেষ্টাই করেছে। বিধেয়কটির শিরোনাম বলাহে "আপসে-সীমাংসা এবং সালিসির মাধ্যমে শিল্প বিরোধের শান্তিপূর্ণ ও আপস-নিষ্পত্তির ও আরও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের উন্নতি সাধনের জন্য গণতন্ত্র নির্ধারণের জন্য বিধেয়ক।" এই অন্যান্য বিষয়গুলি কী? এবং কেন সেগুলিকে বিধেয়কের শিরোনামে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়নি; সেগুলি কি এমন ৮৮৭ খার জন্য কেউ লজ্জা বোধ করতে পারে? আমি জানি না। হয় বিধেয়কটির দুই অংশের মধ্যে কিছু ব্যবহারিক সম্পর্ক আছে বা নেই; যদি থাকে তবে তা আপশাই প্রকাশ করা উচিত ছিল এবং যদি কোনও যৌগ সম্পর্ক না থাকে, তবে গৃহসম্মত সিদ্ধান্ত এই হবে যে, এই ধারাগুলিকে বিধেয়ক থেকে বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু মহাশয়, আমার অনুসন্ধানের ফলে যে লাভ হয়েছে তা এই জিনিসটিই খানিকটা করা যে, এই দুটির মধ্যে এক যৌগ সম্পর্ক আছে। সেই যৌগ সম্পর্কটি যে কী তা সহজেই জানা যাবে বিধেয়কের ৭৫নং খণ্ড প্রসঙ্গে এলে। বিধেয়কের ৭৫নং খণ্ড বলাহে :

"এই আইন অনুসারে কোনও কর্মী, কর্মীদের প্রতিনিধির মাধ্যম ছাড়া কোনও শ্রমিক প্রক্রিয়ার সামনে হাজির হবার অধিকারী নয়।"

এই খণ্ডটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি বলব যে এটা অত্যন্ত সর্বনাশা খণ্ড

ভারতের সকল প্রকারের শ্রমিকসংঘের সভ্যের নীতিগুলির ক্ষেত্রে। বিরোধ-নিবারণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করার যার অধিকার আছে সেই কর্মচারী প্রতিনিধিটি কে? ব্যক্তিগত যোগাযোগ যাই হোক না কেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে বিধেয়কের সংজ্ঞা অনুসারে শ্রমিকের প্রতিনিধি নির্ধারিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে শিল্পবিরোধের মীমাংসার জন্য কোনও আলাদা-আলোচনায় মধ্যস্থতা করার অধিকার পাবে না। শ্রমিকের প্রতিনিধি তার সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করার জন্য আমার মাননীয় বন্ধুবিধেয়কে ৪ থেকে ২০ পর্যন্ত খণ্ডগুলিকে সংযোজিত করেছেন। সেগুলি সবই এই ধারার ওপর নির্ভরশীল। অতএব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এই যে, এই বিধেয়ক অনুসারে কে কর্মীদের প্রতিনিধি হবে?

এই বিধেয়ক অনুসারে দুই শ্রেণীর ইউনিয়ন আছে যাদের অধিকার আছে শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করার। প্রথমটি হল সেই ইউনিয়ন, যেখানে মোট কর্মীর ২০ শতাংশ এর সদস্য বা মোট কর্মীর ২০ শতাংশের কম নয় এর সদস্য সংখ্যা এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, যে ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি তারা বিরোধ-নিবারণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। অতএব ইউনিয়নগুলির মাত্র এই দুটি শ্রেণীই শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রয়েছে। আমার মাননীয় বন্ধু মন্ত্রী এই উভয় শ্রেণীকেই 'প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন' বলতে চান। তাঁর পরিভাষা সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। আমার বিবেচনায় না ঘুরিয়ে স্পষ্ট করেই বলা উচিত। স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে আমার নিবেদন : নিসেন্দেহে এই বিধেয়ক অনুসারে দুই ধরনের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন হবে, কিন্তু সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে তা হল, একটি হবে দাস ইউনিয়ন এবং অন্যটি স্বাধীন ইউনিয়ন। মন্ত্রণায়, যদি আমি বলি যে, নিয়োগকর্তার কাছ থেকে পূর্ব অনুমতি নেবার পর-ই যদি কোনও ইউনিয়নের মধ্যস্থতা করার অধিকার, এক বৈধ অস্তিত্ব, প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার এবং কথা বলার অধিকার পায়, তবে সেই ইউনিয়ন একটি দাস ইউনিয়ন এবং স্বাধীন মানুষদের ইউনিয়ন নয়, তবে এই কথার মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই এবং ভাবার অপব্যবহারও করা হয়নি। তিনি যদি 'অনুমোদন' শব্দটি ব্যবহার করতেন, তাহলে ভুল হত। 'স্বীকৃতি' শব্দটি অত্যন্ত অনুপযুক্ত হয়েছে। প্রকৃত সংজ্ঞাটি হওয়া উচিত ছিল, 'নিয়োগকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত ইউনিয়ন', তা হলে আমরা সহজ-সরলভাবে বুঝতে পারতাম, কী

খানাদের অনুমোদন করতে বলা হচ্ছে।

যে জিনিসটা আমার বোধ্যগম্য হচ্ছে না তা হল এই—যা আমার মাননীয় বন্ধু খান বুঝিয়ে বলছেন—প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র পাওয়ার জন্য এই বিধেয়কে নিয়ন্ত্রণকে পূর্বশর্ত কেন করেছেন তিনি? বিধেয়কে প্রদত্ত শর্তগুলিকে অনুধাবন করলে আমার প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। মন্ত্রণায়, আজও বিদ্যমান শর্তগুলি হল এই, ১৯২৬ সালে ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত একটি ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুযায়ী। তার নাম 'ট্রেড ইউনিয়ন আইন' (Trade Unions Act)। বর্তমান বিধেয়কটি সেই আইনটিকে খারিজ করে দিচ্ছে না, বস্তুত আইনটি থেকে যাচ্ছে, এবং এছাড়া এই বিধেয়ক দাবি করছে যে, যে-কোনও ইউনিয়ন এই বিধেয়কের শর্তানুসারে নিবন্ধীভূত (Registered) হবার আগে ঐ আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত হতেই হবে। এটা সুস্পষ্ট হচ্ছে, এই বিধেয়কে প্রদত্ত ইউনিয়নের সংজ্ঞা থেকে। আমি এই সদনকে জানাতে যাচ্ছি কেন এটা করা হয়েছে। আমার মনে হয়, এর পিছনে কোনও অভিসন্ধি আছে। অতএব অবস্থাটি দাঁড়াচ্ছে এই : একটি ইউনিয়নকে দুইবার নিবন্ধীভূত হতে হবে—১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধন এবং এই নতুন আইন অনুসারে নিবন্ধন। আমার মনে হয় যে, ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত ইউনিয়ন কী-কী সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে সেটা উল্লেখ করা ভাল, যার ফলে আমরা জানতে পারব যে, এই বিধেয়ক খারিজ কিছুর দিচ্ছে কি না বা কোনও কিছু কেড়ে নিচ্ছে কি না। ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত হলে ইউনিয়নের ওপর তার প্রভাব কেমন হবে, এ-দিক দিয়ে চিন্তা করে যা জেনেছি তা হল এই : ইউনিয়ন হয়ে ওঠে আইন বলে গঠিত এক নিগম (Corporation) যার অধিকার আছে আদালতে অভিযোগ করার এবং অভিযুক্ত হওয়ার। আইনবলে গঠিত নিগম হিসাবে অবশ্যই তার অধিকার আছে তার সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করার; তা না থাকলে আইন দ্বারা গঠিত নিগমের সমস্তটি অপরিসীম হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, সদন এটা বুঝতে পারবে যে, ১৯৩৫ সালের শ্রম শাসন আইনের অধীনে, ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত একটি ইউনিয়ন রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পায়, অর্থাৎ ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত ইউনিয়ন এই সদনের জন্য সদস্য নির্বাচিত করতে পারে এবং সদনে এমন মাননীয় সদস্য আছেন, যারা এই ঘটনার সত্যতার সপক্ষে

সাক্ষ্য দেন। অনুসৃতভাবে, ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত ইউনিয়নের সদস্যদের বোম্বাই প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকারও আছে। মহাশয়, এখন যে প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে তা হল এই—যদি ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত হবার ফলে ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পায়, তবে এই বিধেয়ক অনুসারে আবার নিবন্ধীভূত হবার প্রয়োজনটা কোথায়? যদি ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত একটি ইউনিয়ন সমগ্র শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে এই সদনে বক্তব্য পেশ করাতে সদস্য পাঠাবার এবং এই সদনে ভোট দেবার যোগ্যতা অর্জন করে থাকে, তবে এই বিধেয়ক অনুসারে নিবন্ধীভূত হবার আবশ্যকতা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর আমি পরে চাইব। বর্তমান বিধেয়কটি যা করতে চাইছে তা খুব-ই বিচিত্র এবং এটাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত ইউনিয়নের প্রয়োজন হবে না এই সদনে পরিস্থিতির স্বাভাবিকতাকে অনুধাবন করার। ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত ইউনিয়ন, আইন পরিষদে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার পর্যাপ্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই বিধেয়ক অনুসারে বিরোধ নিবারণকারীর সামনে শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য নয় কেন? কেন এই অসঙ্গতি? বিধেয়কটি শুধু যে অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে তা নয়, আমি বলব ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত ইউনিয়নগুলির বিশেষ অধিকারও কেড়ে নিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে, '১৯৩৪ সালের বোম্বাই আইনের' (Bombay Act of 1934) শর্তানুসারে যা ঘটত তার প্রতি সদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যে-সব সদস্য ঐ আইনের শর্তাবলি জানেন, তারা স্মরণ করবেন যে বিরোধ-নিবারণ প্রক্রিয়া শুরু হলে ৯নং ধারা অনুসারে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে প্রতিনিধিমণ্ডলী। ঐ আইনে সেই ব্যবস্থাই করা ছিল। ৯নং ধারা এই ভাষায় প্রকাশিত :

"৯নং ধারা অনুসারে প্রাপ্ত নোটিসের ভিত্তিতে শিল্পবিগ্ৰহের সঙ্গে যুক্ত পক্ষগণ বিরোধ-নিবারণকারীর নির্দেশনাসূত্রে তাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী নিয়োগ করবে নোটিসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা এই ব্যাপারে বিরোধ-নিবারণকারীর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে।"

অতএব ১৯৩৪ সালের আইন অনুসারে বিরোধ-নিবারণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করত তাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী। স্বাভাবিক ঐ প্রতিনিধিমণ্ডলী নির্বাচিত

১৯৩৪ সালের আইন অনুসারে বিরোধ-নিবারণকারীর সামনে শ্রমিকের পাঠানো করার জন্য প্রতিনিধিমণ্ডলী নির্বাচিত করার অধিকারী ছিল কেন কেন পক্ষ? ঐ আইনের অধীনে রচিত বিধি-নিয়মগুলি আমি পড়েছি এবং ঐ বিধি-নিয়মগুলির ওপর মনোযোগ দিলে দেখা যাবে যে, প্রতিনিধিমণ্ডলী নির্বাচনে অধিকারী পক্ষগণ ছিল নিবন্ধীভূত ট্রেড ইউনিয়ন এবং ১৯২৬ সালের 'ব্যক্তিগত বিরোধ আইনের' (Trade Dispute Act of 1926) অধীনে নিবন্ধীভূত ইউনিয়নগুলি। ১৯৩৪ সালের 'বোম্বাই আইনের' অধীনে রচিত বিধি-নিয়মগুলির মধ্যে তৎসং বিধি-নিয়মে তার ব্যবস্থা আছে। অতএব এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই মূলতঃ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত ইউনিয়ন, আইনবলে গঠিত এক নিগম হওয়ার দরুন, অধিকারী ছিল সর্বত্র এবং সকল সংযোগস্থলে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার। ১৯৩৪ সালের 'ভারত শাসন আইন' অনুসারে সংবিধানগতভাবে অধিকার দেওয়া হয়েছিল আইন পরিষদে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার এবং '১৯৩৪ সালের বোম্বাই আইন' সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল যে, ঐ আইনের অর্থ্যাৎ '১৯৩৪ সালের বোম্বাই আইনের' অধীনে নিবন্ধীভূত ট্রেড ইউনিয়নগুলিই ছিল একমাত্র সংস্থা যাদের অধিকার ছিল বিরোধ-নিবারণকারীর সমীপে প্রতিনিধিমণ্ডলী পাঠানোর। মহাশয়, আমার প্রথম অভিযোগ এই যে, এই বিধেয়ক, ইউনিয়নগুলির দল মূলতঃ অধিকার কেড়ে নিচ্ছে এবং তা নিচ্ছে—কাকে? নিচ্ছে দল ইউনিয়নগুলিকে, যা একটু পরেই আমি দেখাতে যাচ্ছি। ঐ অধিকার যদি স্বাধীন ইউনিয়নগুলিকে দেওয়া হত তা হলে আমি কিছু মনে করতাম না। কেন ঐ তৎসংপূর্ণ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য—কেন এই বিধেয়ক অনুসারে নিবন্ধীভূত ইউনিয়নকে আবার ১৯২৬ সালের কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত হতে হবে? মহাশয়, এটা কার্পটের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন ছাড়া আর কিছু নয়। আমার মাননীয় বন্ধু চাইছেন যে, এই বিধেয়ক অনুসারে যে-সব ইউনিয়ন গঠিত হবে, সেগুলি শুধু যে বিরোধ-নিবারণকারীর সমীপে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পাবে তা নয়, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টিকে ছড়তে হবে, যা ১৯২৬ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধীভূত ইউনিয়নগুলি এখনও নিজস্বের অধিকারে রেখেছে। এটা শুধু কেড়ে

নেওয়ার নীতি।

এইসব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ কাদের সুবিধার জন্য করা হচ্ছে? আমি আবার বলছি, এসব কিছু করা হচ্ছে অনুগত দাস ইউনিয়নগুলির সুবিধার্থে। অবশ্য আমার মাননীয় বন্ধু যদি মনে করেন যে, মালিকের অনুমোদন প্রাপ্ত নীতির ভিত্তিতে ইউনিয়ন গঠনের সমর্থনকারী (Unionism) মতবাদ গড়ে ওঠাটা কোনও অন্যায় নয়, তবে আমি বিবাদে যাব না। এটা তাঁর জীবন দর্শন, আমার নয়। যদি তিনি মনে করেন যে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষ স্বাধীন মানুষ, তবে সেটা তাঁর নিজস্ব অভিমত। যদি তিনি মনে করেন যে, শিল্পে শান্তি স্থাপনের জন্য শ্রমিককে তার প্রকৃত শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা দরকার, যা বাস্তবে ঘটছে, তা হলেও এটা তাঁর ব্যাপার; আমি আপত্তি জানাব না। কিন্তু আমার ব্যাপারে বলতে পারি যে, এই অবস্থাটা মেনে নিতে পারি না। আমরা নিছক শান্তি চাই না এবং আমি সেই শান্তিকে প্রত্যাখ্যান করি, যে ধরনের শান্তি আমাদের মেনে নিতে বলা হচ্ছে। অবশ্যই এটা সেই মানুষের কাছে শান্তি, যার জঠর পরিতৃপ্ত এবং যার উদর স্খীত হয়ে আছে। ঐ ধরনের শান্তি আমি চাই না।

যে প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমি আগ্রহী তা হল এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমি উদার মনোভাব দেখাতে প্রস্তুত এবং আমি জানতে চাই যে, এই উদার মনোভাব কলপ্রসূ হবে কি না বা সুফল দেবে কি না। আমার মাননীয় বন্ধু যা বলেছেন, সেই হিসাবে ভারতে শ্রমিকসঙ্গে গঠনের সমর্থনপূর্ণ মতবাদ নেই। এটাও হতে পারে যে এমন মানুষ আছে যারা ইউনিয়নগুলির বিকাশকে কিন্তি করতে চায়। আমি আশ্চর্যবিত্ত এই জন্য যে, তিনি এখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের সম্বন্ধে ভীতি পোষণ করেন, যারা আগে কংগ্রেসের পক্ষে কণ্টক স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু এখন তো তাঁরা প্রতিবাদী মনোভাব ত্যাগ করেছেন, তাঁরা শান্তির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করছেন, সত্যকে স্বীকার করছেন, তাঁরা অহিংসাকে মেনে নিচ্ছেন, এমন কী তাঁরা চার আনা দিয়েছেন, যা আমি জেনেছি। আমার প্রশ্ন, তবে কেন তিনি এ রকম আশঙ্কা করছেন যে শ্রমিকের শান্তিপূর্ণ বিকাশের খেলাটি নষ্ট করে নিতে পারে? ধরা যাক তাই হচ্ছে, তবে দেখতে হবে এর শেষ পরিণতি কী? যদি আমার মাননীয় বন্ধু আমাকে বুঝাতে পারেন যে, এমন একটা সময় আসবে যখন যাকে আমি অনুগত দাস

পরিচয়ন বলি, তা স্বাধীন ইউনিয়নে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে, তখন আমি হয়তো আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করব। কিন্তু এ কথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, আদৌ কখনও স্বাধীন ইউনিয়ন হবে না, তার কারণ স্বাধীন ইউনিয়নগুলির ওপর যে-সব শর্ত আরোপ করেছেন সেগুলি এতই অসম্ভব যে, সেগুলি কখনই পূর্ণ করা যাবে না। স্বাধীন ইউনিয়নের জন্য শর্তটি কী? আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার তালিকায় ৫০.১ শতাংশ সদস্য আছে এটাই সেই শর্ত। ২০ শতাংশ যথেষ্ট নয়; ২৫ শতাংশও যথেষ্ট নয়; আপনাকে সব সময়েই ৫০.১ শতাংশের গাণিতিক অনুপাত দেখতে হবে, যদি আপনি স্বাধীন থাকতে চান। যে প্রশ্নটি আমি করতে চাইছি তা হল এই : এটা কি একটা যুক্তিসঙ্গত শর্ত? সাদৃশ্য দেখাবার জন্য আমি দেখাতে চাই যে, রোমক আইন গুরুই হয়েছিল ক্রীতদাস সৃষ্টি করা দিয়ে। প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমরা যা বলে থাকি—ক্রীতদাসত্ব মোচনের ব্যবস্থা ছিল বৈকি। শেষ পর্যন্ত ক্রীতদাস মুক্তি পেত এবং স্বাধীন মানুষ হত, হয়ে উঠত একজন নাগরিক। ঐ সাদৃশ্য দেখিয়ে আমি বলি যে, অমরগণ গুরু করেছিলেন দাসত্ব দিয়ে, অনুমোদন এবং স্বীকৃতি দান দাসত্বের চেয়ে ন্যূন নয়। কিন্তু দাসত্ব থেকে মুক্তির কোনও ব্যবস্থা আছে কি? যদি থাকে সেটা কি যুক্তিসঙ্গত এবং সম্ভাব্য শর্ত যা শ্রমিকরা মেটাতে পারে বলে আশা করা যাবে? শর্তটি এই যে, আপনাকে দেখাতে হবে যেটা শ্রমিকের সংখ্যার ৫০.১ শতাংশ সদস্যপদ আছে কি না, তার একমাত্র তখনই আপনি শৃঙ্খলের বন্ধন এড়াতে পারবেন, মালিকের দেওয়া যন্ত্রণা ও শাস্তি এড়াতে পারবেন। এটা কি সম্ভব হবার যোগ্য শর্ত?

বিপক্ষে চালিত মানুষ হিসাবে সেই আমাদেরই বলা হচ্ছে এমন এক আদর্শ পরিস্থিতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে যা দেখা যায় আহমেদাবাদে। আমাদের বলা হচ্ছে আহমেদাবাদের উদাহরণ এবং আদর্শ অনুসরণ করতে। আমি তা করতে প্রস্তুত। দৃষ্টান্তটি বিচার বিশ্লেষণ করে আমি দেখছি যে, এই প্রশ্নটি করা দরকার হয়ে উঠেছে : এই বিধেয়ক অনুসারে এমন কী আহমেদাবাদ মজুর মহাজনের পক্ষেও একটি স্বাধীন ইউনিয়ন হয়ে ওঠা সম্ভব হবে? ঐ ইউনিয়নটি স্বাধীন শ্রমিকদের ইউনিয়ন হয়ে ওঠার কোনও আশাই আমি দেখতে পাচ্ছি না। আহমেদাবাদ সত্যিই আদর্শ স্থান; রয়্যাল কমিশনও দেখিয়েছে যে ভারতের অন্য কোথাও এমন আদর্শ সংস্থা নেই। ওখানে মুষ্টিমের মুসলমান বাদে নিরোপকর্তা ও কর্মীদের ধর্ম এক। ঐ

মুসলমানরা তাঁরা ইউনিয়নভুক্ত নয়। কর্মীরা সেই ভাষাতেই কথা বলে যেটা তাদের মালিকের ভাষা। ওখানে সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। অতএব যে সব ঐক্যবিশিষ্ট প্রকৃতি, ত্রু-সব বিরূপ প্রকৃতি অন্য পরিস্থিতিতে আশঙ্কা করা যেতে পারে, সেগুলি সেখানে অনুপস্থিত। অনুকূল পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে আহমেদাবাদ মজুর মহাজন। দুই দশকের বেশি হয়ে গেছে এর বয়স। আমাকে জানানো হয়েছে যে, ১৮ বছর বয়সে কিস্তিমান আছে এটা। এই ইউনিয়নটির অবস্থা কেমন? ১৯৩৮ সালের মে মাসের 'লেবার গেজেট' নামক গ্রন্থে প্রদত্ত পরিসংখ্যান আমার কাছে আছে এবং তা বিশ্লেষণ করে আমি দেখছি যে, এটাই ছিল আহমেদাবাদের পরিস্থিতি। আমি কেবলমাত্র বস্ত্র শিল্পকেই নিছি। আহমেদাবাদে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা হল ৯০,০০০। ইউনিয়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর্মীদের মোট সংখ্যা কত? সবাই জানেন যে, মজুর মহাজন একটি সংঘ, যাতে ৫টি ইউনিয়ন আছে এবং মোট সংখ্যা হল ২২,০০০। এই সংখ্যা ছিল ১৯৩৮ সালের ১ মে পর্যন্ত। অঙ্ক কবলে,—গণিতশাস্ত্রে আমার জ্ঞান অতি অল্প—আমার পরিসংখ্যান কেউ সংশোধন করে দিলে বাধিত থাকব—অঙ্ক কবলে আমার মতে, ঐ সংখ্যা হল মোট সংখ্যার ২১ শতাংশ; অর্থাৎ ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা হল বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত মোট কর্মী সংখ্যার ২১ শতাংশ। এই মাপকাঠিটি আমি আগে যা বলেছি, যদি আহমেদাবাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়, তাতে কেউ কি বলতে পারে যে, যদি ঐ সংস্থা নিবন্ধীভুক্ত হবার জন্য আবেদন করে তবে তারা নিয়োগকর্তার অনুমোদন ছাড়াই তা করতে পারে কি না? — না।

আমি গুরুত্ব আরোপ করে বলতে চেয়েছিলাম যে, এই বিধেয়কে নির্দেশিত শর্তাবলি অনুসারে এই দেশে কোনও স্বাধীন ইউনিয়ন গড়ে ওঠার সুযোগ নেই এবং আহমেদাবাদ কারখানা শ্রমিক ইউনিয়নের অবস্থা উল্লেখ করে আমার বক্তব্য প্রাঞ্জল করতে চেয়েছিলাম এবং আমি দেখিয়েছিলাম যে আহমেদাবাদের মতো অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশেও মজুর মহাজনের পক্ষে স্বাধীন ইউনিয়ন হওয়া সম্ভব না এবং এই আইন অনুসারে নিয়োগকর্তাদের অনুমতি না নিয়ে স্বীকৃতি লাভের অফিসারী নয়। মহাশয়, বাস্তবিক পক্ষে এটা এমন-ই এক অসম্ভব শর্ত যে ইংল্যান্ডের মতো শিল্পক্ষেত্রে সুসংগঠিত দেশেও তা বাস্তবায়িত করা অসম্ভব হবে। দুর্ভাগ্যবশত যে-সব গ্রন্থ আমি পেয়েছি, তার পরিসংখ্যানও ছাড়া থেকে দেশের

বিভিন্ন ইউনিয়নের মোট সদস্য সংখ্যার তথ্য জানতে পেরেছি কিন্তু এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত লোকের মোট সংখ্যা কোথাও খুঁজে পাইনি : এবং তার ফলে ইংল্যান্ডে কর্মীদের, যাদের ঐ দেশের ইউনিয়নের সদস্য বলা যেতে পারে, মোট শতাংশে খুঁজে বের করা আদৌ সম্ভব কাজ নয়। কিন্তু আমার কাছে এখানে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত শ্রী ওয়াল্টার সিট্রিনের (Walter Citrine) লেখা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। ইংল্যান্ডে যারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা সবাই জানেন যে, ঐ লেখক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং তাই তাঁর রচিত গ্রন্থটি সেই বিচার্য-বিষয় সম্পর্কে এক প্রামাণ্য বক্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে যা নিয়ে আমরা বিচার-বিস্তেচনা করছি। তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৯২৪ সালের শেষে—পরিসংখ্যানগুলি দুর্ভাগ্যবশত অতি সাম্প্রতিক কালের নয়—ইংল্যান্ডের অবস্থা ছিল এই রকম যে, বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ১৮০ লক্ষ, অর্থাৎ নারী-পুরুষ মিলিয়ে ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৫৫,৩১,০০০। যার অর্থ হল এই যে, এটা অবশ্যই ৩০ শতাংশের বেশি নয়। এক্ষণে, এটাই যদি ইংল্যান্ডের অবস্থা হয়, যেখানে শ্রমিকরা এত সুসংগঠিত, যেখানে শিল্প এত ব্যাপকভাবে সংস্কারিত, তবে ভারতের মতো দেশে আমরা কি ই বা আশা করতে পারি? অতএব, মহাশয়, আমার নিবেদন এই যে, এই বিধেয়ক যে শর্ত আবেদন করেছে তা এক অসম্ভব শর্ত এবং কোনও শ্রমিক সংগঠনের মতো কোনও সংগঠন-ই আমি আগামী ১০ বা ২০ বছরের মধ্যেও গঠনা করতে পারছি না যা নিজস্বের শক্তি ততটা সহজে করবে যার ফলে ৫১ শতাংশের মতো সদস্য সংখ্যা সব সময়ে দেখাতে পারবে। ফলে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে যে ধর্মঘটে বিরোধ-নিবারণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবে শুধু সেই ধরনেরই শ্রমিক ইউনিয়ন, যারা মালিকদের স্বীকৃতি পাওয়া অনুগত দাস ইউনিয়ন ছাড়া আর কিছু না।

আরও দুটি প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্নটি হল—ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ন্যাকশে এই বিধেয়কের প্রভাব কতটা পড়বে? এই দৃষ্টিকোণের বিচারে আমার নিবেদন এই যে, এই বিধেয়কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি হল খণ্ড ৮, উপখণ্ড (৮)। ঐ খণ্ডটি একটি নীতি পেশ করে, যা আমি পরীক্ষা করব এবং দেখাব, যা খণ্ডত অপ্রচলিত চরিত্রের। খণ্ডটি বলছে “নিবন্ধক (Registrar) কোনও শিল্প বা

কোনও ব্যবসাতে কোনও এক স্থানীয় এলাকায় একটির বেশি ইউনিয়নকে নিবন্ধীভূত করবে না।" অন্যভাবে কলা যায় যে, বিধেয়কটি যে ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে তা এই : এতে কলা হচ্ছে যে, শ্রমিকরা যদি নিজেদের একটি ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত করতে চায় তবে তারা একটি শিল্প বা ব্যবসায় একটি মাত্র ইউনিয়ন পেতে পারে ক্ষেত্রবিশেষ অনুসারে। অন্যভাবে কলা যেতে পারে যে, বিধেয়কটি শ্রমিকদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, যদি তারা একটি ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হচ্ছে ইচ্ছা করে, তবে একটি নির্দিষ্ট স্থানীয় এলাকায় একটি শিল্প বা একটি মাত্র ব্যবসায় একটি মাত্র ইউনিয়ন পেতে পারে। বিধেয়কে প্রদত্ত ব্যবস্থাটি, আমি যে বিষয়ে নিশ্চিত, এই দেশে ইউনিয়নগুলির বৃদ্ধির ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করবে। প্রথমত, এই বিধেয়কের মাননীয় উত্থাপকের কাছ থেকে এটা জানতে চাইব যে—এই নীতিটি পৃথিবীর অন্য কোনও অংশে প্রয়োগ করা হয়েছে কি? গ্রেট ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের শর্তগুলির আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি এবং এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদক্ষ এমন একজন বিশেষজ্ঞের কথা উল্লেখ করতে প্রস্তুত এটা প্রমাণ করতে যে, সুনিশ্চিতভাবে গ্রেট ব্রিটেনে আইন আদৌ সে রকম কোনও ব্যবস্থা করে রাখেনি। বস্তুত ইংল্যান্ডের আইন কর্মীদের ওপর-ই দায়িত্ব অর্পণ করেছে তাদের নিজেদের পছন্দমতো পন্থা অবলম্বন করার। এমন কোনও বিধিনিয়ম নেই যে, ইউনিয়নকে একটি মাত্র শিল্পের মধ্যে অবশ্যই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, ইউনিয়নকে একটি মাত্র ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে হবে। এমন কোনও নিয়ম নেই যে, ইউনিয়ন শুধু একটি মাত্র এলাকার আওতাভুক্ত হয়ে থাকবে। সম্ভ্রুতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থের অংশ বিশেষের ওপর, গ্রন্থটির নাম 'গ্রেট ব্রিটেনের কর্মনিয়োগ কেন্দ্র পরিষেবা', (The Employment Exchange Service of Great Britain) লিখেছেন শেবউইডেন (Chegwidden) এবং মায়রডিন ইভান্স (Myrddin Evans) এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত :—

"একটি নির্দিষ্ট শিল্পের সব কর্মীদের একই ইউনিয়নের অধীনে সংগঠিত হতে হবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই, তারা কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ইউনিয়নের লোভ হতে পারে : কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংগঠনটি হয় জেলাভিত্তিক, অন্যত্র কবসা ভিত্তিতে এবং কোনও এক নির্দিষ্ট শিল্পের কর্মীদের একটা অংশ অন্য কোনও ইউনিয়নের সদস্য হতে পারে যা স্বাভাবিকভাবে অন্য শিল্পের কর্মীদের চাহিদা মেটাতে অক্ষম।"

কোনও এক সাধারণ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হতে পারে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে শাখাবিভক্ত ইউনিয়নগুলি একটি সম্মুখ বা সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট শিল্পের বৃহত্তর অংশ বা সমগ্রকে নিয়ে গঠিত ইউনিয়নে সংযুক্ত অথবা সাধারণ শ্রমিক ইউনিয়নের যে-কোনও সংঘ বা বিভিন্ন শিল্পে এক বা অনুরূপ ব্যবসায় সদস্যদের নিয়ে সংঘ বা ইউনিয়ন গড়ে থাকে।"

এ থেকে দেখা যায় যে, ইংল্যান্ডে সাধারণ শ্রমিক ইউনিয়ন থাকতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত কর্মীরা একসঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারে। এটাকেই বলে সাধারণ শ্রমিক ইউনিয়ন। শিল্পক্ষেত্রে বা ব্যবসার ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধাবদ্ধ না-ও হতে পারে। একটি সাধারণ ইউনিয়ন থাকতে পারে। এই লেখক বলছেন যে, ইংল্যান্ডে বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি একটি মাত্র ইউনিয়ন গঠন করতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন খনি-শ্রমিক অন্য কোনও ইউনিয়নের সদস্য হতে পারে, যার সঙ্গে খনির কোনও সম্পর্ক নেই। অতএব ইংল্যান্ডে কীভাবে, কোন পরিস্থিতিতে তারা সংগঠিত হবে, এ সিদ্ধান্ত নেবার ভার কর্মীদের উপর-ই সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে ইংল্যান্ডের আইন। আইন শুধু এইটুকু সম্বন্ধেই যত্নশীল যে, ইউনিয়ন যেন যে-আইনি সংস্থা হয়ে না যায়। আইন শুধু এই বিষয়ের ওপর নজর রাখতে চায়, যাতে নিবন্ধীভূত হবার আগে ইউনিয়নের যেন সেই সব লক্ষ্যমাত্রা থাকে যেগুলি আইনের চোখে আইনসম্মত। ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটি পরীক্ষা করে দেখা ছাড়া ইংল্যান্ডের আইন অবশ্যই দৃষ্টি দেয় না, ইউনিয়নটি এক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংগঠিত বা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংগঠিত নয় কি না তা দেখার ব্যাপারে এবং আমি ভেবে পাই না কেন এই নীতিটি আমাদের দেশে প্রামদানি করা হবে না? এর কোনও যৌক্তিকতা আমি দেখি না এবং বর্তমানে যে নীতিটি বিধেয়কে প্রবর্তিত করা হচ্ছে তা কেন জানি না।

একটি মাত্র ব্যবসায় বা একটিমাত্র শিল্পে সব শ্রমিকদের একটি মাত্র ইউনিয়ন থাকা কি সম্ভব? আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে এই কারণেই তা সম্ভব নয়। সবলেই জানেন যে, একটি ট্রেড ইউনিয়নের তিনটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা তিনটি বিভিন্ন লক্ষ্য আছে। ট্রেড ইউনিয়নের কেবলমাত্র ট্রেড ইউনিয়নজনিত উদ্দেশ্য থাকতে পারে অর্থাৎ কর্মী হিসাবে তাদের নির্দিষ্ট স্বার্থের উন্নয়ন, মজুরি, মজুরি ঘণ্টা, শিল্পে পদোন্নতি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত উদ্দেশ্যসমূহ থাকতে পারে।

এগুলিকেই বলা হয় নিম্নক ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্য। এর অতিরিক্ত ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য থাকতে পারে। বিধবাদের জন্য অবসর ভাতা প্রদান, বেকারভূক্তনিত সুযোগ-সুবিধা দান এবং সদস্যদের বার্ষিক-ভাতা প্রদান প্রভৃতি দিতে পারে এমন সামাজিক দাবি ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হতে পারে। ইংলন্ড এগুলিকে গণ্য করা হয় সামাজিক উদ্দেশ্য হিসাবে। এ ছাড়া ট্রেড ইউনিয়নের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। যে উদ্দেশ্যটির লক্ষ্য হল নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সুরক্ষার জন্য যেটি সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করবে ইউনিয়ন, সেই অনুযায়ী রাজনীতির বিশেষ পন্থাটির উন্নতিসাধন করা। আমি যে প্রশ্নটি করতে চাই তা হল এই—কোনও নির্দিষ্ট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একমত হওয়া কি সম্ভব? সব ক্ষেত্রে ইতিবাচক উত্তর দেওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না আমার এবং কেন ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যাবে না তা দেখাবার জন্য আমি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। এই ধরনের একটি ঘটনার অবতারণা করছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বোম্বাইতে বস্ত্রশিল্পে একমল মানুষ কাজ করে এবং এই ব্যাপারে আমি বিশেষ সতর্ক হব এই কারণে যে, আমি আমার বক্তব্যের উপর জোর দিতে চাই। কিন্তু মুসলমান সদস্য আছে, তারা কারখানা শিল্পের কর্মী। তারা ট্রেড ইউনিয়ানের সদস্য হতে ব্যস্ত। কিন্তু অপর অ-মুসলমান কর্মীরা চায় ইউনিয়নের সদস্যরা যাতে কংগ্রেসি রাজনৈতিক পন্থা অনুসরণ করে। মুসলমান সদস্যরা ইউনিয়নে যোগ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তারা মুসলিম লিগের রাজনীতি মেনে চলতে বেশি পছন্দ করে। কীভাবে দুটি জন-গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, যদি না দুই পক্ষের এক পক্ষ তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি বর্জন করতে রাজি হয়? আর একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের কিছু সদস্য আছে। তারাও কোনও এক ইউনিয়নের সদস্য হতে চায়। কিন্তু তারা এটাও দাবি করে যে, তারা যে সম্প্রদায় থেকে এসেছে সেই সম্প্রদায়ের কিছু-কিছু সামাজিক উদ্দেশ্য ও সামাজিক লক্ষ্যের উন্নতিসাধন করুক ঐ ইউনিয়ন। তারা চায় আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা তাদের দেওয়া হোক। অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীরা তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত নয়। তা হলে কীভাবে ইউনিয়ন গড়ে উঠবে? আমি বুঝতে পারি না। অতএব আমি এটাও বুঝতে পারি না যে, কেন আপনারা এমন

শর্ত আরোপ করবেন, যার ফলে সাফল্যলাভ করা অসম্ভব হয়ে যায়? আমার মনে উচিত যে, এই বিষয়কে যে প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেটা ঠিক ততটাই সুবিবেচিত অথবা ততটাই দূরদর্শী যতটা একজন স্বাস্থ্য আধিকারিককে একটি নির্দিষ্ট ধরনের বাড়ি তৈরি করতে বলা হলে হয়। তাতে দক্ষিমমুখী একটা দরজা থাকবে, উত্তরমুখী কোনও দরজা থাকবে না, এক নির্দিষ্ট ধরনের জানালাই গুণ থাকবে, এক নির্দিষ্ট উচ্চতার বেশি উঁচু হবে না বাড়িটা, গৃহটির সম্মুখভাগে থাকবে এক নির্দিষ্ট ধরনের উচ্চতা। এই সব নিয়ম মেনে হয় বাড়ি তৈরি করো, নয় পথ দেখো। এই ধরনেরই বিকল্প কর্মীদের উপস্থার দিচ্ছে এই বিষয়ক। শ্রমিকদের সংগঠনের ব্যাপারটা যদি শ্রমিকদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ক্ষতি কী হবে? আপনারা এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আমি বুঝতে পারছি না। কেন এবং কেনই বা এটা চাইছেন আপনারা এবং কী পাবেন একটি শিল্প কর্মরত সব কর্মীকে একটি মাত্র ইউনিয়নভুক্ত করে? এটাও আমি বুঝতে পারি না। অপর পক্ষে, আমি আপে যা বলেছিলাম সেই অনুসারে আমার অভিমত এই যে, এই সব অবাস্তব শর্তাবলি যদি আরোপ করেন তবে মানুষ আদৌ যত্নশীল হবে না ইউনিয়ন গঠনে। মুসলমানরা যদি বেশি পছন্দ করে, এবং আমার বিবেচনায় তাদের নিজস্ব রাজনীতি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এ ব্যাপারে আমরা সবাই একমত হব, যদি তারা বেশি পছন্দ করে যে মুসলিম লিগের নির্দেশিত নীতি বাদ তাদের ট্রেড ইউনিয়নকে অনুসরণ করতে না দেওয়া হয়, তবে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। তাদের আদৌ কোনও ইউনিয়ন থাকারও দরকার নেই। একই ভাবে যদি অস্পৃশ্যরা অনুভব করে যে, যদি তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ও তাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনের কিছু সুখ-স্বাস্থ্য-বর্ষক বস্তুর ব্যবস্থা করা না হয়, তবে তাদেরও এটা দরকার নেই। এর দ্বারা কেন ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করছেন আপনারা? যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করছেন আপনারা তা দিয়ে কোনওরকম বাধা করছেন আদৌ কোনও ইউনিয়ন না গড়তে এবং তাই আমার মত যে, এটা এমন একটা কবস্থা যা চরম ক্ষতিকারক প্রকৃতির পরিপূর্ণ।

৪ থেকে ২০নং শর্তাবলি থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টির উদ্ভব হচ্ছে তা এই— ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্থায়ীত্বের ওপর এই বিষয়কের প্রভাব কীভাবে পড়তে চলেছে? ঘরা যাক, মালিকেরা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক কোনও এক ধরনের

ট্রেড ইউনিয়ন আত্মপ্রকাশ করল, তা হলে এই বিধেয়কের সন্নিবেশিত শর্তাবলি অনুসারে এমন কোনও প্রত্যাবৃত্তি (Guarantee) থাকবে কি যে ঐ ইউনিয়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন হিসাবে টিকে থাকবে? এই বিধেয়কের শর্তাবলি আমি যতটা বুঝছি তা এই যে, একবার নিবন্ধীভূত হয়ে যাবার পর ইউনিয়ন ঐ নিবন্ধনের সুবিধাগুলি ভোগ করে চলবে। ১০নং খণ্ডটি সবচেয়ে বিপজ্জনক খণ্ড। ঐ খণ্ডটি সবচেয়ে ইউনিয়নের মাথায় খাঁড়ার মতো কুলে থাকবে। নিবন্ধীভূত হওয়া সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব সব সময়েই বিপর্যয় হয়ে থাকবে এবং ইউনিয়নটি কখনওই নিশ্চিত থাকতে পারবে না যে আজ তার বৈধ অস্তিত্ব থাকলেও। আগামীকাল তা না-ও থাকতে পারে, কারণ এই খণ্ডের শর্তানুসারে ইউনিয়নটির নিবন্ধন বাতিল হতে পারে যে কোনও সময়ে। অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং একবার নিবন্ধন বাতিল হলে, যে প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের সঙ্গে, প্রচণ্ড উদ্যমে সমগ্র পরিকাঠামোটি গড়ে তোলা হয়েছিল, তা ধুয়ে-মুছে সাক হয়ে যাবে। এরপর মহাশয়, আরও একটি বিপদ আছে এই বিধেয়কে। সেটা এই যে যদি নিবন্ধনের বাতিল করার ব্যাপারটি প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন বা নিয়োগকর্তার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তার অর্থ হবে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা, পারস্পরিক ঈর্ষা এবং প্রাণঘাতী প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য। অতএব, এই বিধেয়ক অনুসারে একবার নিবন্ধীভূত ইউনিয়ন তার স্থায়ী অস্তিত্ব ভোগ করার জন্য সব সময়ে দেখাতে হবে যে, মোট কর্মী সংখ্যার ৫১ শতাংশ সদস্য তার আছে। মহাশয়, আমি আবার প্রশ্নটি করছি: মোট নিবন্ধন কর্মী সংখ্যার ৫১ শতাংশ সদস্যপদ দেখানো কি কোনও ইউনিয়নের পক্ষে সম্ভব? আমার মতে যদি আমি সদস্যকে দেখাই যে, কিভাবে বজ্র-বজ্র ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ ওঠা-নামা করে তবে সেটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হবে। গ্রেট ব্রিটেন থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে উদ্ধৃত করে এই পরিসংখ্যানটি পেশ করছি। ১৮৯২ সালে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ১৫,৭৬,০০০। ১৯১০ সালে ছিল ২৫,৬৫,০০০। ১৯২০ সালে ৮৩,৪৬,০০০ কিন্তু ১৯৩৪ সালে তা নেমে আসে ৪৪,৪১,০০০-তে। দশ বছরে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ত্রুটি পেয়েছিল ৫০ শতাংশ। নির্দিষ্ট একটি শিল্পের পরিসংখ্যান নেওয়া যাক। ১৯২০ সালে কৃষিশিল্পে মোট সদস্য ছিল ২,১০,০০০। ১৯৩২ সালে মাত্র ৩৩,০০০। ২,১০,০০০ থেকে কমে দাঁড়ায় ৩৩,০০০-এ। ১৯২০ সালে কয়লা খনি

শিল্পে সদস্যসংখ্যা ছিল ১১,১৫,০০০। ১৯৩২ সালে তা কমে হয়েছিল ৫, ৫৪,০০০। গাঢ়শিল্পে ১৯২০ সালে সংখ্যাটি ছিল ১১,৭২,০০০। ১৯৩২ সালে সদস্য ছিল ৫,২৭,০০০। বাস্তব শিল্পে সদস্যের সংখ্যা ছিল ১৯২০ সালে ৫,৬৩,০০০। ১৯৩২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২,৭৫,০০০। ১৯২০ সালে পরিবহন ও সাধারণ শ্রমে মোট সংখ্যা ছিল ১৬,৮৫,০০০। ১৯৩২ সালে তা কমে হয়েছিল ৬,৬০,০০০। ১৯২০ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা নিলে দেখা যাবে যে মোট সদস্য ছিল ৬৫,০৫,০০০ কিন্তু ১৯৩২ সালে ৩৬,১৩,০০০ হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের মতো দেশে, যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন করাকে শ্রমজীবী মানুষের নিরাশ-প্রশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়, সেখানেই যদি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা এক দশকের মধ্যে ৫০ শতাংশ ওঠা নামা করে, তবে আমি বুঝতে পারি না কেন আমাদের এই দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগঠক সংস্থাগুলির কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে সব সময়ে ৫১ শতাংশ সদস্য রাখতে হবে তালিকাভুক্ত করে। যদি সদস্যপদ এক শতাংশও কমে, তবে ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবে। পুরো প্রদর্শনীটিকেই ওড়িয়ে ফেলতে হবে। আমার প্রশ্ন, এটা কি একটা যুক্তিসঙ্গত শর্ত? এটা কি এমন একটা শর্ত যা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি সুনিশ্চিত করবে? যদি নিবন্ধীভূত প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল হতে পারে এবং প্রতিদিন সেই আশঙ্কায় তারা দিন কাটায়, তবে এই দেশে ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশের সম্ভাবনা কতটা থাকবে?

অপর একটি দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রকার। এই বিধেয়ক অনুসারে কোনও ব্যক্তি, যাকে ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, সে কিন্তু তার নিজের ইউনিয়নের নিবন্ধনের জন্য বাধেন নাও করতে পারে। প্রস্তাবটির বৌদ্ধিকতা আমি সঠিক অনুধাবন করতে পারি, যদি নিবন্ধন বাতিল করার অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে এমন এক ইউনিয়নের সদস্যদের, যারা এমন এক অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে ছিল যাতে খাগসংখ্যক সদস্য থাকার কারণে নিজেদের নিবন্ধীভূত করতে সক্ষম হয়েছিল। ঐ পরিস্থিতিটা আমি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারি, কিন্তু বিধেয়কের ১০নং খণ্ডের পরিস্থিতিতে দেখা যাবে যে, ঐ ব্যক্তিটিকে তার নিজের ইউনিয়নের নিবন্ধীভূত করিয়ে নেবার মতো অবস্থায় থাকার দরকার নেই। অর্থাৎ, শিল্পে নিবন্ধন সদস্যদের মধ্যে ৫১ শতাংশ সদস্য তার নিয়ন্ত্রণে নাও থাকতে পারে। এই

অনিষ্ট সাধন করা মানুষটির যেটুকু দরকার তা হল নিয়োগকর্তার নামের তালিকায় এবং ইউনিয়নের নামের তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৫০ শতাংশের নিচে আছে শুধু তাই প্রমাণ করা। যা বলেছিলাম, শিল্প-পরিবেশে যেখানে কাজের পরিমাণ ওঠা-নামা করে, শ্রমিকের সংখ্যা ওঠা-নামা করে সেখানে এই সব শর্ত পালন করা অসম্ভব।

আর একটি শর্ত সম্বন্ধে সদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি প্রয়োজন মনে করি। যে ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল হয়ে গেছে তার কী হবে? তা কি আবার নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারবে? তার উত্তর হল, না। বিধেয়কের ৫৪নং খণ্ড 'শিল্প আদালত' (Industrial Court) ক্ষমতা দিয়েছে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঘোষণা করতে যে, ইউনিয়ন তার নিবন্ধনের অধিকার হারিয়েছে। ঐ খণ্ড বলেছে :

“এই আইন অনুসারে কোনও প্রক্রিয়ায় যদি ‘শিল্প-আদালত’ (Industrial Court) দেখে যে, যদি কোনও ইউনিয়নের নিবন্ধন অথবা কোনও ইউনিয়ন সম্পর্কে সেটা যে বৈধ ইউনিয়ন তার ঘোষণা বা প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন হিসাবে তার নিবন্ধন ভুলবশত মিথ্যা পরিচয়ে বা জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে বা ঐ ইউনিয়ন এই আইনের কোনও একটি শর্ত উল্লঙ্ঘন করেছে তবে ঐ ‘শিল্প-আদালত’ (Industrial Court) নির্দেশ দিতে পারে ঐ ধরনের ইউনিয়নের নিবন্ধন বা ঐ ধরনের ইউনিয়নকে যোগ্যতাসম্পন্ন বৈধ ইউনিয়ন হিসাবে ঘোষণা বা প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন হিসাবে মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি বাতিল করার নির্দেশ দিতে পারে।”

এবার আসা বাক ৮নং খণ্ড যাতে নিবন্ধনকে নির্দেশ দেওয়া আছে নিবন্ধনের ব্যাপারে তাকে কী-কী বিধি-নিয়ম মেনে চলাতে হবে। সদনই প্রত্যক্ষ করবে আমি যা বলছি তা সর্বোপ সত্য। ৮নং খণ্ডে আছে :

“৭নং ধারা অনুসারে নিবন্ধীভুক্ত করার জন্য ইউনিয়নের কাছ থেকে আবেদনপত্র পাবার পর এবং নির্ধারিত ফী (Fee) দেবার পর, নিবন্ধক তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী বোঝ-খবর নেবেন এবং ৭নং ধারায় নির্দেশিত নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি যদি ঐ ইউনিয়ন পূরণ করে থাকে বলে তিনি সন্তুষ্ট হন তবে এই আইন অনুসারে নিবন্ধনের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবে না।”

৮নং খণ্ডে নির্দেশিত শর্তাবলির এটাও একটা অন্যতম শর্ত যে ইউনিয়নকে ৫৪নং খণ্ড অনুসারে অবশ্যই অযোগ্য ঘোষিত হবে না। এবার আমি যে প্রকৃতি করতে চাই তা এই, কেন এই চিরস্থায়ী নির্যোগতার ব্যাপারটি থাকবে?

মাননীয়ভাবে অযোগ্য ঘোষিত হতে যে পারে, সে বিষয়ে আমি একমত। এরকম গ্রাণ্ড দেখানো যেতে পারে যে, জালিয়াতি করে, মিথ্যা পরিচয়ে যে ব্যক্তি নিবন্ধন করিয়েছে তাকে কিছুকালের জন্য অপেক্ষাধীন (Probation) রাখা উচিত। এই ধরনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা আমি বেশ ভালমতো বুঝতে পারি। কিন্তু সেই সব শর্তের যৌক্তিকতা বুঝতে পারি না যাতে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে জালিয়াতি বা মিথ্যা-পরিচয় দানের দোষে দোষী, তাকে চিরকালের মত এমন কি নিবন্ধকের সামনে যেতে পর্যন্ত দেওয়া হবে না এবং তার ইউনিয়ন নিবন্ধন পাবে না। মস্তশয়, এই প্রসঙ্গে সেই সব শর্তের উল্লেখ করতে দেওয়া হোক আমাদের, যা আমরা পেয়েছি ১৯৩৫ সালের ‘ভারত শাসন আইনে’। আমাদের এই সদনের সদস্যদের নির্যোগতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ‘ভারত শাসন আইন’ের বিধি অনুসারে। আমরা জানি যে নির্যোগতার কারণে মানুষ নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে না, এবং কিছু লোক নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও বিধানমণ্ডলের সদস্য হতে পারে না কারণ তাদের পর্যাঙ্কীয় যোগ্যতা নেই। যাদের অযোগ্য ঘোষণা করা হতে যাচ্ছিল আমি ছিলাম তাদেরই একজন, কিন্তু শোনা যায় সরকার আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে এবং আমার আসনটি আমার জন্যে টিকিয়ে রাখে কোনও রকমে; তা না হলে আমিও অযোগ্য হয়ে যেতাম। কিন্তু যে কথাটি আমি কলার চেষ্টা করছি তা এই যে, ‘ভারত শাসন আইনে’ যে নির্যোগতার উল্লেখ আছে তা নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী নয়। ঐ নির্যোগতাগুলি সাময়িক। কালক্রমে একবার এই অযোগ্যতার কারণগুলি অভিন্নপন্ন হয়ে গেলে সেই সদস্য নির্বাচনে আমার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং এই সদনের সদস্য হতে পারেন। যদি এই নীতিটি ‘ভারত শাসন আইন’ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, যদি সদস্যদের যাদের সব রকম নৈতিক গুণতমুভ হওয়ার কথা, তাঁদের কোনওরকম নৈতিক অসচ্ছরিত্বতা নেই নিজেদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতা এই সদনে সন্তোষের সঙ্গে পালন করার ব্যাপারে যদি তাদের নির্যোগতা স্থায়ী না হয়, তবে আমি প্রশ্ন করব শ্রমিকদের সংগঠিত করেছে এমন ব্যক্তিদের নির্যোগতা কেন স্থায়ী হবে? এর কোনও উত্তর আমি বুজে পাচ্ছি না। প্রকৃতপক্ষে, আমি এ কথাই বলতে চাই যে, এই শর্তটি কলিকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের পূর্ণাঙ্গ (Full Bench) আদালতের রায়কে প্রকৃত অর্থে আইনত বাতিল করে দিচ্ছে।

অবশ্যই একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বিধেয়ক শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে আচরণে সামান্য বিষয়টি প্রবর্তন করতে পারে। কারণ ঠিক যেভাবে এই বিধেয়ক শ্রমজীবী মানুষের ধর্মঘটকে দণ্ডিত করে, ঠিক সেইভাবে

মালিকদের শাস্তি দেয় তালাবন্দি (Lockout) করার জন্য। আমি মনে করি না যে, এই অবস্থাটিকে কয়েক মাস ধরে রাখা যাবে। কারণ আমি অবশ্যই দুই-একটা ঘটনা দেখেছি যেখানে মালিক ও কর্মচারীর মধ্যে প্রভেদ রাখা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমি ২৮নং খণ্ডের অধীনে নোটিসের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করছি। মালিক নোটিস দিতে বাধ্য (১) স্থায়ী আদেশের জন্য, (২) দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত শিল্প-সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোনও পরিবর্তন সাধনের জন্য। কর্মচারীদের প্রসঙ্গে এলে দেখতে পাই যে, স্থায়ী আদেশ এবং দ্বিতীয় তফসিলে অপরিহার্যভাবে সীমাবদ্ধ নয় এমন শিল্প-সংক্রান্ত পরিবর্তন সাধনের জন্য কর্মচারীর তরফ থেকে নোটিস দিতে হবে। এটা অবশ্যই উভয়ের অবস্থার মধ্যে সমতার নির্দেশক নয়। হাজার হাজার ব্যাপারে, মালিক হাজার না হলে অবশ্যই তার শাস্তি হয় না। কিন্তু ইউনিয়ন হাজার না হলে কর্মচারীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি হয় বাধ্যতামূলক। যদি কেউ হাজার না হয়, তবে শ্রম-আধিকারিক ভেদ থাকলেই, যিনি শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এবং সালিসির পর যে চুক্তি হয় সেটা শ্রমিক মেনে নিতে বাধ্য করান, শ্রমিক ঐ সালিসি মেনে নিতে অস্বীকার করলেও এবং তার স্বার্থ ঐ আধিকারিকের মারফত পেশ করতে প্রস্তুত না থাকলেও।

আমাদের এই শিল্পে বর্তমানে কী ঘটছে? বোধহিঁতে আমাদের কারখানা আছে যেগুলি পরিচালিত হয় পারসিদের দ্বারা। এমন কারখানা আছে যেগুলি চালায় গুজরাটিরা। বোধহিঁতে এমন অনেক কারখানা আছে যেগুলি চালায় ইহুদিরা বা ইউরোপীয়রা। আমি যখন অল্প বয়সী ছিলাম তখন এসব কারখানাগুলি দেখতে গিয়েছিলাম, কারণ আমাদের পরিবারের কিছু সদস্য কারখানাগুলিতে কাজ করতেন। যে-সব কারখানায় তাঁরা কাজ করতেন আমি সেখানে তাঁদের খাবার পৌঁছে দিতে যেতাম। সম্প্রতি আমি কয়েকটা কারখানায় গিয়েছিলাম, যদিও খুব বেশিবার নয়। এই কারখানাগুলি সম্বন্ধে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, সেগুলি তাদের পরিচালকদের (Manager) জ্ঞাতি-স্বাতাদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। শত-শত অপদার্থ লোকদের উচ্চপদে নিয়োগ করা হয়েছে। কারণ কোনও না কোনওভাবে পরিচালন নিযুক্তকের (Managing Agent) সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা আছে। পারসিদের কোনও কারখানায় যান, দেখবেন দরকার থাকুক বা না থাকুক, সেখানে শত শত পারসি কাজ করছে। গুজরাটিদের কারখানাতে যান, দেখবেন দরকার থাকুক বা না থাকুক, সেখানে শত শত গুজরাটি কাজ করছে। ইহুদিদের কারখানায় যান, দেখবেন দরকার থাকুক বা না থাকুক শত শত ইহুদি

সেখানে চাকরি করছে। শ্রমিকদের উপার্জনের একটা বৃহত্তম অংশ পরিচালকরা নিয়ে নেয় কারখানায় নিযুক্ত এই সব ব্যক্তিদের মুখে অন্ন জোগাবার জন্য, তা তারা দক্ষ হোক বা না হোক, বা তাদের প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক। কিছু মানুষ এই শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজি ছড়িয়েছে এবং সব রকমের কাণ্ডজে লেনদেনের মাধ্যমে তা ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে নিচ্ছে। যখন শ্রমিক বলে যে কম মজুরি পাচ্ছে, তখন শিল্প-পরিচালক উত্তর দেয়, “এটা আমার পুঁজি।” এ সব কিছুই মেকি পুঁজি, বিনিময় কেন্দ্রের (Stock Exchange) পুঁজি, ফটিকবাগীদের দ্বারা ফাঁপিয়ে তোলা। শিল্পের উপার্জনের একটা ভালমতো অংশ এরা গ্রাস করে নেয়, যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাই দিয়ে নিজেদের অভাব মেটাতে বলা হয় কর্মীদের। যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যায়বিচার প্রবর্তিত করতে চান, তবে তিনি যেন কর্মীদের মজুরিকে শিল্পের মুনাফার ওপর প্রাথমিক দায়বদ্ধতা আরোপ করেন। আমি বুঝতে পারি না, কেন কারখানা মালিকরা এই ব্যাপার সম্পর্কে, অর্থাৎ যে-কোনও শিল্পের যে-কোনও মালিককে কেন আইনত স্বাধ্য করা হবে না প্রতিবছর তার বাজেট পেশ করতে। সরকারকে তা প্রতিবছর বাজেট পেশ করতে হয়, প্রতিবছর আমরা সরকারি বাজেট পাই যাতে সরকার জানায় যে কতজন মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছে, মন্ত্রীদের কতজন করে চাপরাশি রাখতে দেওয়া হচ্ছে, বিভাগগুলিতে কতজন করে অধীক্ষক (Superintendent) থাকবে, কতজন করে কোরাণি থাকবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা থেকে এই সদন জানতে পারে যে কর্মচারিবার্ণের সংখ্যা খুব বেশি, না কম। সদন এটাও জানতে পারে যে, অর্থের সদুপযোগ্য হচ্ছে কি হচ্ছে না। তবে কেন এমন কারখানা-মালিক বা শিল্পের মালিক, যাদের উপার্জনের সবটাই নিজস্ব পুঁজি থেকে আসে না, বরং অনেকের পরিশ্রম থেকে আসে, তবে কেন তাকে রাখা করা হবে না তার পরিচালন-ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা জানাতে? সম্ভবত পর্যায়েই এই দাবি করা যেতে পারে। এ থেকে ল্যভ হবে এই যে, একবার যেই শিল্পের মালিক ঐ ধরনের বাজেট পেশ করবে, শ্রমজীবীরা বুঝতে পারবে এবং পুঁটিয়ে দেখতে পারবে যে, যে-বিক্রী অংশ শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য রাখা হচ্ছে তা ন্যায্য কি না, বা মোট মুনাফার কতো অনুচিত অংশ মালিক নিয়েছে। ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে কর্মীরা যদি না পারে, তবে সালিসি পর্ষদ (Conciliation Board) বসানো এবং মালিকপক্ষকে হিসাবের বই-খাতা পেশ করতে বলায় লাভ কী? আমার প্রস্তাবিত পদ্ধতি যদি গ্রহণ করা হয়, তবে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে শ্রমিক অশান্তি কম

হবে, সালিসির ব্যাপারটা আরও বেশি ফলপ্রসূ হবে এবং শিল্পক্ষেত্রে অনেক বেশি শান্তি থাকবে। আমি ন্যায়বিচারের যে প্রস্তাব দিয়েছি ঠিক সেই অর্থে যদি শ্রম ও পুঁজিকে সমপর্যায়ভুক্ত করে দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তবে বিধেয়কে শর্তাবলিতে ন্যায়বিচারের কোনও ভিত্তি থাকবে না। দ্বিতীয়ত, পুঁজি ও শ্রমিকের মধ্যে সমতার কোনও ভিত্তি থাকতে পারে না, কারণ যে-কোনও বিরোধে সরকার সব সময়ে মালিকদের পক্ষ নেয়। ধর্মঘটে সরকার যে পুলিশকে ব্যবহার করে এটাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আমরা যে কর দিই তা থেকে অর্থাৎ সরকারি তহবিল থেকে পুলিশ বাহিনীকে পোষা হয়। সকলের হিতার্থে তা ব্যয় করাই উচিত। অবশ্যই কোনও সরকারের অধিকার নেই পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করার একমাত্র এই কারণে, যে কর্মচারীদের ধর্মঘট শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। এটাও দেখানো অত্যাবশ্যক যে, শান্তি বিঘ্নিত করার মূলে আছে শিল্পের কোনও এক নির্দিষ্ট অংশ। যদি শ্রমিকদের কোনও অস্বাভাবিক দাবির ফলে শান্তি বিঘ্নিত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করা সঙ্গত হতে পারে। অপর পক্ষে যদি মালিক পক্ষের কোনও কাজের ফলে শান্তি ভঙ্গ হয় এবং সেই কাজ যদি সঙ্গত ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হয়, তবে সরকারের কোনও অধিকার নেই কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করার। কেবলমাত্র এই দুটি শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করেই মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে সমতা বজায় রাখা যাবে। মালিককে বাধ্য করতেই হবে বাজেট প্রকাশ করতে এবং শুধু শান্তি ভঙ্গ হওয়ার কারণে সরকারকে বিরত হতে হবে পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করতে কর্মীদের বিরুদ্ধে। এটা বাদ দিয়ে চুক্তি করে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে কোনও সমতা আসতে পারে না। এটা কি আপনারা করবেন? যদি করেন তবে মালিক পক্ষের ব্যাপারটা আপনারা হাতছাড়া হয়ে যাবে। যদি না করেন তবে আপনারা শ্রমিকের বন্ধু হতে পারবেন না। বর্তমান অবস্থায় বিধেয়কটিকে যে অনুমোদন করা উচিত হবে না এ ব্যাপারে আমি স্থির-নিশ্চিত। এতে শুধু শ্রমিকদেরই অসুবিধা হবে। শ্রমিকরা হয়তো জানতেও পারবে না, এই বিধেয়ক কী করতে যাচ্ছে। কিন্তু বিধেয়কটি যখন কার্যকর করা হবে, আর শ্রমিকরা এর দুঃখমুখি হবে তখন তারা বলবে এই বিধেয়কটি খারাপ, খুনে এবং নৃশংস। আমি এর পক্ষভুক্ত হতে চাই না।

## নারী

পেরিয়ার

ভাষান্তর : দেবী চ্যাটার্জী

আপনাদের নির্লব্ধ প্রকৃতি ও স্বভাবের জন্য আপনারা পত্নীদের ও মায়াদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়া করে নিন্দা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন না। আপনারা নারীদের সাজানো গোজানো পত্তন মত করে রাখছেন। তারা মনে করেন আত্মসম্মান নয়, পুরুষের মুখে জল আসার মত করে নিজেদেরকে সাজানোর সামর্থ্যটাই হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। আপনারাও মনে করেন, তাদেরকে শিক্ষা, জ্ঞান ও আত্ম-সম্মানে সমৃদ্ধ করার চাইতে সাজানোই ভালো এবং তাই আপনারা তাদেরকে পোষাক-আসাক, পাউডার ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য কিনাতে ও ব্যবহার করতে কার্যতঃ উৎসাহিত করেন।

আমাদের দেশে নারীদের পরিস্থিতি খুবই খারাপ থেকে যাচ্ছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্ততঃ কিছু বিষয়ে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে বলে মনে হয় না। আমরা শুধু বলতে পারি যে তারা পোষাক-পরিচ্ছদ, গহনা, অলংকার, চুল বিনুনি আর খোঁপার ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধরণ রপ্ত করছেন, কিন্তু জ্ঞান, মানবিক গুণ ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে কোন পরিবর্তন তাদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় নয়।

দশজন পুরুষের থেকে দুইজন নারীকে বৃদ্ধি বৃদ্ধি ও আত্মমর্যাদাবোধে দীক্ষিত করতে সমর্থ করা সমাজের পক্ষে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। এটা অত্যন্ত বেদের বিষয় যে, নারীদের মধ্যে মোটেই কোন পরিবর্তন নেই। যত পুরুষ আত্মবিশ্বাসে অংশ নিয়েছেন এবং লাভ, উচ্চ পদমর্যাদা ও প্রচার পেয়েছেন, তারা ততটাই তাদের নারীদের বাড়ির পর্দার পেছনে তালাবদ্ধ করে রেখেছেন। গতপক্ষে কিছু পুরুষ তাদের নারীদের আপাদমস্তক ঢেকে রাখেন। তারা মনে করেন, তাদের নারীরা যদি বাইরের পুরুষের সঙ্গে কথা বলে বা অন্য পুরুষেরা যদি তাদের দেখে, তাহলে তাদের নারীদের জলুস কমে যাবে ও তাদের আত্ম-সম্মানের কোন ওজন থাকবে না। যখন সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা এই ধরনের

লোকদের জন্য এই দেশে সংরক্ষিত থাকে, তখন কি করে সাধারণ মানুষ তাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে? এই পরিস্থিতিতে কি করে ঘরে আবদ্ধ নারীরা জ্ঞান অর্জন করবেন? এমনকি এই নারীরা যদি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হন এবং বিদুষী হন, বুদ্ধিজীবী হতে পারবেন কি? তারা কি নিছক বইয়ের পোকা হবেন না? অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে ভাবুন।

আমি যত মহিলা পণ্ডিত দেখেছি, তার অপরিহার্য কাপড়ের বাচ্চার মত। তাদের পৃথিবীর সম্পর্কে জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন করে আটকে রাখা হয়, এবং তারা মনে করেন রত্নালংকার, পোষাক-পরিচ্ছদ, সবতুলানিত কেশ, হলুদ ও কুমকুমই হচ্ছে তাদের পদমর্যাদার, উন্নতির প্রতীক আর তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের স্বামীদের যৌন সন্তোষ সহ বিভিন্নভাবে সন্তুষ্ট রাখা। যখন নারীরা এভাবে বেঁচে আছেন, তখন তাদের থেকে জন্ম নেওয়া পুরুষসন্তান ও কন্যাসন্তান কি করে উপযুক্ত মনাবিক গুণাবলী, আত্মসম্মানবোধ বা প্রগতিমূলক চেতনা পেতে পারে? যদি কোন নারী মনে করেন যে, তিনি শুধু তার স্বামীকে বা অন্য পুরুষদের তার অবয়ব দেখিয়ে এবং তার দেহগঠন, সাজসজ্জা ও মূল্যবান পোষাক-আসাক এবং রত্নালংকার দেখিয়ে আকৃষ্ট করা নিয়ে মাথা ঘামাবেন, এবং তার বুদ্ধিবৃত্তি, সামর্থ্য, অন্যান্য গুণাবলী এবং বিশ্বের কাছে উপযোগী হয়ে ওঠার ক্ষমতা নিয়ে চিন্তা করা কোন প্রয়োজন নেই, তাহলে আমরা কি করে তার সঙ্গে কোনও রকম আত্মমর্যাদাবোধকে যুক্ত করতে পারি। আমার প্রশ্ন এটাই।

যেভাবে কুৎসিত ও আশোচন্যভাবে নারীরা নিজেদের সাজান তাই হচ্ছে তাদেরকে সজ্জা মনে করার এবং তারা শুধু আনন্দের উপকরণ-এমন ধারণা পুরুষদের দ্বারা পোষণ করার প্রধান কারণ। এভাবে, দামী পোষাকের ও অলংকারের জন্য তাদের নির্বোধ আবাসজ্ঞা ও অর্থহীন নিষ্ঠাবোধ তাদের মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অলংকারে ভূষিতা একজন নারী যখন পথ দিয়ে হেঁটে যান, তখন তিনি যারা তাকে দেখছে তাদের ওপর কি ছাপ ফেলেন? তাদের মনে কি ধরনের চিন্তার উদ্বেগ হবে? সমাজসেবা ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে তার কি অবস্থান নির্ণীত হবে? যখন আমরা এই প্রশ্নগুলি নিয়ে ভাবি, তখন অত্যধিক অলংকরণের সঙ্গে যে অমর্যাদা জড়িয়ে রয়েছে তা না বুঝে পারি না।

যে নারীরা পরিমিতভাবে সাজেন, একমাত্র তাদের গুণাবলীকেই সম্মান করার সময় ও প্রবণতা লোকদের হবে। তারা যদি ব্যয়বহুলভাবে ও

না-পারিতোষিতভাবে সজ্জিত কোন নারীকে দেখেন, তারা তার দেহগঠনের দ্বারা খা-ফ-হবেন আর তাদের মনে কুৎসিত চিন্তার উদ্বেগ হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ও নিজেদের পরিপাটীরূপে সজ্জিত করায় নারীদের মনোবোগ দেওয়াতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। যদি কোন নারী নিজের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্তভাবে নিজেকে সাজায়, আর সাজানো কাঠের পুতুলের মত দেখতে হয় এবং পোষাক-আসাক ও গহনার ভারে নুয়ে পড়ার মত হয়, যদি সে এটা সেটা করতে সাবলীলভাবে নড়া-চড়া করতে না পারে, তাহলে আমি জানি না আমরা কী করে তার সঙ্গে কীভাবে পারা-হ বা সৌন্দর্যকে যুক্ত করব?

যদি আমরা নিজেদের জিজ্ঞেস করি, এই ধরনের সাজ-সজ্জায় কার প্রয়োজন এবং তা তারা কেন কাজে লাগায়, তাহলে আমরা শুধু অশ্রীতিকর উত্তরই পাই। ঐচ্ছমতী, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও সংস্কৃতিবান কোন নারী অপরকে এরকম মন্তব্য করার সুযোগ দেবে না যে, “এই মহিলা খুব সেজেছে ও নিজেকে সুন্দরী দেখাচ্ছে। ওকে খুব ভাল লাগছে।”

নারীদের নাক ও কান কেন ফুটো করা হয় এবং ভারী ভারী অলংকার কেন সেখানে পরা হয়—কানের অলংকার বুক ছোঁয়ার মত লজ্জা হয়, আর নাকের অলংকার প্রায় দাঁত ছোঁয়ার মত—তার কারণ হচ্ছে নারীরা যেন আত্মমর্যাদাহীন ও ভীত হন যাতে পুরুষেরা যদি অপমান করতে বা গায়ে হাত দিতে আসে, তাহলে যেন নারীরা মুখ নামাতে পারে ও পেছনটা পেতে দিতে পারে। কানের নাক ফুটো করা হয় আর সেই ছিদ্রে মোটা দড়ি ঢুকিয়ে তার মাথার সাথে বাঁধা হয়। দড়ির বদলে নারীদের দেওয়া হয়েছে একটা বড় গয়না। তাৎপর্যটা পরিষ্কার।

একইভাবে নারীদের মৃত দৌড়নোর বাধা দেওয়ার জন্য তাদের কজ্জী ও গোড়ালি ঘিরে বেড়ীর মত অলংকার পরানো হয় আর তাদের পরতে হয় কোনো হাত লম্বা শাড়ী। বাহ্যিক আকৃতিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনরকম পার্থক্য থাকবে কেন? তার প্রয়োজনই বা কী? এই ধারণা চিন্তা করার পরিবর্তে নারীরা নিজেদের ঠকাচ্ছেন এই মনে করে যে, তারা নিজেদের সুন্দর করে সাজানো এবং পুরুষদের থেকে দেখতে আলাদা করে সম্মানও অর্জন করছেন।

অপর নিজেদের এভাবে সাজাতে তারা প্রচুর সময় ব্যয় করছেন। নারী সমাজকে যদি অগ্রসর হতে হয়, তাহলে নারীদের এই সংকীর্ণ চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং অর্জন করতে হবে শিক্ষা, যুক্তিবাদ, পার্শ্বি অভিভক্তি, আত্মপ্রত্যয় ও সাহস। জনস্বার্থে পুরুষদের মত কাজ করার ইচ্ছা ও সুবিধা তাদের অবশ্যই থাকতে হবে। অশোভনভাবে সাজা কখনোই জনসেবার সুযোগ দেবে না, বরং পদপ্ৰলনেরই কারণ হয়ে উঠতে পারে।

নারীদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, মানব সমাজ অর্থে মানুষের একত্রে থাকা বোঝায় এবং তা কখনোই এটা বোঝায় না যে, প্রত্যেকে একজন নারীকে তুলে নিয়ে চলে যাবে আর যবে আবদ্ধ করে রাখবে। এমন কি খনিষ্ঠ সাধীত্বের জন্য বিখ্যাত পায়রা, ময়না ও অন্যান্য পাখীরাও তাদের শ্রেণীর পাখীদের সাথে একত্রে বসবাস করে, স্বগোষ্ঠীর অন্য পাখীর সাথে বন্ধুত্বাবে থাকে। মানুষের পক্ষে এই সামাজিক বোধ হারিয়ে ফেলা ও নারীদের এই সামাজিক বোধ থাকাকে মহানোষ বলে গণ্য করা প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যায়।

আমি বারবার ও সজোরে বলেছি যে, যখন কোন নারী ও পুরুষ প্রেমে পড়ে ও একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত করে, তখন তাদের ভালবাসা ও সত্যতার প্রতি ঝাঁকি থেকে একসাথে থাকতে থাকে উচিত। এই ধরনের ভালবাসাই সাহস, আত্মসম্মান ও ন্যায়পরায়ণতার নিদর্শন হয়। একই সাথে, আমি বলব যে, নারীদের যাঁচায় কদী করে রাখার মত করে রাখলে, তা হবে লজ্জাজনক এবং পুরুষদের পক্ষে তা হবে অপমানজনক।

নারীদের নিরাপদ হেলমজতে থাকতে বাধ্য করা ও তারপর তাদের কাছ থেকে শারীরিক সুখ চাওয়া হচ্ছে পুরুষের পক্ষে আকাট মর্কজ। এই প্রথা বিবাহিত জীবনের প্রকৃত সুখকে একেবারে নষ্ট করে দেয়।

নারীদের পৌরাসিক কাছিনী পড়তে বা গুনতে দেওয়া আমাদের আদৌ উচিত নয়। 'সতীত্ব' কথাটির ভারী অধুত ও অপ্রমত্তজনক অর্থ করা হয়। একজন স্বামীর সাথে সুখে বসবাস করা সম্পর্কে কোন স্বাধীন চিন্তা 'সতী' রমণীর থাকতে পারে বলে মনে করা হয় না। 'সতী'র মুখ, চোখ ও কান স্বাভাবিকভাবে কাজ করলে হবে না। বস্ত্রত তাকে হতে হবে এক চলমান শব্দ। নারীদের এইভাবে রাখার কি প্রয়োজন? 'সতীত্ব' কথাটির অর্থ যদি এই হয়, তাহলে কেবল অন্ধ, খঞ্জ বা মুক নারীরাই সতী হতে পারে।

আপনার সম্পর্ক (পেরিয়ারের সাতৃস্পূত্র ই. ডি. কে. সম্পর্ক) ও সূচোচনার ১১৭৭গুষ্ঠান উপভোগ করলেন। আপনারা সভাপতির, এবং টি. হৃদুগম, ক্ষণকালীন ও অন্যান্যদের বক্তৃতা শুনলেন। এমন আপনারা আমার কলার আশায় থাকতে পারেন। আমি কী নিয়ে বলব? সেটাই প্রধান সমস্যা। যেহেতু আমি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত সভা, তাই আমি এখানে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে যাব না। বেশির ভাগ লোক এই ধরনের উপলক্ষ্যে সংগীত, পুণ্য নিয়ে চর্চা, নৃত্য বা হাস্যকৌতুকের মত প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা থাকেন আর সময় ও অর্থের অপচয় করে থাকেন। লোকেদের উপকারের নামে সেখানে থাকে শূন্য। কিন্তু যেহেতু এই বৃথা আড়ম্বরগুলি বিবাহের আয়োজনকারী পরিবারের সম্মান বাড়ায়, তাই এই অপ্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানগুলি বেশির ভাগ জায়গায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এখানে আমি অবশ্যই একটি প্রয়োজনীয় আলোচনা রাখব। আমি এমন একটি আলোচনা করতে চাই, যা এমন কাজের না হলেও আপনারা চিন্তাকে আকৃষ্ট করবে।

যেহেতু এই বিবাহের ধরণটি নতুন, তাই এ নিয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। কিন্তু আমাদের লোকেদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা সুপরিচিত, এমন কি কিছুটা পুরনোও হয়ে গেছে। কদী, দরিদ্র, বিদ্বান, সাধারণ মানুষ ও সাধুপুরুষ নির্বাণে সর্বস্তরের সহজজনের দ্বারা ইতিমধ্যে গৃহীত বিবাহের এই ধরনটির প্রচলন বিশ বছর আগে করা হয়েছিল বলে এবং এখানে আরো অনেকে এর নিয়ে বলছেন বলে, আমার মনে হয় না এরকম এক বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর নামে আমাদের এই একই বিষয়ের ওপর বলতে হবে। যেহেতু আমাদের জনগণের আরও অনেক দিশার পরিবর্তিত হতে হবে, তাই আমি ভাবছি সেরকম একটি বিষয়ের ওপর বলব। যদিও স্বাভাবিকভাবেই সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটে থাকে, তবু আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে এ কোন পরিবর্তনগুলিকে আমাদের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে পারি তা নিয়ে আলোচনা করলে আমার মনে হয় তা আমাদের বিচক্ষণতারই পরিচায়ক হবে। তাই আমরা এই পরিবর্তনগুলির সাথে নিজেদের যুক্ত করতেও পারব।

বিল্ড অধ্যক্ষ রামস্বামী গাউন্ডার এই অনুষ্ঠানকে এক দ্রাবিড় বিবাহ বললেন। ঠিক কথা, আমরা দ্রাবিড় এবং আমাদের বিবাহ প্রকৃতিই দ্রাবিড় বিবাহ। কিন্তু, আমরা এটা বলছি না যে দ্রাবিড়দের পূর্বকর বিবাহগুলি কেবল এই পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হত বা ভবিষ্যতে দ্রাবিড়রা শুধুমাত্র এই পদ্ধতিতেই বিবাহ করবেন। এটা একটা দ্রাবিড় বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও এটা ১৯৪৬ সালের বিবাহ (বর্তমান অবস্থার উপযোগী) এবং এটাই বর্তমানে সারা পৃথিবীতে সব লোকের সব বিবাহেরই পদ্ধতি হওয়া উচিত। আবার এটা বলছি না যে এটাই সর্বকালের পদ্ধতি হবে। ১৯৪৬ সালের পদ্ধতি বলতে এটাও বোঝাচ্ছি না যে এটা ১৯৫৬ সালেও একইরকম থাকবে। আমাদের সুবিধা, জ্ঞান-গমি, মানবিক মান ও সাধারণ কল্যাণের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্যই এই পরিবর্তন সম্ভব করা হয়েছে। আমাদের কল্যাণবোধ এবং জ্ঞানের বিকাশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আগামীকাল বা ১৯৫৬ সালে আরো কিছু পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। ১৯৪৬ সালের পদ্ধতি ভবিষ্যতের পরিবর্তনগুলির বাধা হতে পারে না। লোর্ড মেটের গাড়ীর ১৯১২ সালের মডেলটিকে ১৯৪৬ সালে দেখা যায় না। এককাল গাড়ী অনেক বদলে গেছে। ১৯৪৭ সালে এটা আরো অন্যরকম হবে, পরিবর্তন অবশ্যজ্ঞাবহী। এই পরিবর্তন জ্ঞানের বিকাশের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বিবাহ পদ্ধতির পরিবর্তন কেবল জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সামাজিক কাঠামো, সাংবিধানিক অধিন, অনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার পূর্ণতার উপর, পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বিবাহ পদ্ধতির একটা পরিবর্তন অপরিহার্য। এমন কি, 'বিবাহ প্রয়োজনীয় কি না' এবং 'চুক্তি অত্যাৱশ্যক কি না' এই প্রশ্নগুলিও চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে। ভবিষ্যত যেহেতু গবেষণা, যুক্তিবাদ ও সর্বস্তরে সাম্যের একটা পর্যায় হতে যাচ্ছে, তাই সেই পর্যায়টিকে, সীমিত যুক্তি আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বর্তমানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যাবে না বলেই বিবাহ পদ্ধতির প্রগতি এখানেই ইতি করে আমি অন্য একটা বিষয়ে বলতে চাইছি।

এখানকার নারীদের কাছে, তাদের পিতামাতা ও স্বামীদের কাছে আমি নারী প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। আমাদের মত অনুন্নত ও দাসত্বে আবদ্ধ দেশের ও সমাজের মুক্তি হতে পারে না যদি না, সমস্ত মানুষ একটা সার্বিক পরিবর্তন চায়। তাই আমি নারী বিষয়ে আলোচনা করব।

যাবার দিক দিয়ে নারীরা মানব জাতীর অর্ধাংশ। দু'একটা শারীরিক দোষের পার্থক্য ছাড়া নারীরা স্বচ্ছ পুরুষের মত। শৈশব থেকে স্বাধীনভাবে বেড়াবার বয়স পর্যন্ত আমরা ছেলে ও মেয়েদের একইভাবে আদর করি, খাওয়া সাথে একই রকম ব্যবহার করি। যখন মেয়েরা শারীরিক দিক দিয়ে ও গাঢ়গাঢ় দিক দিয়ে বেড়ে ওঠে, তখন আমরা অস্বাভাবিকভাবে তাদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ি, পুরুষদের থেকে তাদেরকে আলাদা করি এবং শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের নিজস্ব ও অকেজো পুতুলের স্তরে নামিয়ে আনি। তদুপরি, আমরা শতেরকি মেয়েকে পিতামাতার ও অন্যদের এবং তাদের নিজেদের কাছেও রাখেনার ও দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় করে তুলি। এবং তাদেরকে রক্ষা করার, তাদেরকে বিশেষ অলঙ্কারের মাধ্যমে তৃপ্ত ও উৎফুল্লিত রাখাকে আমরা এক সমস্যা বলে মনে করি। সব মিলিয়ে তাদেরকে আমরা নিষ্প্রাণ জড় বস্তুতে নামিয়ে আনি।

কোন মেয়ে যে পরিবারভুক্ত বা যে সমাজের অংশবিশেষ তারা কি মেয়েটিকে কোনভাবে প্রয়োজনীয় মনে করে? সংশ্লিষ্ট সব মানুষ এই নিয়ে চিন্তিত যে, মেয়েটি যেন কল্যাণ না আনে। বর্তমান সময়ে একজন নারীর কি দায়িত্ব? তাকে একজন পুরুষের স্বার্থের সেবা করতে হবে। আর কোন উদ্দেশ্যের সেবা সে করে কি, দয়া করে এ বিষয়ে ভাববেন।

একজন পুরুষের রাধুনী, তার বাড়ীর কাজের লোক, তার সম্বন্ধন জন্মাবার থানায়, তার দৃষ্টিনন্দন ও মনোরঞ্জনকারী এক সুন্দর সাথানো পুতুল হওয়া ছাড়া একজন নারীকে আর কোন উদ্দেশ্য সাধনকারী হিসাবে ভাবা হয়? আর কোনভাবে কি নারীকে কাজে লাগানো হয়?

এটা কেমন করে যুক্তিযুক্ত হয়? কোন পণ্ড, কোন রেশম-কাঁট বা অন্য কোন কাঁট-পতঙ্গ কি শুধুমাত্র বিপরীত লিঙ্গের জীবটির স্বার্থে বেঁচে থাকে?

নারীরা এই অবস্থাকে অমর্যাদাকর বলে মনে করে না। সেজন্যই আমি পুরুষদের জিজ্ঞাসা করি, তারা কেন নারীদের সাথে এত নিষ্ঠুর আচরণ করেন? কেন একজন পুরুষ একজন নারীকে তার সম্পত্তি বলে মনে করেন? নারীটি যে প্রাণ এবং অলঙ্কারাদি পাত্রেন, তার জন্যই নয় কি? যখন আমাদের বেতারবার্তা পুরুষদের রয়েছে তখন এই দিনেও নারীদের কেবল ঘর সাজাবার পুতুল করে ধরা হয় কি?

আমি জানি আমার কথাগুলি পুরুষদের কাছে এমন কি নারীদের কাছেও, যুগা, অমর্যাদাকর ও বিরক্তিকর মনে হতে পারে। যে রোগ নিয়ে আমি কথা বলছি তা একটা গুরুতর রোগ। এটা কচি পাতা বোলানো, মস্ত্র আণ্ডানো ও মলম লাগানোর মত সহজ চিকিৎসার সারতে পারে না। এটা এমন একটা রোগ যাতে ধারালো স্থিতিয়ারের সাহায্যে কাটা-ছেঁড়া করে দেখা ও জ্বালা করে এমন কড়া ঔষধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন আছে। সংশ্লিষ্ট রোগীকে, এই কড়া শল্যচিকিৎসা নিতে অবশ্যই বাধ্য করতে হবে। আমি আমার কাজে সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি কথার বিশ্বাস করি না। প্রয়োজনীয় যে কাজ তা অবশ্যই করতে হবে। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে এবং আমাকে এটুকু অন্তত করতে হবে। তাই, আপনারা মেজাজ খারাপ না করে আমি যা বলছি অনুগ্রহ করে সে বিষয়ে চিন্তা করবেন।

আমাদের নারীদের জগতকে পরিবর্তন করতে হবে। আর কেন সভ্য দেশে নারীরা পুরুষদের আমেরার উৎস হওয়ার মত এত খারাপ নয়, আর দুনিয়ার কাছে বোঝাও নয়। এখানে, সমস্ত নারীরা, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, শুভ্রমাত্র পুতুল। তাদের পিতামাতারা এবং স্বামীরা তাদের এই পুতুল সুলভ গুণে পরিতুষ্ট। তারা মনে করেন তারা যদি নারীদের দামী গয়না ও পোষাক-আসাক যুগিয়ে দেন এবং তাদেরকে সুন্দর পুতুলের মত করে সাজিয়ে রাখেন, তাহলেই তারা সন্তুষ্ট হবেন এবং ভালো নারী হয়ে উঠবেন।

কেন নারীর গৌরব বর্ণনায় যদি পঞ্চাশ লাইন থাকে তার আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ভঙ্গীমা নিয়ে, তাহলে পাঁচ লাইনও থাকবে না তার জ্ঞান, তার ক্ষমতা ও বিশ্বকে সেবা করার তার সামর্থ্য নিয়ে। আমরা কি বলতে পারি যে হাজারে অন্তত একজন নারী আছেন যে কোন নারীকে নিছক শারীরিক অলঙ্কার এবং শারীরিক আকৃতি, সৌন্দর্য ও ভঙ্গীমার প্রশংসা নারীদের প্রতি লজ্জাজনক ও অমর্যাদাকর এবং এতে কেবল নারীদের দাসত্বের অবস্থাই দেখানো হয়?

কেন নারী কি প্রমাণ করেছে যে কেন সে তার পিতার সম্পত্তির অংশের অধিকারী নয়? নারী মনে করে যে পুরুষ তার থেকে শারীরিক আনন্দ পায় এবং তা শারীরিক শ্রমের ফলটি নিয়ে থাকে, সেই তাকে রক্ষা করবে। সে যে পোষাক-আসাক ও গহনা পরে তাতেই সে সন্তুষ্ট।

সাজগোজের কি প্রয়োজন? কেন নারীরা পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতন

৫৬ ২৫ ৩০/১১/২০

করা পোষাক ও গয়না পরছেন? নারীটি বা তার স্বামী বা মেয়েটির পিতামাতা কি তা নিয়ে চিন্তা করেন? একজন নারী শুধু একটি নিষ্প্রাণ বস্তুর সমতুল্য তা দেখা যায় অন্য এ ছড়া অন্য আর কি প্রমাণ প্রয়োজন? এটা হয় কারণ নারীরা মনে করেন, তারা কেবল পুরুষের আমোদের বস্তু, এটা তাদের মনে হয় না যে, অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করার মত করে নিজেদের সাজানোটা অমার্জিত ও অমর্যাদাকর। এটা একটা করুণ অবস্থা।

দশম্পরগত প্রাকৃতিক সাহিত্য বলে যে, একজন ভালো ও সতী নারী স্বামী পিতা অন্য কোন পুরুষের হৃদয়ে স্থান পাবে না। অর্থাৎ, যদি একজন নারী স্বাভাবিকভাবে সতী হয়, তিনি অন্য লোকের চিন্তারও বিষয় হবেন না। কিন্তু থাকার আমাদের নারীদের এমনভাবে সাজাই বা তাদের সাজতে দেই যাতে অন্যদের মনোযোগ পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করতে পারে। একাজে আমরা আমাদের দল দল শ্রম ব্যয় করি। যেহেতু আমরা ও আমাদের নারীরা এর কি কারণ তা নিয়ে চিন্তা করিনি, তাই আমাদের নারীরা নিজেদের সাজানো জুতা অন্য কোন নারীর পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়েছেন। আমি কেবল সাধারণ লোকেরদের কথাই বলছি না। আমি বুদ্ধিজীবীদের, কবান ব্যক্তিদের ও বিরাট আত্মত্যাগী কর্মীদের কথা উল্লেখ করছি, তাদের অবস্থা এবং নারীজগতের প্রতি যে সেবা করা হয়ে চলেছে, তার কথা উল্লেখ করছি। সেই নারীরা কোথায়—স্মার পঞ্চাশ চট্টগ্রামের মত বিরাট বুদ্ধিজীবির এবং স্মার কুমার রাজার মত ধনী রাজাদের পরিবারভুক্ত ভিক্ষিনীরা ও পট্টীরা এবং অনেরা—তারা কোথায়? তারা কিভাবে জন্মেছেন এবং কিভাবে বড় হয়েছেন? তাদের নারীরা জীবন অতিবাহিত করার জন্য কিভাবে তৈরি হয়েছিলেন? এবং এখন তারা কেমন আছেন? এরকম পঞ্চাশ বাড়িদের পরিবারভুক্ত নারীদের কি বিজ্ঞাপনের জন্য উপস্থাপিত সুন্দর পুতুলের মত রাখা হয়নি? এই সমস্ত নারীদের কি মানবতার সেবা বা আত্মপতনের সেবার জন্য তৈরি করা হয়েছে অথবা নিজেদের সুখ বা খ্যাতির জন্য পরিত্যাগ করা হয়েছে? এরকম পরিবারের নারীরা যদি এরূপ হয়, তাহলে অন্য সাধারণ পরিবারের নারীদের অন্য রকম হওয়ার আশা করতে পারি না। আমাদের কেবল নিরাপদে তালাবদ্ধ করে রাখতে হবে।

এখন দেখুন, বেগম আফিকুদ্দিন কেমন জনসেবা করে যাচ্ছেন, যদিও তিনি

৫৭ ২৫ ৩০/১১/২০

“গোসা”র বিশ্বাসী মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। শুধু আমাদের নারীদের কেন মণিরত্ন দেখাবার অলঙ্কার পাণ্ডের মত রাখা হয়? আমাদের সমাজের বিখ্যাত লোকদের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। তারা যখন তাদের মস্তিষ্কে কাজে লাগিয়ে জীবনে উন্নতি করতে পারলেন, তখন তাদের নিজেদের বোনেরা কেন তাদের মস্তিষ্কে কাজে লাগালেন না? এই সমস্ত নারীদের মস্তিষ্কে কাজে না লাগানোটা কি দেশের জন্য ক্ষতি নয়?

নারীদের দেওয়া শিক্ষা যখন কাজে লাগানো হয় না, তখন তা অকেজো হয়ে যায়। সে কারণেই মণিরত্নস্বাই একবার ইরোডে বলেছিলেন যে, নারীদের শিক্ষা দেওয়াটা সংশ্লিষ্ট লোকদের পক্ষে এক অর্থের অপচয়। তিনি যা বলেছিলেন তা সত্য। আমি নীচে যে উদাহরণটি দিচ্ছি, তা বিবেচনা করুন। মনে করুন, একটি মেয়ের পিতা-মাতা তাকে কণ্ঠ সংগীত, বেহালা, বীণা ও নৃত্য শিক্ষা দিলেন, এমন কি এগুলোতে পরীক্ষাও উত্তীর্ণ করালেন। (অনেক লোক এখনো তা করছেন)। কিন্তু বিবাহের পর, তার এই শিক্ষাগুলোকে কিভাবে কাজে লাগানো হয়? মেয়েটি যদি তার স্বামীর বাড়িতে গান গায়, শাওড়ি প্রশ্ন করবেন, ‘এটা কি আমাদের বাড়ি না অন্য জেন জায়গা?’ পরিশেষে বাদ্যযন্ত্রগুলিতে ধুলো জমে। তাহি এই শিক্ষা মেয়েটির জন্য একটি পাথর জোগাড় করার জন্যই শুধু কাজে লাগে। অন্য দিক দিয়ে এটা একটা অপচয়, তাই নয় কি? একইভাবে বি.এ. ডিগ্রীপ্রাপ্ত কোন মেয়ে যদি বিবাহের পর শুধুমাত্র রান্নাবাড়ি, সন্তান লালনপালন এবং নিজেকে কঁকরকে করে সাজাতেই সবটুকু সময় ব্যয় করে তাহলে কি তার শিক্ষা অর্থের অপচয় নয়? এটাও কি সত্য নয় যে তার শিক্ষার জন্য ব্যয় করা সরকারি রাজস্বের অংশটুকুও অপচয়ই হয়েছ? এটা কি এক জাতীয় অপরাধ নয়?

বুদ্ধিজীবীকণ ও সংস্কারকণ এই সমস্যাটিকে অবহেলা করছেন। কলে নারীদের মার সন্তান জন্মতে শু লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করাতেই ছেড়ে রাখা হয়েছে।

কিছু শিক্ষিতা নারী আমার চোখে পড়ে। আবার কখনো দেখি, শিশুকালে মাতা, কাঁখে আরেকটি শিশু, হাতে ধরা একটি, আর আগে আগে দৌড়ানো আরেকটি। সেভাবেই প্রায় গোটা একটা বাহিনী নিয়ে মাতাটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আসে কেবল একটা গোলমালের উৎস হয়ে। এই সমস্ত নারীরা কৃষকর্মের জন্য লজ্জিত না হলেও অনেকে দৃশ্যটি দেখে মর্মান্বিত না হয়ে পারেন না। এটা কি

কোন সমাজের সাথে সম্বতিসম্পন্ন—বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট নারীরা যখন শিক্ষিতা না। শিক্ষিত পরিবারভুক্ত। এরকম ক্ষেত্রে নারীটির দেখে থাকে মূল্যবান শোখাক আর গহনা, এদিকে তার সন্তানেরা চীৎকার করছে, কাঁদছে আর যন্ত্রতন্ত্র মশমুণ ত্যাগ করছে। এরকম কেন ঘটে?

শোখাক-আসাক ও গহনায় যে টাকা খরচ করা হয় তা যদি শিশুটির জন্মের পাশে মাঝে ব্যাঞ্জে জমা করে রাখা হয়, তাহলে যে সুদ পাওয়া যাবে তা দিয়ে শিশুটিকে দেখাশোনার জন্য একজন লোককে নিয়োগ করা যায়। এতে কি শিশুটির প্রতি তার মায়ের দরদ কম যাবে? শিশুটির পিতা কি তাকে সবসময় পাশেপাশে রাখেন তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার জন্যে, তাকে আদর করার জন্যে, শব্দ-আসাক প্রকাশ করার জন্যে? তাহি শিশুদের লালনপালনের ভার ছেড়ে দিতে চলে তাদের দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত লোকদের হাতে। রান্নার কাজও কাজের শোখাক-আসাক প্রভেদে ছেড়ে দেওয়া যায়। এভাবে নারীদের উচ্চ বুদ্ধিজৈবিক কাজের জন্য মুক্ত রাখা যায়। স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের বোনকে স্যার এ. লক্ষণস্বামী কদাচিদানের মত এগিয়ে আসতে হবে। স্যার বসুগমের বোনকে আর. কে. বসুনাচলম চেট্টিয়ারের মত এগিয়ে আসতে হবে, আর কুমার রাজার বোনকে এগিয়ে আসতে হবে রামনাথন চেট্টিয়ার ও চিদাম্বরম চেট্টিয়ারের মত। তাদের পুতুল আর গহনারানি হলে চলবে না। এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য।

আমরা বলি যে, পুরুষেরা যে সমস্ত কাজ ও পরিষেবায় নিযুক্ত সে সবই নারীরা করতে সক্ষম, অবশ্যই সক্ষম। কিন্তু তার জন্য গয়না-পীটি, শোখাক-আসাক, সাজ-সজ্জা ও তার সাথে জড়িত চালচলন—আত্মমর্যাদাবোধহীন বাসমূল্য নিম্ন মনোবৃত্তির এধরনের অভ্যাস নারীদের পরিত্যাগ করতে হবে।

নাতিহীন, সর্বনেশে ফিল্মগুলিই আমাদের নারীদের দেশ ও সমাজের কোন ক্ষেত্রে জন্য অনুপযুক্ত, পুরুষের চোখের ঝোঁক, সাজানো পুতুল বানিয়েছে। আমাদের নারীরা ফিল্মের তারকাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কারদাস-কানুন, গয়না-পীটি, শোখাক-আসাক ও কৃত্রিম চালচলন ও হাব-ভাবের কৈনিন্দ পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছেন। আমাদের ঘরের নারীরা ফিল্মী তারকাদের স্বভাব, চরিত্র, আচরণাদি ও তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একবিন্দু মাথা না ঘামিয়েই খবর-খবো তাদের অনুকরণ করছেন। বলতে কষ্ট হয় যে, আমাদের নারীরা

পুরুষদের মত সাহস, সমাজ সেবা ও আনুযায়িক কাজের দ্বারা যশ অর্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা গড়ে না তুলে যদি শুধুমাত্র নিজেদের সাজাতেই মনোসংযোগ করেন তাহলে তারা কেবল নিজেদের নীচেই নামাবেন।

কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি শিষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা ও শ্রীময়ী চেহারা বিক্রি। এগুলির নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে এবং এগুলি সহজ উপায়ে কিনাব্যয়ে অর্জন করা যেতে পারে। আমার এটাই বলার যে, চেহারাগত সুখমার জন্য আমাদের নারীদের ব্যয়সাপেক্ষ আড়ম্বরপূর্ণ গহনা ও পরিধেয়র পেছনে ছোট্ট দরকার নেই।

বুদ্ধিমত্তায়, সামর্থ্যে ও সাহসে পাশ্চাত্য দেশগুলির নারীদের চেয়ে আমাদের নারীরা উৎকৃষ্টতর। আমাদের জলবায়ুই এরকম। এই পরিস্থিতিতে কৃষিমন্ত্রী ও বিজয়লক্ষীর মত কেবল ব্রাহ্মণ নারীরই কি সামাজিক জীবন ও মস্তিষ্কের উপযুক্ত হয়ে উঠবে? কেন আমাদের নারীরা বড় সংখ্যায় জনজীবনের জন্য বেরিয়ে আসবেন না? তা করতে তাদের বাধা দিচ্ছে তাদের গহনা, পোষাক ও সাজপোজের ব্যতিক, অন্য আর কিছু নয়।

তাহি, শিতামাতারা তাদের কন্যাসন্তানদের ছেল বলে ডাকুন, ছেলদের নাম ও ছেলদের পোষাক দিন—তাদেরকে এমন রূপে হাঙ্গির করান যাতে যে দেখছে সে যেন সহজে বুঝতে না পারে যে তারা ছেলে না মেয়ে। নারীদের এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তারা কেবল তাদের স্বামীদেরই উপযুক্ত না হয়ে দেশ ও সমাজের সেবা করতে পারে এবং নাম-যশ অর্জন করতে পারে। কোন নারী যাতে অপরকে তার লিঙ্গ নিয়ে ভাবনা করার অবকাশ না দেন। প্রত্যেক নারীরই উচিত নিজেদের নিজস্ব করা উচিত কেন পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রভেদ ও পার্থক্য রয়েছে, এবং এমনভাবে চলা উচিত যাতে কোন প্রভেদ বোঝা না যায়। আমি এভাবে বলছি কারণ আমি চাই আমাদের নারীরা যেন কেবলমাত্র পুরুষদের ভোগের সামগ্রী হয়ে না থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন এবং নতুন পৃথিবী গড়ার স্বার্থে।

(১৪.১.১৯৪৬ তারিখে উত্তর অর্কটের তিরুপাতুরে মূলোচ্ছাস ও সম্পর্কের বিষয়ে পেরিয়ার প্রদত্ত ভাষণ—‘কৃষি অরাস’-তে ২১.১.১৯৪৬-এ প্রকাশিত)

(৩)

পুরুষদের যত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা আছে, নারীদেরও তা থাকা উচিত, ‘নারীশক্তি’ বলতে তাই বোঝায়। বর্তমানে, যদিও শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে, তথাপি নারীরা তাদের অধিকার হারাচ্ছেন। পুরুষের অস্বাভাবিকই এর একমাত্র দায়ী নয়। যে ভ্রান্ত লক্ষ্য ও আদর্শ নারীদের জীবনে রয়েছে তা এর আরেকটি কারণ।

নাগেরকয়েলের ডাঃ জন হিলাকিয়া, যিনি নারীর মহাজ্ঞান সংঘের ত্রয়োবিংশ শাখায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, তিনি আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন : ‘শিক্ষা ও ডিগ্রী প্রাপ্তা মহিলারা ও ধনী শাখাগুলির মহিলারা মানব সমাজের মোটেই কোন সেবা করেন না। এটা মোটামুটি প্রচুর গহনা পাঁচি ও মূল্যবান পোষাকের অধিকারী হওয়া ও সুখের স্বাভাবিক প্রমোদ (ফিল্ম, নাটক, সংগীতানুষ্ঠান, গাল-গল্প ও অনুরূপ) করা ছাড়া তাদের জীবনে আর কোন লক্ষ্য নেই। গোছ গোছ গয়না পরার ব্যতিক আমাদের মহিলাদের সাথে জৌকের মত লেগে রয়েছে। আমি কেবল অতিরিক্ত গয়না ব্যবহারের কথাই বলছি। আমি তেমন সরকারকেই স্বাগত জানাব যে নারীদের একটা নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে গয়না পরার জন্য শাস্তি দেবে না দণ্ডমূলক নয় আরোপ করবে। মণিরত্ন পরার ফলে জীবনও বিপদাপন্ন হতে পারে। আমি আমাদের সেইসব লোকদের করুণা করি, যারা পোষাক-আসাকের জন্য খামতবাগী হয়ে পরে কষ্টভোগ করে। ... আমরা যদি হস্তচালিত তাঁতের পোষাক পরি, তাহলে আমরা তাঁতিদের কষ্ট লাঘব করতে পারব এবং তাঁর কোমর ধমসায়তে কমাতে পারব।’

‘খানি ভাঙারের মন্তব্যকে স্বাগত জানাই এবং নারীদের প্রতি তাঁর উপদেশের শ্রদ্ধা করি। যদিও তিনি নারীর সম্প্রদায়ের নারীদের সম্বোধন করে এই কথাগুলি বলেছেন, কিন্তু কথাগুলি সাধারণভাবে ধনী পরিবারের নারীদের জন্যও প্রযোজ্য। এই বিষয়ে কিংবদন্তি ব্রহ্ম ধরে যুক্তিবাদী আন্দোলন যে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তাতে এই বিষয়ে কিছু পরিমাণে সাধারণ সচেতনতা গড়ে উঠেছে। তথাপি, খানি নারী যে, মণি-মুক্তা ও মূল্যবান পোষাকের ব্যতিক ধনী নারীদের উপর পড়ান পড়ান বিস্তার করে আছে। কোন এক ধনী নারী ‘অমকের কন্যা’ বা

'তমুকের স্ত্রী' হিসাবে বা 'এ্যাত এ্যাত ধন-দৌলতের মালিক' হিসাবে অপরের দ্বারা প্রশংসিত হতে বাধ্য থাকে এবং সেজন্যই তিনি সাজানো পুতুলের মত ৫/১০ হাজার টাকার মনিমুক্তায় ও ২/৫ শত টাকার পোষাকে নিজেকে ভারাক্রান্ত করেন। তিনি ও তাঁর মত নারীরা কখনো কোন কর্মক্ষেত্রে সকল হওয়ার এবং বিশেষজ্ঞ বা দক্ষ ব্যক্তি হওয়ার সুনাম অর্জন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না। অতীতে যখন লোকে তাঁদের সঙ্কল্পকে নিরাপদে রাখার সমস্যা বোধ করতেন, তখন তাঁরা নারীদের জন্য রক্তালঙ্কার বানাতেন আর এভাবে তাঁদেরকে চলমান ব্যাধ ও সিন্দুকে পরিণত করতেন। কিন্তু আজকের দিনে, যখন টাকার জমাবার অজস্র উপায় রয়েছে, তখন, ধনী নারীদের বিবেচনা করা দরকার, নগদ টাকাকে গহনার রূপান্তরিত করাটা প্রয়োজন কিনা। যদি গহনায় মানুষকে সুন্দর দেখার বলে মনে করা হয়, তাহলে যারা গহনা পরে না সেই পুরুষদের বেলায় ব্যাপারটা কি? তারা কি সুপুরুষ নয়? নারীদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, গহনা তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে সোনার বেড়ী হয়ে আছে। গহনা-গাঁটি ও দামী কাপড়-চোপড়ে যে অর্থ অপচয় করা হয়, তা সংশ্লিষ্ট পরিবার ও সমাজের কাছে নিরর্থক হয়ে পড়ে।

এই প্রথাকে আমরা কি করে থামাতে পারি? ডার হিলাকিয়া প্রস্তাবিত শাস্তি বা দন্ডমূলক কর কোন কাজে লাগবে না। তারা শাস্তি নেবে এবং যেহেতু তারা ধনী তখনই কর দিয়ে দেবে এবং গহনা পরা চালিয়ে যাবে, যেমন করে পাকা মাভালেরা মনের উপর ট্যাক্স দেয় ও মদ্যপান চালিয়ে যায়।

সম্ভবত রক্তালঙ্কার বাজ্যাপ্ত করার কোন স্বৈরাচারী আদেশে উদ্দেশ্যসাধন হতে পারে। এ ধরনের সামাজিক বাতিলগুলি গণতান্ত্রিক উপায়ে শুধরাবে না। এমনকি কোন স্বৈরাচারী আদেশেও 'অতিরিক্ত রক্তালঙ্কারের' মত কোন বাঁচোয়া ধারাকে বাদ দিতে হবে।

এই মানসিক আবেশকে দূর করা যেতে পারে কেবলমাত্র সঠিক ধরনের জ্ঞানকে মনে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে। স্কুলের শিশুরা তাদের সহপাঠীদের মধ্যে কাউকে কপালে চড়া জাত-চিহ্ন লাগাতে দেখে, তাহলে তারা হাততালি দিয়ে ও হাসাহাসি করে তাকে যাচ্ছেতাই বিদ্রোপ করে। এর অনুরূপ মনোভাবই আমাদের সমাজে গড়ে তুলতে হবে এবং গহনার চলন্ত আলমারীকে অন্য নারীদের দ্বারা এলোপাতাড়ি বিদ্রোপের লক্ষ্য করতে হবে। শিক্ষিতা মহিলারা, ডিগ্রী প্রাপ্তারা,

ধনী মাংসভোজী যেন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং গহনা-গাঁটির বাতিলকরণেরা যাতে উদাহরণ দান করতে পারেন, তার উদাহরণ হিসাবে কাজ করেন।

রক্তালঙ্কারের এরকম বাতিল তামিলনাড়ু ছাড়া পৃথিবীর আর অন্য কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ধনী মহিলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, এমন কি মধ্য শ্রেণির নারীরাও অলংকারের বাতিলের পাল্লায় পড়েন। এতে কোন মঙ্গল লাগান হয়েছে কি? গার্হস্থ্য বিবাহ, প্রস্তাবিত বিবাহে বাধা, সঙ্গীবিহীন যুবতী নারী পক্ষে কোথাও যেতে অসমর্থের মত দুঃখজনক পরিস্থিতি ইত্যাদি—অলংকারের বাতিল থেকে শুধু এগুলিই দেখা দিয়েছে।

(২৮. ১২. ১৯৫৩ তারিখে 'বিনুগলি' পত্রিকায় পেরিয়ারের প্রথম নিবন্ধ)

# ডিরোজিয়োর পড়াশোনা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন : ডেভিড হেয়ার, হেনরি ডিরোজিয়ো আর টমাস মেকলে—এরাই ছিলেন ‘নব্যযুগের তিন প্রধান দীক্ষাগুরু’। ডিরোজিয়ো আর হেয়ারের পাশে মেকলেকে রাখা সমীচীন হয়েছে কিনা—এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। শিবনাথ শাস্ত্রী মনে করতেন : ‘তিনি জনই তাঁহাদিগকে একই ধুরা ধরাইয়া দিলেন;—প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হয় এক প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচা-পক্ষপাতিতার বোঁক বন্ধসমাজে বহুকাল চলিয়া আসিয়াছে।’ শেষ কথাটি মিথ্যা নয়, কিন্তু তার জন্যে ডিরোজিয়ো আর হেয়ারকে দাগি করা অনুচিত। আপাতত সে-আলোচনায় না গিয়ে ডিরোজিয়োর বিষয়টি দেখা যাক।

ইংরেজিতে যাকে বলে ‘চাইল্ড প্রভিজি’, জার্মানে ‘ভুন্ডেরকিন্ড’ বা ‘বিশ্বায়শিত’, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়া (১৮০৪-১৮০৯-২৬.১২.১৮৩১) ছিলেন তা-ই। তেঁর বহুরেরও কম বয়সে তিনি কলকাতা শহরে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিলেন : ‘জোজু হেস্লাম’ নামেই সেটি প্রসিদ্ধ। ছাত্ররা তাঁর কাছে পড়ে তাঁদের পিতৃপিতামহর ধর্ম নিয়ে বাস্তবরূপ করছে, নাগাদানুদ করছে খ্রিস্টান পাব্লিশের—এই ছিল প্রধান অভিযোগ। অথচ ডিরোজিয়ো কখনওই নিরীশ্বরবাল প্রচার করেননি, ছাত্রদের তিনি নিকিঁচরে কোনোকিছুই না-মনাতে শেখাতেন।

ক্ষণজন্মা বলতে যা বোঝায়—অসাধারণ উপবান—ডিরোজিয়ো ছিলেন তা-ই। তাঁর পরিচয় প্রধান হিন্দু কলেজে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের এক ব্যতিক্রমী শিক্ষকরূপে। মাত্র পাঁচ বছরের শিক্ষক-জীবনে একদল বিশেষজ্ঞদের মনে তিনি এক বিষম খট্টিয়ে দিয়েছিলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিবাদে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন ডিরোজিয়ো।

এছাড়াও কবি ও সাংবাদিক হিসেবে ডিরোজিয়ো ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। জন্মসূত্রে ইউরেশিয়ান (পোর্চুগিস-ভারতীয়) হলেও ভারতকেই তিনি তাঁর নিজের দেশ বলে মনে করতেন। স্বদেশপ্রেমের প্রথম কবিতা তাঁরই রচনা।

কিন্তু ডিরোজিয়োর আরও একটি পরিচয় আছে। অত অল্পবয়সে এমন বিদ্বান

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। শুধু সাহিত্য নয়, দর্শনেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল বিশাল। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই যে কিশোরছাত্রদের মনে **AM** জ্ঞানের পিপাসা জাগিয়ে তুলতেন, তাঁদের উৎসাহ দিতেন নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি মতবিনিময় করতে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন :

ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে, কিন্তু **৮** থেকে বেমন লৌহকে আকর্ষণ করে ভেদনি তিনিও অপরাপর শ্রেণীর গুরুদিগকে আকৃষ্ট করিলেন। তিনি স্থলে পদদর্শন করিবামাত্র বালকগণ তাঁহার চারিদিকে বিরিত। তিনি তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে ভালোবাসিতেন। স্থলের **৮**টা ইংরা গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া তাহাদিগের পাঠে সাহায্য করিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যাকথনের এই রীতি ছিল যে, তিনি এক পক্ষ অকলম্বন করিয়া স্বলকদিগকে অন্য পক্ষ অকলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন; এবং স্বাধীনভাবে তর্ক বিতর্ক **৮**গণে দিতেন। এইরূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তা-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল।

কলে ছাত্ররা এমন সব বই পড়ে ফেলত যেগুলো অন্যথায় তাদের পড়া হত না। **৮**দের তিনি নিজের মতো করে ভাবতে বলতেন, তাঁর নিজের মত তাদের **৮**গণ চাপিয়ে দিতেন না। গৌড়ামির শেকল ভেঙে তারা বেঁধিয়ে আসুক—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন : ‘The earliest Hindoo Collections were our pioneers and the first to rebel against their spiritual guides and summon Hindooism to the bar of their reason’ এই ভেবে বর্ধাই শিক্ষকের কাজ।

মজে নিরবিত না-পড়লে ছাত্রদের মনে এমন ছাপ ফেলা যায় না। তখনও **৮**মনো বিশ্ববিদ্যালয় পল্লভ হয়নি। নামে ‘কলেজ’ হলেও হিন্দু কলেজ আসলে ছিল **৮**না। দশম থেকে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হত। দুসোহসে ভর করে ডিরোজিয়ো **৮**গণা চোদ্দো বছরের ছেলদের মনের সব দরজা-জানলা খুলে দেওয়ার চেষ্টা **৮**গণেন। অথচ তিনি নিজে ডেভিড ড্রামন্ড-এর ধর্মতত্ত্ব আলাউদ্দিন-র বাইরে **৮**গণনা ওচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়েননি। সবদিক দিয়েই তিনি ছিলেন **৮**গণাশক্ত যা কিনা, প্রথম চৌধুরীর মতে, সুশিক্ষিত হওয়ার একমাত্র উপায়।

গাপাণী সন্তি অবাধ করার মতো। শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিয়ো কাজ শুরু **৮**গণ ১৮২৬-এ। যখন তাঁর বয়সে আঠারো। তাঁর যে-ছাত্ররা পরবর্তীকালে

ডিরোজিয়ান বা ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত হতেন, তাঁরা খুব বেশি হলে তাঁর থেকে পাঁচ বছরের ছোটো। হরচন্দ্র ঘোষ তো ডিরোজিয়োর চেয়ে প্রায় এক বছরের বড়ো। ডিরোজিয়োর সাক্ষাৎ ছাত্র না-হলেও অরারটাল চক্রবর্তী এই দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। অনেক সময় ইয়ং বেঙ্গলকে 'চক্রবর্তী ক্যাম্প' বলা হত। তিনি তো ডিরোজিয়োর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক জয়গোপাল ভট্টাচার্যের এঁদের নিয়ে, অনেকেরই নাম করে, তিনটি শ্লোক রচনা করেছিলেন। শেষ শ্লোকটি এইরকম :

ফিরাদীপুদব শ্রীমদ্ভিরোজিও-কুশেশ্বরে।

মদুকনরতাঃ সম্যগ্দিববিদিস্তজ্ঞানবর্জিতাঃ।\*

কুশেশ্বর—পদ্ম রত্নপদ্ম। ছাত্রদের তুলনা করা হয়েছে সেই পদ্মর মধুপায়ী মউমাক্ষি সঙ্গে।

কুশেশ্বর হোম্যান উইলসনকে লেবা একটি চিঠিতে (২৬ এপ্রিল ১৮৩১) ডিরোজিয়ো জানিয়েছিলেন, কোনো দার্শনিক প্রাণে তিনি একপক্ষের মত শেখাতেন না, অন্যপক্ষের মতও দেখতে বলতেন। যেমন, ইশ্বরবিবাসের বিরুদ্ধে ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬)-এর বিখ্যাত আলাপ (ক্রিয়ানব্ধেস ও ফিলো নামের দু'জন ব্যক্তির বাদ-অতিবাদ)-এর সারাংশ কলার পর, হিউমের বিরুদ্ধে ড. রেড ও ডুম্পার্ড স্টুয়ার্ট-এর যুদ্ধের উদ্ভবগুলিও তিনি ছাত্রদের জ্ঞাপন দিতেন, 'বে উদ্ভবগুলি অজ্ঞাত অবস্থিত রয়েছে।' এর থেকে বোঝা যায় ডিরোজিয়ো নিজেও হিউমের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হননি, বরং রেড ও স্টুয়ার্ট-এর পাল্টা যুক্তিকেই মর্যাদা দিয়েছেন।

হিউমের কোন রচনার কথা ডিরোজিয়ো বলছেন? ছাত্রপাঠ্য থেকে কোনো ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস কইরে এই রচনাটির কথা পাওয়া যায় না। ডিরোজিয়ো বিষয়ক যেকোনো আলোচনা আমি দেখেছি তার কোথাও এই বিশেষ রচনাটিকে শনাক্ত করা হয়নি। আসলে ডিরোজিয়ো বলেছিলেন ডায়ালপ্টিস কনসার্নিং ন্যাচারাল রিলিজিয়ন নামে হিউমের একটি বইয়ের কথা। তাঁর মৃত্যুর পর লেবকের নাম ছাড়াই সেটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৭৭৯-তে, যদিও বইটি ১৭৫১ বা '৫২-র লেখা হবার গিয়েছিল। এই বইটিও ডিরোজিয়োর হাতে পড়েছিল।

গুণু ডেভিড হিউম নন, জন লক (১৬৩২-১৭০৪)-এর রচনাও তিনি পড়তেন

৭৭ ছাত্রদের পড়তে দিতেন। সেকালের ছাত্ররা যে একালের ছাত্রদের চেয়ে অনেক বেশি লাত্যেক ছিলেন তা বোঝা যায় রামগোপাল ঘোষের একটি উক্তি থেকে। লক পড়তে পড়তে তিনি বলে উঠেছিলেন : 'লক-এর মাথা প্রবীণের মতো কিন্তু রসনা শিশুর মতো।' অর্থাৎ লকের চিন্তা প্রগাঢ় হলেও তাঁর ভাষা খুবই সাকলীল। লক পড়ে বোঝা খুব সহজ কাজ নয়, বিশেষ করে পনেরোরও কম বয়সি কোনো ছেলের পক্ষে। আড়াইশো বছর আগের ইংরেজি, তাঁর শব্দব্যবহার, ব্যাকের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বেশ বড়োরকমের বাধা। কিন্তু 'এডুরাজ' রামগোপাল অত অল্পবয়সে লক পড়ে গুণু বুঝতেন তাই নয়, তাঁর ভাবারীতির গুণকিত্তর করতে পারতেন—এও তো অস্বাভাবিক মতো। ডিরোজিয়োর হাতেই তাঁর শিক্ষা—একথা মনে রাখলে শিক্ষক ও ছাত্র দুজনের সম্পর্কেই সমান প্রজ্ঞা আছে।

পর উঠতে পারে : ডিরোজিয়োর দীক্ষাভক্ষ কে? উত্তর অত্যন্ত সরল : ডিরোজিয়োর কোনো গুরু ছিলেন না, তিনি নিজেই নিজের গুরু। তবে ডিরোজিয়োর গুণর সাক্ষাৎপ্রভাব পড়েছিল তাঁর শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ড (১৭৮৭-১৮৪৭) এর। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের লোক, মুক্তচিন্তার অধিকারী, ভাষাশিকার ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতির প্রবর্তক। কলকাতাবাসী স্কটিশদের সম্পর্কে তখন বলা হত:

If you speak to a Scotchman, he overwhelms you with the names of Hume, Smith, and Robertson, Push him still further, and you get Beattie, and Reid and Stewart, and then Campbell, and he gradually become more and more puzzled, unless he escapes by knocking you down with Burns.\*

দ্রামন্ডও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

সাহিত্যের বাইরে ডিরোজিয়োর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল দর্শন, বিশেষত শ্রীলংকা। তাঁর মতামত পড়ে উঠেছিল ব্রনলিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬), জন লক (১৬৩২-১৭০৪) হিউম পড়ে। হিউমের প্রভাবই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অদর্শ সংসারী (সেপারিন)। ইশ্বর আছেন না নেই—এ বিষয়ে তাঁর স্বাধীন জীবনে তিনি কিছুই কবিতা করেননি। কিন্তু তাঁর জন্যে কোনো প্রচলিত ধর্মের অনুগত থাকণও তাঁর প্রাণে মগন ছিল না। মৃত্যুর আগে তাঁর কাছে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত দেখা গিয়েছিল, কিন্তু খ্রিস্টমতের প্রতি ডিরোজিয়ো কোনো আস্থা জনাননি,

কেনো দলিলে সই করেননি। মৃত্যুর আগে তিনি শুনতে চেয়েছিলেন স্বটিশ কবি টমাস ক্যাম্পবেল (১৭৭৭-১৮৪৪)-এর প্রজ্ঞারস্ব অফ হোপ (১৭৯৯) কবিতাটি। এই প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র মৈত্র সঠিকভাবেই এনেছেন ডেভিড হিউম, ইউটোপীয় সমাজবাদী রবার্টওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) ও জার্মান সুরকার মোৎসার্ট (১৭৫৬-১৮২১)-এর মৃত্যুকালের কথা—কোনো ধর্মিককে তাঁরা তাঁদের মৃত্যুশয্যার কাছে ঘেঁষতে দেননি।”

গ্রেগের হেন্সন উইলসনকে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে (২৬ এপ্রিল ১৮৩১) ডিরোজিয়ার সপ্রশং উল্লেখ করেছেন ফ্রান্স বেকনের, হিউমের মরণোত্তর প্রকাশিত বইটির কথা সেখানেই এসেছে। আঠারো শতকের আইনবিদ রোমলি, ব্র্যাকস্টোন, জেরেমি বেন্থাম প্রমুখের রচনার সঙ্গেও ডিরোজিয়ার পরিচয় ছিল। তাঁর প্রভাবকেই হিন্দু কলেজের ছাত্ররা টমাস পেন-এর যুক্তির যুগ কালোবাজারের দ্বাংসেও কিনতেন। ষোল্লারতুই ও কন্ট-এর রচনাবলির সঙ্গে ডিরোজিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় ছিল।”

কিন্তু শুধু বই পাড়ে নয়, নিজেও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেই ডিরোজিয়ার তাঁর মতামত পাড়ে তুলেছিলেন।

এত অল্প বয়সে ডিরোজিয়ার যাত্রা গিয়েছিলেন যে তাঁর পড়াশোনার সীমাবদ্ধতা নিয়ে কিছু বলা অনুচিত। তবু কয়েকটি দিক লক্ষ করার মতো। বেকনের অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতিবিজ্ঞানে ডিরোজিয়ার কোনো কৌক দেখা যায় না। তিনি ইতিহাস পড়াতেন, কিন্তু সে শুধুই ইউরোপীয় ইতিহাস। তাঁর সমকালে হেনরি টমাস কোলব্রুক, গ্রেগের হেন্সন উইলসন প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতবিন্দ্য চর্চার সূচনা করেছিলেন। উইলসনের সঙ্গে ডিরোজিয়ার ভালোই পরিচয় ছিল। তবু প্রাচীন বা আধুনিক ভারতের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ডিরোজিয়ার কোনো কৌতুহল ছিল না, অন্তত তার প্রমাণ নেই। এমনকী ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর কুচি ছিল সংকীর্ণ। শেলি, কিটস্ তো দূরের কথা—ট্রেক, বার্নস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা কেলারিঙ্ক-ও তাঁর মনে দাগ কাটেনি। বারব্রুক ও টমাস মুরকে তিনি পছন্দ করতেন বেশি। তবে নব ধ্রুপদী ধারাতেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন : তাঁর কবিতাই তার প্রমাণ। টমাস ক্যাম্পবেল ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। ক্যাম্পবেলকে কলা হয় রোমান্টিক পর্বের ‘ধ্রুপদী’ ঐতিহ্যের প্ররক।” তবে

নয়। ঠিক যে রাজনৈতিক দিক থেকে ক্যাম্পবেল ছিলেন প্রগতিশীল, দাসপ্রথার মতামত সমালোচক। ডিরোজিয়ার ছাত্ররাও তাঁদের শিক্ষকের ক্রটিকেই স্বীকার করে চালাতেন।

পঞ্চ উঠতে পারে : সেযুগে কলকাতার মতো অখ্যাত শহরে বাসে ডিরোজিয়ার এক বড় পেতেন কী করে। ঘটনা হচ্ছে, আঠারো শতকের শেষ থেকেই কলকাতায় এক পাঠ্য বিষয়ের বই আমদানি হতো। কালকটা গেজেট-এর পাতায় ১৭৮৪ থেকে এমন বছর পাওয়া যায়। ১৮১০-এই টমাস পেনের মানুষের অধিকার কলকাতায় পৌঁছেছিল। ধর্মপ্রচারকদের যুক্তিবাদ-বিরোধী প্রচারের বইও যেমন খাদ্য, তেমনি আসত প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের বিরোধী একত্ববাদী (মন্টগোমারিয়ান) ও দেববাদী (ডেইস্ট)-দের বইপত্র। সুতরাং ডিরোজিয়ার ও তাঁর ছাত্রদের বইয়ের অভাব হয়নি।” বিশেষ করে বেকন, লক ও হিউমের রচনাবলি কলকাতায় সহজেই পাওয়া যেত (প্রসঙ্গত বলা যায় : বক্তৃবাদ-এর ইতিহাস আলোচনার বেকন ও লকের ভূমিকা অকুঠায় স্বীকার করেছেন কার্ল মার্কস)।”

ডিরোজিয়ার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল বিশাল। যে-বই কলকাতায় প্রথম প্রকাশিত সেটিই তাঁর তাকে দেখা যেত। সব প্রয়োজনীয় বই তিনি কিনতেন, পড়তেন ও ছাত্রদের পড়তে দিতেন।

এক উত্তরের খেই ধরেই আরও একটি প্রশ্ন উঠতে পারে : হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭)র আগেই এত বিচিত্র ধরনের বই কলকাতায় আসছে, কিন্তু সেগুলো পড়তেন কারা? এর উত্তর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য দিয়েছেন :

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হচ্ছিল, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হওয়া গিয়াছিল; যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাঙ্গালদেশে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদের অনেকের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেন্সার নাস্তিক মতবাদে তাহারা তিনি কখনও গোপন করেন নাই, ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের পান্না মেঘা প্রাধান্যের ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reason (যুক্তি)-এর পূজা করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এ দেশীয় ছাত্রের পান্না পান্না ঢালিল; চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই কন্যায় ভাসিয়া গেলেন; তাহাদের নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?”

এইভাবেই উনিশ শতকের বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছহজায় পুরোপুরি অধ্যয়ন (সেকিউলার) শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। ডিরোজিয়ার থেকে বিদ্যাসাগর-কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পর্যন্ত (ও তার পরেও) সেই ধারা বজায় ছিল। অন্ধবিশ্বাস নয়, সবিচার যুক্তিশীল মন গড়ে তোলার জন্য পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের বাইরে নানা বিরোধী মতেরবই পড়ার অভ্যাস হয়েছিল। অনেক পরেও তার রেশ মিলিয়ে যায়নি।\* এই শিক্ষার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন ডিরোজিয়ার, বয়সে নবীন কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রবীণ সেই পোর্চুগীজ ভারতীয়।

টীকা :

- ১। শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৪২।
- ২। অকল্প স্বদেশপ্রেম বলতে আপামর স্বদেশীয় প্রেম ধরলে ভুল হবে। ইং-ভারতীয় সম্প্রদায় ছাড়া আর কোনো মানুষের স্বার্থ ডিরোজিয়ারে দেখতে না। [The portrayal of Derozio as an Indian patriot or even as one who planted the seeds of patriotism in the minds of his pupils, is, to put it mildly, a highly coloured picture and does not really conform to reality.] সৌভাগ্য চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, (৯)-(১০)।
- ৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, ৮৫।
- ৪। প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৭, (৩২)-(৩৩)।
- ৫। প্রমথ চৌধুরী, ১:১৬৮।
- ৬। বিনিনবিশ্বাসী গুপ্ত, ৩৫৩-র উদ্ধৃত। অন্তর্ভুক্ত পাঠ্য গুরু করে দেওয়া হয়েছে।
- ৭। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২৬-এ উদ্ধৃত।
- ৮। শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন : 'এই উক্তিটি ডিরোজিও অতিশয় সঙ্কট হইয়াছিলেন' (১১৩)।
- ৯। সুরেশচন্দ্র মৈত্র, ২৯-৩০ উদ্ধৃত।
- ১০। ঐ, ১০৭।
- ১১। ঐ, ১০৩, ১৩২-৩৩ হ্র।
- ১২। বীচ, ৪৭-৪৮ হ্র।
- ১৩। সুরেশচন্দ্র মৈত্র, ২-১০ ও অমিত রায়, ৩-১১ হ্র।
- ১৪। মার্কস, ১৫১-৫৩।
- ১৫। বিনিনবিশ্বাসী গুপ্ত, ১৩১-৩২।
- ১৬। গুরুদাস সরকার (জন্ম ১৮৮৪) গর্ব করে বলেছেন : 'আমাদের তখনকার শিক্ষাদীক্ষা ভারত সরকারের বর্তমান (১৯৫০) Secular নীতি অপেক্ষা কম Secular ছিল না' (১৮৩)।

বচনাপঞ্জি :

- গুরুদাস সরকার। 'অধ্যাপক নিশিকান্তসান্যাল', কৃষ্ণনাথ কলেজ সেকিউলারি কমেমোরেশন ভলিউম, ১৮৫৩-১৯৫২। বহরমপুর : ১৯৫৩।
- প্রমথ চৌধুরী। প্রবন্ধ সংগ্রহ। বঙ্গ ১। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫২।
- বিনিনবিশ্বাসী গুপ্ত। পুরাতন প্রসঙ্গ। কল্যাণভারতী, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।
- শিবনাথ শাস্ত্রী। রামতনু দাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৫৭।
- সুরেশচন্দ্র মৈত্র। অশান্ত বঙ্গ। জিগ্মসু কৃষ্ণ। পুণিপত্র, ১৯৮৮।
- Beach, Joseph Warren. English Literature of the Nineteenth and the Early Twentieth Centuries. 1798 to the First World War (Vol. IV of A History of English Literature, ed. Hardin Craig). New York : Collier Books, 1966.
- Chattopadhyay, Goutam (ed.) Bengal : Early Nineteenth Century (Selected Documents). Calcutta : Research India Publications, 1978.
- Hume, David. Essential works. Ed. Ralph Cohen. New York : Bantam Books, 1965.
- Marx, Karl and Frederick Engels. The Holy Family, or Critique of Critical Criticism against Bruno Bauer and Company. Moscow : Progress Publishers, 1975.
- Mitra, Peary Chand. Biographical Sketch of David Hare. Calcutta : Basumati Sahitya Mandir, 1949.
- Roy, Amit. 'A Short History of Calcutta Book-Sellers', Satapatra. Centenary Commemorative Volume (1886-1986), Calcutta : Das Gupta & Co.
- কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : অমিতাভ ভট্টাচার্য, কৌশিক মুখোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি বসোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ দত্ত।
- চন্দন : দুপুর

# রবীন্দ্রনাথকে হাইজ্যাক করতে চাইছে বর্ণাশ্রম সংঘ

আশীষ লাহিড়ী

বিশ্ব 'সমতট' পত্রিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবিক মূল্যবোধ কেন্দ্র'র পরিচালক, অধ্যাপক শীতাল চক্রবর্তীর একটি রচনা ক্রোড়পত্র আকারে প্রকাশিত হয়েছে। নাম : 'ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ এবং মানবিক মূল্যবোধ : নিকট দিগন্তে কালো মেঘা' প্রবীণ অধ্যাপক চক্রবর্তী কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট-এ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং-এর অবসরপ্রাপ্ত ক্রান্তিমান প্রাক্তন শিক্ষক। এই ইনস্টিটিউটেই তিনি বিবিধ কর্পোরেট ও সরকারি সংস্থার সপ্তগ্রন্থায় মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে সারস্বত চর্চায় একটি কেন্দ্র গড়ে তোলেন। কোমল ও অন্যান্য ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের পাঠ দিয়ে কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট আর মানবিক মূল্যবোধকে মেলানোই তাঁর এত। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবিক মূল্যবোধ কেন্দ্র' আই আই এম-এর এই সংস্থার সম্প্রসারণ কি না তা অবশ্য জানতে পারিনি। ওপরের লেখাটিতে সংক্ষেপে লেখকের বক্তব্য এই যে, বর্ণাশ্রমিক হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রত অশ্রয় ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে 'সেকিউলার' ও বৈজ্ঞানিক ভাবনাকে প্রশয় দেওয়ার ফলেই বাঙালি ভদ্রলোকদের মূল্যবোধের আকাশ ছেয়ে গেছে কালো কালো বিঘাত মেঘে; সেই শাস্ত্রত হিন্দু মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার কথাই বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ; এখনই সেই মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে না পারলে আধুনিক বাঙালিদের শাপমোচন হবে না।

শ্রীঅরবিন্দর এবিধ প্রয়াসের কথা জানা ছিল; কিন্তু যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের সংগ্রহ থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, নিজেকে বলেছিলেন ব্রাহ্ম, সেই কবিগুরুও যে চুপিচুপি এই পথে হেঁটেছিলেন, এটা সংবাদ। এটা অধ্যাপক মহাশয়ের এক মহান উদ্ভাবন।

বর্ণাশ্রমিক (বর্ণাশ্রম বললেও দোষ হয় না) সংঘের এ ধরনের প্রয়াস ও তার

বিবরণ গীতবাদীদের প্রতিরোধ, দুটোই অবশ্য অতি প্রাচীন (স্মরণীয় শিবরাম চক্রবর্তী 'মহো ক্রম পঞ্জিকার', ১৯২৯)। ইলনীং, বিশেষত পশ্চিম বাংলায়, কণাশ্রমিক মহলে কিঞ্চিৎ বেশি সতর্কতা অবলম্বন করে নিজেদের বক্তব্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রকাশ করেন। কিন্তু অধ্যাপক চক্রবর্তীর আন্তরিক ক্রোধ মাথা ছড়িয়ে যাওয়ায় তিনি সেই সতর্কতা অবলম্বন করতে ভুলে গেছেন; ফলে ভক্তরকার কথাটা খোসা-আঁটি-শাঁস সবওঁছু উগরে এসেছে। সেইখানে আর লেখাটি শিক্ষাপ্রদ। এই লেখায় এঁড়তর্কের বোঁকে তিনি বিদ্যাসাগরকে কীভাবে হেয় ও রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে বিকৃত করেছেন, তা নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি (দ্রষ্টব্য 'অন্তঃসার', ২০১৪ শারদীয় সংখ্যা), এখানে তার পুনরাবৃত্তি করছি না। এখানে দেখতে চাইছি, কী তাঁর মূল বক্তব্য এবং কী এখানে ধুক্তি, তথ্য ও তত্ত্ব প্রয়োগ করে তিনি তা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন।

মূল আলোচনায় যাবার আগে একবার দেখে নিতে চাই পশ্চিমবঙ্গের গা-ধাককা গণতন্ত্রের বর্তমান দুঃসহ পরিবর্তির জন্য 'ভোটো' কমিউনিস্টদের দায় চন্দা।

## কমিউনিস্টদের কুড়ুল সংস্কৃতি

যে কোনো অপগঠিত জুগই শেষ পর্যন্ত দানব প্রসব করে। স্বাধীনতার পর থেকে বাঙালি সংসদীয় কমিউনিস্টরা কোনো পরিবর্তনটাকেই শেষ পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেননি; যেটুকু পরিবর্তন করলে ভোটের সাপ বরণে কিছু দ্বিতাবস্থার লাঠি ভাঙবে না, সেটুকুতেই ক্ষান্ত থেকেছেন। তার পরোক্ষ বড়ো নিদর্শন যোগ হয় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নিয়ে তাঁদের সুবিধাবাদী মনোভাব। সমাজের, বিশেষ করে চোরা জাতপাত-আকীর্ণ বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের, অধিকাংশ পিছুটানের মূলেই আছে প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম—একথা বুঝে কোনো করে জানা সত্ত্বেও তাঁরা 'তৎকালিক' ভোট-ব্যাক্সের দিকে তাকিয়ে তা নিয়ে বিশেষ কিছু করলেন না, নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলেন কেবল সাম্প্রদায়িক দাশা-ধর্মের ক্ষুদ্র আভিয়ার। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ভাইরাস যে অতি-ব্যাপারকালীন তত্ত্ব তাঁদের সমস্ত সুকর্মের ভিত্তি ধসিয়ে দিচ্ছে, সংখ্যাগুরু-সাম্প্রদায়িকতাবাদ—এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘুর নিরাপত্তাহীনতাজনিত

রবীন্দ্রনাথকে হাইজ্যাক করতে চাইছে বর্ণাঙ্ক সংঘ

পালটা সাম্প্রদায়িকতার—বারুদ মজুল করে রাখছে ঘরে ঘরে, এটা তাঁরা দেখেও দেখলেন না। তাঁরা জ্ঞানেন, ধর্ম বড়ো নাজুক জিনিস, যুক্তিতর্কের গ্রোদ তার ত্বক ফলসে দেয়। ত্বক ফলসে গেলে ভেট দেবে কে? তাঁদের যুক্তি ছিল, কোনো এক পরম স্তরলয়ে যখন 'কিন্নর' আসবে, যখন শাসনক্ষমতায় থাকবে শমিকশ্রেণী, তখন 'অবসরমতো' এ নিয়ে ভাবা যাবে খন।

দিনের পরে দিন গেল। অ-কমিউনিস্ট রক্ষণশীলরা মনের দুখে মনে পুণে দশকের পর দশক ধরে 'আরসা দিন নেহী রহেগা' জপতে জপতে সাংস্কৃতিক বনবাসে রইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বিশ্বাসী সংসদীয় বামপন্থীরা মনের সুখে কুড়ুল-সংস্কৃতির চর্চা চালিয়ে গেলেন। কুড়ুল-সংস্কৃতি কথটা হিন্দীশ পোষামুঁড়ি। একটা কার্টুন এঁকেছিলেন তিনি। কুটপাথে বসে একটি লোক মস্ত এক ভুড়িভর্তি কুড়ুল নিয়ে তার স্বরে ঝাঁকছে, 'শত্রুর নিয়ে বান বাবু, নিজের পায়ে মারবেন।' অসাড় পায়ে কুড়ুল মারতে মারতে, ক্ষমতার নির্বোধ সুখে তলিয়ে যেতে যেতে, কখন তাঁরা আবার সেই আগেকার রক্ষণশীল ভ্রমলোকটিতে পরিণত হয়েছেন সেটা বুঝতেও পারেননি। পশ্চিমবঙ্গের একজন সংসদীয় কমিউনিস্ট আর প্রতিষ্ঠান-বিরোধী নন, তিনিই প্রতিষ্ঠান। একটা পর্যায়ে এসে সংসদীয় স্তরে মুড়ি আর মিষ্টি আর অলাদা করা গেল না। একদা যে মহাবিশ্ব ভ্রমলোকিয়ার ভেঙে নিম্নবর্ণকে মর্মান্বাদ দিতে শিখিয়েছিলেন পুরোনো কমিউনিস্টরা, আংরেজি-মিডিয়াম-শিক্ষিত, কল-সেক্টর-উচ্চাশী, আইটি-মুখি, ম্যানেজমেন্ট-স্বপ্নাঙ্ক সেই মহাবিশ্ব এবার বুঝল, কিছু যখন আসলে বদলাবেই না, তখন খামোকা এসব গ্লোদ-কলসানো ভাবনা ভেবে কী লাভ? সমাজটা মোজেসের লোহিত সাগরের মতো ইংরেজি-মিডিয়াম (সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ হিন্দী) ভ্রমলোক আর বাংলা-মিডিয়াম ছোটলোকে দু'ভাগ হয়ে গেল, পশ্চিম বাংলার সংসদীয় কমিউনিস্টরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। যেহেতু তাঁরা ভোটের জোতা ছাড়া অন্য কোনো প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখেননি, তাই মনের পায়ে নীচে চমকবার মতো কোনো মাটি আর রইল না।

অন্যদিকে ফেসব অ-কমিউনিস্ট রক্ষণশীল ভ্রমলোক মনের দুখে মনে পুণে দশকের পর দশক ধরে সাংস্কৃতিক বনবাসে ছিলেন, তাঁদের বনবাসের পালা শেষ, যুববাহিনী নিয়ে তাঁরা এবার ঘৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত। তাঁদের গোপন কর্মসূচি

এটা প্রকাশ্যে। এরকম অবস্থায় যে-একটা মাত্র ঘটনা ঘটা সম্ভব, সেটা ঘটতে দল করে নিয়েছে পশ্চিমবাংলায় : সাংখ্যগরিষ্ঠ হিন্দু ভ্রমলোকি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ফেলস ছেড়ে এবার প্রকাশ্যে দাপিয়ে বেড়াতে আরম্ভ করেছে। মাঝে 'ছোটলোক'দের যে বাফারটা ছিল সেটা এখন সরে গেছে। এখন বাড্ডাকে সামলে চলার দায় নেই ভ্রমলোক সাম্প্রদায়িকদের। অতি-আণুবীক্ষণিক ধরে যে-যমীয় ভাইরাস এতদিন ধরে গুমে গুমে বাড়ছিল, ভোট-বামরা উটপাখি সেজে যেটাকে অগ্রাহ্য করে চলেছিলেন, এবার তা সর্বসমক্ষে—বেশ করছি সাম্প্রদায়িকতা করছি, আপনার পিতামহকরের তাতে কী? কারণ জনগণ তো এই সাম্প্রদায়িকতাই চায়, ভোট সাক্ষী। হয়তো অচিরে দাবি উঠবে, মেয়েরা বিশেষ ব্রহ্মচর্যলো ক্ষেত্রের বাইরে লেখাপড়া শিখতে বা কাজ করতে পারবে না, কেননা জনগণ তাই চায়; জ্যোতিষ-বিজ্ঞানকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে চালু করে দেওয়ার স্বপ্নিত আয়োজনা এবার চালু করলে আর তেমন প্রতিরোধ হবে না, কারণ জনগণ তাই চায়। বেদান্ত-হিন্দুধর্ম-ম্যানেজমেন্ট সেতুবন্ধন তো অধ্যাপক মণ্ডলীর মতো পণ্ডিত মানুষরা অনেক আগেই ঘটিয়েছেন। অ্যাপ্রায়েড শাকপাণে ('বিফলে তিনগুণ মূল্য ফেরত') এবার পোস্ট-গ্রাজুয়েশন হবে—ভোটপাণ্ডা, চিহ্নি আর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন তার সাক্ষী। হয়তো সুদীপ্ত মেনা, গোপালী তেল আর ফলিত জ্যোতিষই জনগণের যাকতীয় চাহিদা মিটিয়ে দেবে।

### মহাশয়ের নাটের গুরু বিজ্ঞান

এটা পটভূমিটা মাথায় রাখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন একশ্রেণীর অশাশ্বত এলিট হিন্দু বুদ্ধিজীবী খুব প্রকাশ্যে বলতে সাহস পাচ্ছেন যে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ আর সেকিউলারিজমই হচ্ছে প্রগতির পথে সবচেয়ে বড়ো গালা। আলোচ্য অধ্যাপক মহাশয়ের ভাষায় :

ভারতীয় সংবিধানের প্রিফ্যাশেলে 'সেকুলার' ঘোষণাটি রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য বাইশটি দেশের সংবিধানে এই শব্দটি বর্জিত। উপরন্তু, ভারতীয় সংবিধানে নাগরিক কর্তব্য তালিকায় রয়েছে — 'to develop a scientific temper and a spirit of inquiry'। এ-ধরনের নির্দেশও অন্য কোনো সংবিধানে চোখে পড়েনি। মূলত এসব ঘোষণাগুলি

স্নাতন হিন্দু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আক্রমণ।

যুক্তিটা এইরকম যে অন্যান্য দেশের সংবিধানে যা নেই তা ভারতের সংবিধানে থাকবে কেন? আর বিজ্ঞানমনস্ক এবং অনুসন্ধিৎসু হওয়ার অর্থ হল 'স্নাতন' হিন্দু সংস্কৃতির বিরোধিতা করা। হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি পণ্ডিতপ্রবরের শ্রদ্ধা যে অসীম তাতে আর সন্দেহ কী।

ফলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে তিনি সাদ্যমাটা কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের ও শিল্প সংস্কৃতিরও বিরোধী। তাঁর সবল বিশ্বাস : দূরদর্শনে সমাজিক রায়ের 'দেবী' বা 'পপশব্দ' ছবি দুটি 'ব্রাহ্মণের বা হিন্দু দেব-দেবীস্থানের বা হিন্দুদের চিত্রায়িত, সুগভীর এবং জীবন্ত বিশ্বাসগুলিকে নষ্ট করার অস্ত্র রূপে ব্যবহার করা হয়। যারা অপকর্মগুলো করছে তাদেরকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপজ্ঞাপন করে জনসাধারণের সহজ-স্বচ্ছ বিশ্বাসকে হীন, তুচ্ছ কুসংস্কার বলে দেখানো হয়।' 'সদগতি' বোধহয় তিনি দেখেননি। আর প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী' গল্পের প্রট্যা যে রবীন্দ্রনাথের, সেটাও হয়তো তাঁর জ্ঞান নেই। তাঁর আসল রাগের জায়গাটা এই যে এইসবের ফলে 'অন্য মতাবলম্বীদের', অর্থাৎ মুসলমানদের, 'দৌরাহ্মা বেড়েই চলেছে।'

এতদিন লেখাপড়া-জ্ঞান গোকেদের কাছ থেকে আমরা শুনতাম : আমরা যথেষ্ট বিজ্ঞান জ্ঞানী না, আমরা যথেষ্ট যুক্তিবাদী নই, আমরা যথেষ্ট ফর্নিরপেন্ড নই, তাই আমাদের এই দুর্দশা। এবার উন্টোরখের পালা। এখন আমরা শুনছি, শুনব: প্রযুক্তি ভালো, কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কতা ভালো না, বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদ তো বিবকং পরিত্যজ্য, কেননা তা ধর্মের আশ্রয়কে সন্দেহ করতে শেখায়, ফলস্বরূপ ওপরে মস্তিষ্কে ঠাই নেয়। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্থান কেবল মুনফা কামানোর আঙ্গিনায়, ভোগবাদের আঙ্গিনায়—চেতনার আঙ্গিনায় তার কোনো স্থান নেই, বিজ্ঞানের পদ্ধতিতত্ত্বকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। জড়াতে গেলে কী হয়, তার নিদর্শন নরেন্দ্র দাভোলকর। উনিশ শতকে হিন্দু বাবুরা মুসলমানি দোকান থেকে কাব্য-রকটি খেয়ে আসত, কিন্তু বাড়িতে মুরগির ডিমও চুকতে দিত না; বিজ্ঞানের সঙ্গে কর্ণোগেট বর্ণাশ্রমবাবুদের সম্পর্কটাও সেইরকম। ভোট-প্রচারের কিংবা মঙ্গলে যান পাঠানোর প্রয়োজনে এঁরা আধুনিকতম প্রযুক্তির আশ্রয় নেবেন; কিন্তু ব্যক্তিগত,

গার্হস্থ্যিক ও সামাজিক জীবনে বৈজ্ঞানিকতা থেকে শতহস্ত দূরে থাকবেন।

এই কথাটা ঠিক এতখানি চাঁদুয়েলা ভাবার কলটি পশ্চিম বাংলায় এখনো বেশ কঠিন। তাই এখানে বর্ণাশ্রমবাবুরা একটু ঘুরপথ নিচ্ছেন। তাঁরা 'মূল্যবোধ' নামক একটি তথাকথিত শরমত বক্তার আশ্রয় নিয়ে বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ ও শের্কেউলারিজ্জের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করেছেন। তারই এক চমৎকার নমুনা হাজির করেছেন অধ্যাপক শীতাংশু চক্রবর্তী মহাশয়। এর জন্য বেচারী রবীন্দ্রনাথকে নির্দয়ভাবে কুপিয়েছেন তিনি।

জীবনের স্বল্পস্থায়ী একটি পর্বে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের শিকার হয়েছিলেন। এমন কি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র ও শিক্ষকদের জাতবিকার করে স্বতন্ত্র বর্ণ-ভিত্তিক পোশাক ও স্বতন্ত্র পদ্ধতি-আহার প্রথা চালু করেছিলেন। সেই স্বল্পস্থায়ী পর্ব থেকে প্রসঙ্গবিচ্যুতভাবে তেরোটি উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে বিনয়গর্বে সাজিয়ে দিয়েছেন পণ্ডিতপ্রবর (এই কাজটা তিনি বিজয়বিনোদ প্রসঙ্গেও করেছেন; দ্রষ্টব্য 'অন্তরসার', ২০১৪ শারদীয় সংখ্যা)। পড়লে মনে হবে, রবীন্দ্রনাথ যেন এ বিষয়ে সারা জীবন ঐ মতই পোষণ করে গেছেন। অথচ, খান্না ঠিক তার উলটো। ঐ স্বল্পস্থায়ী পর্ব থেকে উদ্ভীর্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথ পৌছে গিয়েছিলেন তাঁর বহু-আলোচিত 'মানুষের ধর্ম'-এ, যেখানে লোকেশ্বর এক মজার কথা বললেও বলেননি প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ঈশ্বরের কথা, জাতিবর্ণ ভেদেও কথা। সেই যুগে হিন্দু সমাজের কুৎসিত ভুক্তি উপেক্ষা করে সাহস করে শান্তিনিকেতনে চালু বন্দে মাতরম গানকে কোনো অ-পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের পক্ষে কেন 'জাতীয় সংগীত' হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় তা বুঝিয়ে বলেছিলেন; করেছিলেন সহশিক্ষা, মেয়েদের দিয়ে মঞ্চ প্রকাশ্য নাচের অনুষ্ঠান করেছিলেন; বন্দে মাতরম গানকে কোনো অ-পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের পক্ষে কেন 'জাতীয় সংগীত' হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় তা বুঝিয়ে বলেছিলেন; 'পীতা' নামক বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন প্রথমে অজিতকুমার চক্রবর্তীর কাছে, পরে 'পারসো' নামক ভ্রমণবৃত্তান্তে, মুসলমানি পোশাককে আপন করে নিয়েছিলেন। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা তাঁর অমর পত্রওচ্ছে রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর ধর্মমোহমুক্তির পরিচয় রেখে গেছেন। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবরের লেখায় রবীন্দ্রনাথ দেবীর নামটুকুও খুঁজে পাবেন না পাঠক। যেমন পাবেন না 'মানুষের

ধর্মের সামান্যতম উল্লেখ। এই মাপের একজন মানুষকে তিনি ঠেসে দিয়েছেন তাঁর কর্পোরেট বর্ণাশ্রমিক খাঁচার। এতবড়ো মিথ্যার বোম্বের বর্ণাশ্রমিক ধর্মই নয়; আমাদের মতো পাখিও এ কাজ করলে লজ্জায় মূখ দেখাতে পারতাম না। আমাদের মূল্যবোধে সেটা বাধত।

মেয়েদের স্থান ঘরে

চক্রবর্তী মশাই জানিয়েছেন, ১৯৪৭-এর পর থেকে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ আর সেকিউলারিজমের ব্রাহ্মস্পর্শে যে-সর্বনাশ হয়েছে তার একটা প্রধান বহিঃপ্রকাশ হল মেয়েদের স্বাক্ষরিতা এবং পোশাক-বদল: বাঙালি মেয়েরা শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার-কমিজ ধরায় তিনি মর্মাহত। রাজশেখর বসু অন্তত সন্তর বছর আগে যেটাকে সমর্থন করে গেছেন। আরো জ্ঞান অর্জনের অসীম আগ্রহে চোখ মেলে তিনি যখন দেখেন, 'শাত-কাটা আঁটো-সাঁটো ব্লাউজ এবং টাইট জীন্স-পরা একটি শামলা মেয়ে তার ছেলে বন্ধুর সাথে হেসে করমর্দন করছে, তখন বুঝতে পারেন, সভ্যতার আসল সংকটটা কোথায়! ফ্রয়েড-পড়া কোনো দুই লোক হয়তো বেয়াল করবে, প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় শুধু মেয়েটিরই পোশাকের ও চেহারা কণা দিয়েছেন, তার 'ছেলে বন্ধুর' নয়। আমরা জনতে পারি না, ছেলেটি কী পরেছিল, ধূতি-শার্ট না জীন্স-টি শার্ট, কেমন তার গায়ের রঙ। উনিশ শতকে ঠিক এইভাবেই মর্মাহত হয়েছিল একদল লোক যারা মেয়েদের উচ্চাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস পরাটাকে, বিধবাদের শেমিজ পরাটাকে, হিন্দুয়ানির চরম ব্যত্যয় মনে করেছিল। তার ওপর মেয়েদের চাকরি করা? সে তো বিকারের চরম—

ট্রামে-বাসে-ট্রেনে অসভ্য পুরুষদের সঙ্গে ফাড়াফাড়া করে, চটা থেকে চটা পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে মাইনে-সেওয়া বসের ধমক খেয়ে, সহকর্মীদের মন জুগিয়ে বা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি চাকরি করাই কি ইঙ্গিত identity?

প্রশ্ন হচ্ছে, এর প্রত্যেকটি কথা তো ছেলেরদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাহলে ছেলেরাও কি চাকরি করবে না? না, তা কেন? মেয়েরা হল মায়ের জাত, পুরুষরা বাঁটা-লাখি খেয়ে রোজগার করে টাকা এনে দেবে, তারা চালাবে সংসার। আধুনিক কর্পোরেট মূল্যবোধ নাকি তাই বলে।

অবাধ্য ছাত্রদল

১৯৭১-৭২ মহাশয়ের মতে, বিজ্ঞান ও সেকিউলার যুক্তিবাদ নিয়ে মাতামাতির খ্যাতিপট্টা অনিবার্য কুফল হল ছাত্রদের তর্কপ্রবণতা—যৌ আবার ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম সঙ্গুণ বলে অমর্ত্য সেন মনে করেন। এর দুটি উদাহরণ দিয়েছেন চক্রবর্তী মশাই। '২০০০ সনে কোনো একটি সর্বভারতীয় উচ্চশিক্ষা গণতন্ত্রের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তিনি দেশপ্রেমের উপযোগিতা বিষয়ে ছাত্রদের অবাধ্য করেন। প্রগোস্তর কালে একটি ছাত্র বলে: 'আমি তো জানি না পূর্বাপর কখন আমি কেন দেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম। এই জন্মের পর আবার অন্য কোন্ দেশে জন্মাব তাও জানি না। তাহলে স্বমকালীন এই জন্মের জন্য ভারতবর্ষের শাও দেশপ্রেমের সার্থকতা কোথায়?' অধ্যাপক মহাশয়ের এবং হিন্দু শাস্ত্রের কথামতো জন্মান্তরবাদ যদি সত্য হয়, আত্মার অবিনশ্বর্য যদি সত্য হয়, তাহলে এটি এই প্রশ্ন অত্যন্ত সংগত ও খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু চক্রবর্তী সাহেব এর মধ্যে দেখেন শুধু ঔদ্ধত্য। তিনি বলেন, 'তোমার এই জন্মের গর্ভধারিণী মাকেও খাগলে ভালোবাসার বিন্দুমাত্র যুক্তি নেই, কী বল?' এই ভয়ংকর 'মারি উত্তর শোন ছাত্রটি কী বলেছিল, সেটা অবশ্য আমরা আর জনতে পারি না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ পারি, অনুসন্ধিৎসা বস্তুটির ওপর অধ্যাপক সাহেবের কেন এত রাগ।

দ্বিতীয় উদাহরণটি আরো সরে। ২০০৩ সালে কলকাতার একটি নামকরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে হিন্দু শাস্ত্র-আধারিত 'ভারতের মূল্যবোধের মূল সুরগুলি তুলে' যেন অধ্যাপক চক্রবর্তী। একটি ছেলে তাঁকে প্রশ্ন করে: 'বলতে পারেন দাবতের সতীসাহ কেন মূল্যবোধকে তুলে ধরে? রামমোহন রায় কেন এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিলেন এবং এই প্রথা কেবল নারীদের জন্যই কেন শাসিত ছিল?' এই অত্যন্ত ন্যায্য প্রশ্ন অধ্যাপক মহাশয়কে প্রথমে 'কোভে স্তব্ধ' করে দেয়। তারপর তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, দেহজ্বর সহমরণে প্রবৃত্ত না হলে জোর দেন। সেটা চাপিয়ে দেওয়া নিশ্চই (বল্‌টং) অন্যায়।' অর্থাৎ কোনো মেয়ে 'অবাধ্য' স্বামীর চিতায় উঠে আত্মহত্যা করলে চক্রবর্তী মহাশয়ের বর্ণাশ্রম বিবেক কাজে আসে না। স্বভাবতই এ উত্তর ছেলেটিকে সন্তুষ্ট করতে পারে না; সে আবার প্রশ্ন করেন। তখন হিতপ্রসন্ন ম্যানেজমেন্ট-বেদান্ত বিশেষজ্ঞের 'দৈর্ঘ্যচ্যুতি' ঘটে, তিনি যত্নবশত বলেন, 'আগে বড়দের এবং অতিথিদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে

শেষ তারপর দেখা যাবে।' শিক্ষাদানের উপযুক্ত অসাধারণ মূল্যবোধই বটে।

### অকৃত যুক্তিধারা

বর্ণাঙ্গ মতাদর্শ শুধু অসহিষ্ণুতারই নয়, বিপুল অযুক্তিরও জন্ম দেয়। কয়েকটি উদাহরণ দিই। বর্ণাঙ্গমিক ধারণায় জাতিপরিচয় একটি স্বীকৃত ও অপরিহার্য বর্ণ। সুতরাং বর্ণাঙ্গম অনুযায়ী কোনো মানুষের পরিচয় দিতে গেলে তিনি কোন জাতের তার উল্লেখ যুক্তিসংগত। ব্রাহ্মণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্রাহ্মণের জাতির আপেক্ষিক নিম্নমুখ্যতাও এ তত্ত্ব অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত ও স্বতঃসিদ্ধ। অথচ এই বর্ণাঙ্গমবাদী বৈদান্ত-ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতের প্রসঙ্গ তুললে মারমুখী হয়ে ওঠেন : 'অনেককে সভায় আকর্ষণ বলতে শোনা যায় যে, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র—এরা কায়স্থ ছিলেন, ব্রাহ্মণ নয়।' কথটা তো সভ্য। শুধু এঁরা কেন, শিবরাম চক্রবর্তী লক্ষ্য করেছিলেন, অধিকাংশ দ্বিপাল বাহাদুরি বিজ্ঞানীই অ-ব্রাহ্মণ (জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, জ্ঞান ঘোষ)। এই বাস্তব, ঐতিহাসিক সত্য আমাদের সদ্ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপ্রবরকে কিপ্ত করে তোলে। তিনি লেখেন, 'বুদ্ধির বিকৃতি এবং তরলতা কোথায় নামছে! স্কুলের পাঠ্যপুস্তকেও চোখে পড়ছে ব্রাহ্মণদের প্রতি গ্রেবপূর্ণ উক্তি।' এটা তাঁর মত হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে তথ্য আর যুক্তি কোথায়?

একইভাবে, নাম না-করে অমর্ত্য সেন প্রমুখ বিদ্বানকে টেস দিয়ে তিনি লেখেন: 'বিশ্ববিশ্রুত কতিপয় ভারতীয় অধ্যাপকদের এও বলতে শোনা যায় যে, ভারতবর্ষের যে-দুজন সবচেয়ে স্বরণীয় সত্রটি ছিলেন তাঁরা হিন্দু নন—অশোক এবং আকবর।' তাঁর মতে এ সিদ্ধান্ত তুল। সে ক্ষেত্রে তাঁকে জানাতে হবে, তাঁর মতে সবচেয়ে স্বরণীয় দুজন ভারতীয় সত্রটি কে এবং কেন। শোনা যাক, এর উত্তরে তিনি কী বলেন—'রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারীদের কিংবা ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিব-জ্ঞানে জীবসেবার কথা... এঁদের মনে বা মুখে আসে না। এই সেবকরা যে ধর্মাস্তরকরণে ব্রতী হননি এ-কথাও উক্ত স্বনামধন্য বিশ্বজ্ঞানের স্বীকার করতে নারাজ।' এর অর্থোদ্ধার করতে হলে বৈদান্ত আর ম্যানেজমেন্টে কুলোবে না—সঙ্গে সাইকোলজির স্পেশাল পেপারও লাগবে।

তথ্য পরিসংখ্যান নিয়ে ভেলকি দেখানোর এই পেশাদার ম্যানেজমেন্ট

নিপুণতা স্বভাবসিদ্ধ হস্ত। তিনি জানিয়েছেন—

এই বর্ণাঙ্গম ধর্মের ভিত্তিতেই ভারত টানা ১৭০০ বছর পৃথিবীর সর্বোচ্চ GDP-র অধিকারী ছিল। ১৭৫০-সনের পর থেকেই অবনতির পাল্লা পড়ল। [দ্রষ্টব্য OECD, Paris-এর World Economy, পৃ: ২৬৩-৪১]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ভারত টানা ১৭০০ বছর পৃথিবীর সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও সমৃদ্ধ দেশ ছিল, যদিও বর্ণাঙ্গম ধর্মই তার কারণ কি না সে বিষয়ে বতর্ক আছে। কিন্তু সেটা আপাতত আলোচ্য নয়। আপাতত যে-কোনোটা লক্ষ্য করব সেটা হল : জিডিপি (যার বাংলা পরিভাষা 'স্থল দেশজ' নয়) প্রসঙ্গে মুখল ভারত সম্বন্ধে তাঁর বাহুর্ময় নীরবতা। কারণ ইতিহাস কালে, ভক্ত ১৭০০ বছরের মধ্যে 'স্থল আমলেই (১৫২৬-১৮৫৮) ভারত তার গণগণ্য সর্বোচ্চ সমৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করে। বোলো শতকে ভারতের আদায়ের আনুমানিক হিসেব বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ২৫.১ শতাংশ। ১৭৫০-এর প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে সত্রটি আকবরের শাসনকালে রাজকোষের গাণিক রাজস্ব জমার পরিমাপের আনুমানিক হিসেব ১৭.৫ মিলিয়ন পাউন্ড (১৮০০ সালে, অর্থাৎ আকবরের দুশো বছর পরে, তামাম স্রেট ইংল্যান্ডের রাজকোষের পরিমাণ ছিল ১৬ মিলিয়ন পাউন্ড)। ১৬০০ সালে মুঘল শাসনের জিডিপি সারা দুনিয়ার জিডিপি ২৪.১ শতাংশ ছিল বলে আনুমানিক 'World Bank for GDP in terms of purchasing power parity in 2008; Projections for 2014-2040 by Mr. Mathew Joseph, Senior Consultant, ICRIER' অর্থাৎ ১৭০০ বছর ধরে 'পৃথিবীর সর্বোচ্চ জিডিপির অধিকারী' থাকার যে-গৌরব তার উজ্জ্বলতম পর্বটি হল মুঘল যুগ, বিশেষত আকবরের শাসনকাল। এই ঐতিহাসিক তথ্যটিকে ভারি গুপতাবে চাপা দিয়ে স্বনামধন্য মূল্যবোধ-বিশেষজ্ঞ শ্রীচক্রবর্তী জিডিপি-নির্দেশক সমস্ত সত্রটুকু বর্ণাঙ্গম নামক হিন্দু সূত্রায়নিকে দিয়ে দিয়েছেন। কী স্বনামধন্য তাঁর সত্যনিষ্ঠ মূল্যবোধ, যে-মূল্যবোধের অভাব ঘটেছে বলে তিনি আমন-বামন জুগের বেথড়ক দাবড়নি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথকে হাইজ্যাক করতে চাইছে কর্ণাড সংঘ

মৈত্রীচ্যুত হয়ে পাঠকরা হুস্তো বলবেন, এই নিয়ে এই দুর্মূল্যের বাজারে এত কাগজ নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন আছে কি? আমি বলব, আছে। কেননা, এ ধরনের লেখা যে 'সমতট'-এর মতো বিদগ্ধ কাগজে ছাপা হচ্ছে, তা থেকে বোঝা যায়, বাঙালি শিক্ষিত মহলের কোথাও একটা মান্যতা তৈরি হয়েছে এই ধরনের অবাস্তব কিন্তু উগ্র দক্ষিণপন্থী ভাবনার। বাঙালি ভ্রমলোকদের চরিত্রে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন আসছে—যার মধ্যে থেকে কোথায় যেন ভেসে আসছে গত শতকের বিশ-তিরিশ দশকের জার্মানির পুত্তিগন্ধ। এখন থেকে সাবধান না হলে পরে আর বিশেষ কিছু করার থাকবে বলে মনে হয় না।

## পশ্চিমবঙ্গের দলিত সমস্যা সমাধান কোন পথে?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

দলিত, পশ্চিমবঙ্গে এই শব্দটির তেতিটা প্রচলন নেই। অজুং অশ্পুষ্ট জল অচল অখণ্ড মুচি, মেথর, কাওরা, বাগদি, স্বাড়ি, ডোম, জেলে, মাঝো নমশূদ্র—জনন জনিত কারণে অপরাধী ঘোষিত এই সব মানুষদের যে বিশাল বৃত্ত কর্ণবাদী হিন্দু ধার্মিক সর্বনিম্ন ধাপে অবস্থিত সেই মানুষেরা নিজেদের জন্য নিজেরা পরিচিতি লাভ এই শব্দটি বেছে নিয়েছেন। দলিত অর্থাৎ যাহার সামাজিক এবং মানবিক সমস্ত অধিকারকে মর্দন, পিস্ট, ধমন দমন করা হয়েছে। ১৯২৮ সালে মহারাষ্ট্রে এক দল ভারতীয় সম্মেলনে নিম্নবর্ণের চেয়েও নিম্নের—'পঞ্চম বর্ণ' মানুষেরা শব্দম এই শব্দটিকে নিজেদের চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেন। যা এখন দালা দেশের সর্বত্র প্রয়োগ হচ্ছে। দলিত অর্থাৎ যাহাকে দমন করা হয়েছে।

বাংলার দলিত সমাজ নিয়ে আগে তেমন একটা হেলসোল ছিল না কারণ। খ্রীঃ সাম্প্রতিক কালে বিবিধ রাজনৈতিক কারণে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়, পক্ষে বা বিপক্ষে, লেখায় বা বক্তৃতায়, সেমিনারে-আলোচনায় এই বিষয়টাকে আনতে দেয়া যাচ্ছে। অবশ্যই এটা একটা ভালো দিক। বহু চেষ্টায় বাংলার দলিত সম্প্রদায় অন্তত নিজেদের এই পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছে, যে আন তাদের অবহেলা বা অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না।

সারা ভারতবর্ষে শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া, রাজনীতি, চাকুরি, ব্যবসা এই সবক্ষেত্রে দলিত মানুষেরা তাদের উপস্থিতি যতটা প্রবল এবং সশক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন—দুর্ভাগ্য এটাই যে বাংলার দলিতরা তা পারেননি। সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বাণ্য। বর্ণবর্ষ তাদের অগ্রগমনের পথে তৈরি করে দিয়েছে শতক বাঁধার ক্ষণিকের পাহাড়। আর যে পাহাড়টা হিমালয়ের উচ্চতাকেও হার মানিয়ে দেয় সেটা দেশভাগ।

দেশভাগ বাংলা এবং বাঙালি জাতির জীবনে একটা চরম অভিশাপ, এই

সত্যটা মেনে নেবার পরেও একথা বলা চলে যে—উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এর ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে—এক দু'জন বাদে আর সবারই সে ক্ষয়ক্ষতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ভরাট হয়ে গেছে। এমনও বহুজনের কথা জানা যায়—দাঙ্গা বা দেশভাগ জনিত কারণে যা ভাঙে হারাতে হয়েছে—এ দেশে এসে পেয়ে গেছে তার একশো হাজার গুণ বেশি। উল্টো দিকের দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ! তারা বঞ্চনা অবহেলা—এককি আশ্রয় পরিচয়ের সংকটে দিশেহারা। কেনকিছু পাবার তো প্রশ্নই নেই। হারাতে হারাতে আর হারাবার মত কিছু অবশিষ্টই নেই।

বিভিন্ন সভা সেমিনারে বক্তাদের দেশভাগ বিষয়ক আলোচনায় বারবার একটা প্রশ্ন উঠে আসে। যাতে বলা হয়, একই কারণে দেশভাগ, একই রকম সমস্যার পড়তে হয়েছে দুই প্রদেশের মানুষকে। অথচ ভারত সরকার পাঞ্জাবের শরণার্থীদের ব্যাপারে যতটা মানবিক হয়েছে, যে তৎপরতায় পুনর্বাসন দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে বাঙালিদের জন্য তার কিছুই করেনি।

এখন যেটা মূল প্রশ্ন সেটা হচ্ছে মানুষ (পড়ুন রাজনৈতা) সমাজ বা রাষ্ট্র কখন আর কেন মানবিক হয়? এমন নয় যে কোন কিছু হঠাৎ হয়ে যায় বা হয় না। সব সংবেদনশীলতা সহমর্মিতা দয়া দায়িত্ব-প্রকাশ-বিকাশ এবং হ্রাস বা লয় এর সিল্ধনে বহুবিধ ভৌগোলিক ধার্মিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক বা আরও অনেক কারণ—কার্য গুণ্ত থাকতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে যা সনাক্ত করণ সম্ভবপর না-ও হতে পারে।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত জিন্নামূল মানুষদের প্রতি সরকারের এত বেশি মানবিক হবার পশ্চাতে যে, যে কারণগুলো জোগালো থাকা দিয়েছে বলে মনে হয় তার একটা পাঞ্জাবিরা যোদ্ধা জাতি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশই এদের দবলে। দেশভাগের ফলে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই হিন্দু এবং শিখ সেনারা এদিকেই এসেছে। মুসলমানরা গেছে ওদিকের ভাগে। যে সব পরিবার ওদিক থেকে এদিকে এসেছে সেই পরিবারের কমপক্ষে একজন কেউ সেনাবাহিনীর সদস্য। পাঞ্জাবের বহু পুরাতন নিরস্ত্র পরিবার থেকে একজন সেনাবাহিনীর চাকরি নেওয়া—সম্মান এবং গর্বের বিষয়। ভয় পাচ্ছিল ভারতের শাসকবর্গ, যদি ওই সব জিন্নামূল পরিবারের সুদৃষ্ট পুনর্বাসন না হয়, সেনা বিদ্রোহ ঘটে যেতে পারে। সদ্য ক্ষমতা হতে পাওয়া—এলোমেলো শাসন ব্যবস্থায় অদক্ষ শাসকদের সে বিদ্রোহ

৭০। ৭১। দেবে। তাই তাদের অতো তৎপরতা-মানবিকতা।

বাঙালি রিকিউজিদের এমন কোন উীতি জাগানিয়া ভূমিকার সাথে কোনকালে। কোন সংস্পর্ক ছিল না। ভেতরে বাঙালিকে সারাদেশ ভিত্তি বাঙালি বলেই জানে। শলাঘনে দড়, গলাবাজিতে বড়—এই তার পরিচয়। সিংহল বিজয়, সুভাষ-মুদীরাম। শোণ। এইসব বীর কাহিনীর চেয়েও বড় বেশি কাপুরুষতার আখ্যান—আঠারো। ৩৩। সেনার ভয়ে কই মাজের কোল মাথা ভাত থালায় ফেলে লক্ষণ সেনের। ৭০৬। ছেড়ে ছুটে পালানো। এই বাঙালিকে বাঙালি বিরোধী আর্থাবর্তের শাসকগণ। ৭০। ৭১। ভয় পাবে কেন?

৭০৬। শাসন সর্বপ্রথম এই বাংলা থেকে শুরু হয়। বাঙালি উচ্চ বর্ণ সমাজ। ৭০৭। একশো-দেড়শো বছর সেই শাসনকে সুশাসন বলেই মনে করত। ৭০৮। সংস্পর্শে সবার আগে আসে—সহযোগিতা প্রদান করে। একটা। ৭০৯। দেশ বুটেন, তখন কতো তার জনসংখ্যা! সেই দেশ এক অর্ধেক পৃথিবী। ৭১০। করে—ওমুত্র অস্ত্রের জোরে এই তথ্যের মধ্যে অনেক অসত্য আছে। ৭১১। এমন অনেক গুণ ছিল যা মানুষকে নত হতে বাধ্য করেছে তাদের সামনে। ৭১২। স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। তাদের যে ক্ষুরধার বুদ্ধি - জায়মান ঘটনাক্রম। ৭১৩। অস্তিম পরিণতি বিষয়ে আগাম অনুমান করে নেবার সহজাত দক্ষতা। ৭১৪। অস্বীকার করতে পারবে। হ্যাঁ, তারা আক্রমক অত্যাচারী ক্রুর নৃশংসও। ৭১৫। কারণ অসংখ্যবার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে খাদ্যবাসীরা বিদ্রোহ করেছে। তবে কয়টি ঘাতক জনহাদও সবার কাছে একইরকম। ৭১৬। না। মারকুটে পুলিশও কেন কেন ডাকাত খুনি মাফিয়াকে প্রেম দেয়, শ্রাদ্দও করে। উপকারী উচ্চবর্ণদেরও ইংরেজ শাসকরা গভীরভাবে বিশ্বাস করত, শাশা দিত।

৭১৭। যেমন চুষকের সঙ্গে সেটে থাকলে চুষক হয়ে যায়, বাঙালি উচ্চবর্ণ। ৭১৮। সংস্পর্শে এসে চিন্তা চেতনা, দূরদৃষ্টি, দূর অভিসন্ধিতে অনেক। ৭১৯। হয়ে গিয়েছিল। আরও করতে পেরেছিল আগাম অনুমানের অসীম। ৭২০।

৭২১। দক্ষতার কারণে তারা মুসলিম লিগ কর্তৃক পাকিস্তান দাবি উপস্থাপনের। ৭২২। বুকে গিয়েছিল আর ভারত অখণ্ড রাখা সম্ভব হবে না। পাকিস্তান

হবেই হবে। তখন থেকে তারা ধীরে ধীরে জমি জায়গার বিধিবাৎ ব্যবস্থা করে ঘরে আসা আরম্ভ করেছিল—এপার বাংলায় - কলকাতায়। ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের অনেক আগেই তারা পেয়ে গিয়েছিল একটা নিরাপদ আশ্রয়। শিক্ষা, আর্থিক সবলতা; রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সংযোগ—এইসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে এদেশের মাটিতে চারিয়ে দিতে সক্ষম হয় প্রতিষ্ঠার শেকড়।

দলিত মানুষদের এই দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। অভাব ছিল শিক্ষা, আর্থিক সক্ষমতা এবং রাজনৈতিক অনুগ্রহের। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চবর্ণের তুলনায় পূর্ববঙ্গের বামুন কায়স্থ বণিকদের মধ্যে ছুরাছুত বর্ণব্যাধ শতক গুণ প্রবল। আর এই একটি মাত্র কারণেই ওই অঞ্চলগুলোয় মুসলমান জনসংখ্যার এত ব্যাপক বৃদ্ধি। শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়—বৌদ্ধ নিলে দেখা যাবে দেশের যেখানে যেখানে সমাজপতি বর্ণ প্রভুদের অত্যাচার ধর্মীয় শোষণ, বর্ণব্যাধ যত তীব্র হয়েছে সেখানেই হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে আশ্রয় নেওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। উদাহরণ হিসাবে হুগলিগড় ঝাড়খন্ড অঞ্চলের সাঁওতাল মুন্ডা গোঁড় মুরিয়া এইসব আদিবাসী মানুষদের কথা বলা যায়। ওখানে কোন বৈদ্য পণ্ডিতদের বাস ছিল না। তাই একজনও এমন আদিবাসী পাওয়া যাবে না যে স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। অনাধুনিক অস্বাস্থ্যকর যোগাযোগ বিহীন জঙ্গল নির্ভর এখানকার জীবন অতি কষ্টের। তাই এইসব অঞ্চলে উচ্চবর্ণ পদার্পণ ঘটেনি এটাই জনজাতি জীবনের পক্ষে স্বস্তিকারক হয়েছে। তবে ইদানিং আদিবাসী অঞ্চলগুলোয় খৃষ্টান ধর্মের কিছু বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে বটে সেটা ধর্মীয় নিপীড়ন জনিত কারণে নয়—অসহনীয় অভাব-অনান্যের পরিণাম। খৃষ্টান মিশনারি কবিধ “সেবা-সহায়তা” দিয়ে তাদের মন জয় করে নিচ্ছে।

তাই একথা বলায় কোন বাধা নেই যে এদেশে ইসলাম ধর্ম বিস্তার বিকাশে ইমাম মৌলবীদের প্রয়াশের চেয়ে বর্ণপ্রভু সমাজপতিদের অবদান (পড়ুন - অত্যাচার) অনেক বেশি।

বলা হয় ইসলাম ধর্ম বিশ্বমীদের প্রতি নির্মম। মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি অসহিষ্ণু-বৈরি ভাবাপন্ন। তারা শান্তিপূর্ণ সহনস্থানে বিশ্বাসী নয়। এবার বিপরিত দিক থেকে একটু অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা যাক। একজন মানুষ যে, এই সেদিনও হিন্দু ছিল। হতে পারে কোচ্ছার - হতে পারে কোন ভুলে মুসলমানের

মম হন। এঁকে ‘জাত বৃহৎ’ মুসলমান হয়ে গেছে (লাগন ফকির)। এই অপরাধে যে ধর্মীয় গুণের মানুষ তাকে যৈয়োকুকুরের মত ঘৃণা করে, উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালে খাণ্ডা খণ্ড ছোঁয়, ছোঁয়া লেগে গেলে চান করে, তাকে কী কেউ কোনভাবে দণ্ড করতে পারে? ভালোবাসতে পারে? কেউ কী রাজি হবে সহনস্থানে?

এই প্রশ্ন, যারা হয়, আছে, তেমন কিছু বর্ণ-সম্প্রদায় আছে বইকি, যারা মনে করে রাষ্ট্রাধীন পানোদক পান করলে অশেষ পুণ্য, ব্রাহ্মণকে ভোজন আর ভোজন দক্ষিণা দিলে অক্ষয় স্বর্গবাস। ওরা যে অবহেলা অপমান ঘৃণা প্রদান করে তা শামাধ নাযা প্রাপ্য। বুঝতে হবে তাদের চেতনার উপর গভীরের চামড়া জড়ানো আছে। মুসলমানদের যদি সে চামড়া না থাকে সেটা তাদের দেখ বলে মানাটা খাওয়া, অযৌক্তিক। হিন্দুদের প্রধান শর্ত তিনটি একে মানতেই হবে। (১) মাতাল পেশাখামা চোর ফাই হোক তবু উপবীতধারী ব্রাহ্মণ-সর্বশ্রেণে শ্রেষ্ঠ। (২) জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য, যে কোন শাখায় বতই কৃতিত্ব থাক, গোত্রকে মা বলে ডাকা। (৩) অবোধ-দুর্বোধ্য আজ্ঞাবাজে ফাই লেখা থাক, বেদকে মান্য করো। গমোনাচনার উর্কের সত্যরূপে স্বীকার করো।

পাণ্ডার কোন মতবাদ-দর্শনই প্রমের উর্ধ্ব নয়, কোন ‘সত্যই’ নয় চির সত্য। ধর্ম কাল পরে ভেদে সত্যও পরিবর্তিত হয়। রাজার সত্য প্রজার সত্য, ক্রীতদাস খাণ্ডা মালিকের সত্য, ডাকাত আর গৃহস্থারীর সত্য, আমেরিকান আর ব্রেড-গেম্যানদের সত্য, দস্তাকরণের আদিবাসী আর দিল্লির শাসকদের সত্য—তার রঙ রূপ চাক্ষু ভিন্ন হতে বাধ্য। তাই ‘আমাদের’ সত্য ‘ওরা’ সহ্য করতে যদি না পারে সে শাসকের তার আছে।

পূর্ববঙ্গের দলিত আর পশ্চিমবঙ্গের দলিত, এই দুই পক্ষের ভাষা-চিন্তায় বিস্তার পার্থক্য আছে। পশ্চিমবঙ্গের দলিত অভাব অভিযোগ বন্ধনা বর্ণ প্রভুদের অপমান-অত্যাচার সহ্য করে। সে সবেক পরেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত দলিতদের খাণ্ডা খণ্ড খেঁচা বড় সমস্যা সেটা আশ্রয় পরিচয়-অস্তিত্ব আর নাগরিকত্বের সংকট। ওই দেশ তাদের সহ্য করেনি, এই দেশ তাদের স্বীকার করে না, রিকিউজি, উদ্ভাস্ত, শতাপাণী বহিরাগত, বাঙাল এমন ধরনের শব্দ বন্ধনে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে আত্মীয় সমাজ জীবন থেকে। দিল্লির তো বটেই বঙ্গের কোন শাসক দলই এই সমস্যা সমাধানে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সে তো করেনি উল্টে এক সময়

যে বাড়ি নিজেই দেশ ত্যাগ করে এসেছেন, এ দেশের রাজনীতিতে অংশ নিয়ে পঁচাত্তর শাসক দলের শীর্ষে য়ে—সুন্দরবনের এক ছোট্ট দ্বীপে মজিচক্কিত আশ্রয় নেওয়া - অসহায় মানুষদের উপর নামিয়ে এনেছিল - শতাব্দী সর্বচেষ্টে নৃশংস-কর্বরোচিত হ। (পড়ুন—জগদীশ মণ্ডলের বই, নৈশকো অন্তরালে)।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত দলিত মধ্যে নরশেত্র মানুষদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি—এদের জীবনে যে সংনিষ্ঠা, অমানবিক হিন্দু ধর্মের ক্ষমতাবাহী বর্ণ প্রভু রাজনৈতাদের অমসহযোগকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেবার গুণও একটা প্রশ্ন মনে জাগে। কী তাদের দোষ? আমাদের কী কোন দোষ-কোন ভুল-দুর্দৃষ্টির অভাব? না?

একজন বিশ্ব প্রসিদ্ধ দার্শনিক বলেছোয়ার চালালে গলা কেটে যায়। এতে শুঁ হালোয়ার নয়, গলারও দোষ কারণ সে কেটে যায়। প্রশ্ন তো এটাই - কেউ কেন? কেন গলা এত উঁচু করে না যে তলোয়ার নাগাল না পায়। একে যার - ভেঙে যায়! কেউকে বারণ করেনি। তবু নিজেই সেই পর্বা উন্নত কেন করে না?

পশ্চিম পাকিস্তানের রিকিউজিদের সুাসন হয়েছে, তার একটা কারণ তো আছে বলেছি, অন্য কারণ যেটা তা-তার দেশ ভাঙ্গের সাথে সাথে প্রায় সবাই একযোগে এনেছে চলে আছে বিশাল সংখ্যক মানুষকে সেখান সরকার অরক্ষিত হয়ে পড়ে। আশঙ্কা ব কেন মুহুর্তে ঘটে যেতে পারে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফলে দ্রুততারউদ্যোগ নেয় লোক বিনিময়ের। এদেশের ইসলামানরা চলে যেতে থাকে নে। তারা দখল নেয় শিব আর হিন্দুদের ফেলে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তি। আর হিন্দুদের মধ্যে বিলি কটন করা হয় ইসলামানদের এদেশে ফেলে যাও বাড়ি জমি জিরেত। মসৃণভাবে নিষ্পত্তি ছাে রিকিউজি পুনর্বাসন সমস্যার

বাংলায় ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। পূর্ব বাবিসংবাদী দলিত নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল জাতিগত কারণেই সং ছিলেন ছিলেন, চতুর ছিলেন না। নরশেত্রের যে বৈশিষ্ট্য মানুষকে চট কসে করে বসে। ভুলে যায়, উনি মুসলীম লীগ নেতাদের ভরসা করে ফেলে। ভেবে ছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র

পশ্চিমবঙ্গের দলিত সমস্যা সমাধান কোন পথে?

খামত চলে গ্রাম্যবাদদের নিষ্পেশনে জরুরী অনুরূত অপমানিত নিয়বর্ণ আর মুসলমানরা মুক্তির স্থান পাবে। বড় ভাই-ছোট ভাইয়ের মত মিলেমিশে থাকবে। মোড়ক বস্ত্রের মুসলমানদের শিরা উপশিরায় নিম্বর্ক রক্ত বহমান-অন্তত কেউ কারো গলা কটিবে না। তাই তিনি নিম্বর্ক মানুষদের দেশ ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। তার কথার ভরসা পেয়ে নমঃ পৌদ জেলে মাগো—এই সব নিম্বর্ক হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তানে।

অজ কিস্তিনি পরে ওনার সে ভুল ভেঙে যায়। বাঙালি মুসলমানদের উনি চিনতেন, জানতেন না পাক সরকারের নাপাক (অপবিত্র) নীতি সিদ্ধান্তের কথা। নাপাক সাম্প্রদায়িকতার আওনে জল ঢালার পরিবর্তে পেট্রল ঢালার কাজটা মাগোপনে সকারিত করতে থাকে।

শে সময় অনেক মুসলমান বিহারের দাঙ্গার পরে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। বাঙালিদের মত শীতল রক্ত তাদের নয়। রাজশক্তির প্রশ্নে তারা কিশুদের একে ত্রাস সকার এবং বিতাড়ন উদ্দেশ্যে ছোট ছোট দাঙ্গা, খুন ডাকাতি নারী বর্ষণ গবাদি পণ্ড চুরি, ক্ষেতের ফসল কেটে নেওয়ার মত অপরাধ চালাতে লক্ষ করেছিল। তারই প্রতিবাদ করে যোগেন মণ্ডল পাকিস্তানী শাসকদের চক্ষুশূল করে গেলেন। প্রশস্ত্রনীর আশঙ্কায় পাকিস্তান থেকে পলায়ন করে ভারতে আশ্রয় নালেন তিনি।

পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন জননেতার সংগ্রাম সমীক্ষা করলে দেখা যাবে শাসকদের আরোপ-অরক্ষণ যত প্রবল হোক কেউ দেশ ছেড়ে পালাননি। আত্মগোপন করে জনগণের মধ্যে থেকে জনগণকে সংগঠিত করে লড়াই চালিয়ে গেছেন এবং জয়ী হয়েছেন। মাও-সে-তুং, শ্বে-চি-মিন, কিনেল কাস্ত্রো সবার এই এক ঈর্ষাশ্রু। আমাদের বাঙালিদের বেলা ঠিক এর উল্টো—বিপদ দেখলে নেতা পালায় সবার আগে। সেই যে লক্ষ্মণ সেন পালিয়েছিল সেই পলায়ন বাঙালির একে মিশে গেছে। এম. এন. রায়, রাসবিহারী বোস, সুভাষ, কেউ দেশের ক্ষণের উপর আস্থা রাখতে পারেনি। সব পালিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে। নেতা যোগেন মণ্ডলও সেই অসুখে আক্রান্ত। তাই ঘুরে দাঁড়ালেন না, লড়াইয়ের ডাক দিলেন না। পরে আমরা দেখতে পাব বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানও মুক্তি যুদ্ধের ডাক দিয়ে মানুষকে লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়ে দিয়ে নিজে ভারতে পালালেন। বাঙালি

ঐতিহ্য বজায় রাখলেন। যা কিছু বাণী বহুত্ব উপদেশ সব দিলেন ভারতে বসে।

এরপর তো পলায়নের হিড়িক পড়ে গেল। নিম্নবর্ণ নমঃশূন্য মানুষ তো কটেই হারা মানুষ নয় দেব-দেবতার গুপ্তি তারাও পালালেন। একজন স্বয়ং বিকুল অবতার, তার বউ লক্ষ্মী, ছেলে শিব, যারা স্বর্গের সুখ সাম্রাজ্য বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন ত্রৈলোক্য নমঃশূন্যের মুক্তি দেবার বাসনায়। সেই সব ঠাকুর দেবতার পুত্র-পরিজন তারাও সাহস পেল না পূর্ব পুরুষের স্মৃতি বিজরিত ঠাকুর ধাম আগলে নিজ ভূমে পড়ে থাকতে। যা পলায়তি সাঃ জীবতি স্মরণ করে চলে এলেন এপার বাংলায়।

তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। বাংলায় কিছু প্রবাদ আছে হাতুড়ি মারো লোহা গরম থাকতে। আম কুড়াতে হয় ঝড়ের রাতে। লোহা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে হাতুড়ি মেতে আর বাকানো যাবে না, বাড় না হলে বা খেমে গেলে গাছ তলায় গিয়ে লাভ হবে না। আম পাওয়া মুশকিল হবে। তবে যখন তারা যাত্রা শুরু করেছিল যদি সবাই একসাথে এসে ভারত সরকারকে চেপে ধরতে পারত একটি সমাধান অবশ্যই হতো। আসেনি তো! দু হাজার পাঁচ হাজার খেপে খেপে তারা এসেছে এবং আসছে। সরকারি গোয়েন্দা দপ্তরের হিসাবে এখনও প্রতি রাতে চারশো মত পরিবার লুকিয়ে বর্ডার পার হয়ে এসে মিশে যাচ্ছে এপারের ভিড়ে। শোনা যায় লুকিয়ে বর্ডার পার হয়ে এসে মিশে যাচ্ছে এপারের ভিড়ে। শোনা যায় অন্য তো বাদ, শুধু নাকি এসেছে আসা নমঃশূন্য মানুষের সংখ্যা তিন কোটি। এক কোটি এখনও ওপার বাংলায় রয়ে গেছে। পৃথিবীর ১৮৪টি দেশের এমন এমন দেশ আছে যেদেশের জনসংখ্যা চার কোটি নয়। যদি আমরা চার কোটি নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ একসাথে আওয়াজ দিতে পারতাম, সে হাজারের সামনে সব টলে যেতো। বাধ্য হতো আমাদেরও যোগ্য সম্মান, প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে। খেপে খেপে অল্প অল্প মানুষ আসায় তাদের দাবি অধীকার করতে, ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে কর্বাদী শাসক শ্রেণির পক্ষে সহজ হয়েছে। লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস পুলিশি বুটের দাপটের কাছে পরাজিত হতে হয়েছে তাদের।

আমার বাবা এসেছিলেন ১৯৫৩ সালে। আমাদের স্থান হয়েছিল বাকুড়ার শিরোমনিপুর ক্যাম্প। আমাদের কাছে দণ্ডকারণ্যে যাবার 'ডাক' এসেছিল। বাবা সে সময় দণ্ডকারণ্য যেতে ভয় পেয়েছিলেন। তাই সব রকম সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়ে যায় আমাদের। নাম কাটা যায় ক্যাম্প থেকে। আমরা হয়ে যাই 'উইল আউট

গার্মাল' অর্থাৎ যাদের দায় আর সরকার নেবে না। তখন যেখানে বত রিফিউজি ক্যাম্প ছিল, যারাই দণ্ডকারণ্যে যেতে অধীকার করেছে সবাই হয়ে গেছে আমাদের মতো উটপাউট। প্রমানপত্র বিহীন এক নেই দেশের নাগরিক। ক্যাম্প থেকে চলে গেলে তারা তখন বেঁচে থাকার তাড়নার স্থান নিয়েছে কোন ফুটপাথে, রেল স্টেশনে, রেল লাইনের ধারে বা কোন খাল পাড়ে, খুপড়ির মধ্যে। যাদের রেশন কার্ড ভোটার আই কার্ড, আঁখার কার্ড কোন কিছু নেই। এই যে চরম অপমান দুঃখ দুর্গা ভরা অনাহারি জীবন এর জন্য কাকে দায়ী করব? কে তাদের ফেলে দিল পৃথিবীপাক নরক যন্ত্রণার মধ্যে?

দেশভাগ! বলা হয়ে থাকে যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে শাসনাত্মক বিষয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে ওটা না করে কোন উপায় ছিল না। এই বক্তব্যকে যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এটাও সত্যি যে দেশ ভাগের অন্ত্রে এক সাথে অনেক কষ্ট অসং অভিপ্রায় সফল হয়েছিল একদল দূর্ব গোষ্ঠীর। প্রথমত, বাংলা এবং বাঙ্গালি চিরদিন আত্মবর্ষ বিগ্রেবী। তারা যা বলে, যা করে বাঙ্গালি চলেছে স্বতন্ত্র তার বিপরীতে। গো কলরে রাম মণিমা পুরুষোত্তম রূপে পূজিত হয় বাঙ্গালি সেই রামের মর্মান্বহনী করতে জুড়ে দিয়েছে ছাগলের সাথে, রাম ছাগল। রাম পাঠা, রাম থাকে এই সূবের পরেও খেমে থাকেন, ছি ছি-র প্রতিশব্দ হিসাবে বেছে নিয়েছে রাম। রাম।

এমন উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। তারা যখন মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধিকে দেখতে উত্তীর্ণ করে পাশে পিছনে জমা হয়েছে, বাঙ্গালি হেঁটেছে সূভাব বোসের পিছনে। যদি দেশটা ভাগ করা না হতো, কমপক্ষে একশো কুড়িটা লোকসভা সিট থাকত তাদের কন্ডায়। সেই জোরে দিল্লির দখল নিত বাঙ্গালিরা। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর প্রায় সব ক'টা আসনে বসত বাঙ্গালিরা।

দেশভাগ, এই দৃষ্টান্ত থেকে চিরন্তনে তাদের মুক্তি দিয়েছে। আরও একটা দৃষ্টান্ত, অনেক বড় চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে কর্বাদার পৃষ্ঠপোষকরা। যে দলে গান্ধী বিহারি মারাঠি তামিল তেলুগু সবাই পড়ে। যারা চায়না দেশে দলিতদের দণ্ডন প্রেক।

বাংলায় সর্ব প্রথম দলিত চেতনার উন্মেষ ঘটে নমঃশূন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে। শ্যাম তে হরিচাঁদ এবং তার পুত্র গুরুচাঁদ দুজনে এই সম্প্রদায়ের সচেতনতা

বৃত্তিতে আজীবন প্রয়াস করেছেন। গুরুচাঁদ নমঃশূদ্রদের শিক্ষা বিস্তারে বহু স্কুলের স্থাপন করেন। শিষ্যদের প্রতি তার কঠোর নির্দেশ ছিল যে কোনভাবে হোক সন্তানকে শিক্ষিত করো।

এরপরে যাকে নমঃশূদ্র সমাজের সর্বমান্য নেতা হিসাবে জানা যায় তিনি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। যার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের দলিত নেতা ভীমরাও রামজি আশ্বেদকরের গভীর যোগাযোগ ছিল। ভারতের সংবিধান সভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আশ্বেদকর যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের আমন্ত্রণে পূর্ববঙ্গের একটি আসন থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বিজয়ী হন। উল্লেখ থাকে যে পূর্বে তিনি তার নিজের প্রদেশ থেকে নির্বাচনে কংগ্রেসী ষড়যন্ত্রে পরাজিত হয়েছিলেন। তখন বড় আত্মদে ব্রহ্মত ভাই প্যাটেল বলেছিলেন, সংবিধান সভাসে আনেকে লিয়ে দরবাঞ্জা তো করা আশ্বেদকরকে লিয়ে হামনে ষড়যন্ত্র তবু কনধু কর দিয়া। দলিত নেতা যোগেন্দ্র মণ্ডল বুঝেছিলেন—ওই সভায় আশ্বেদকরের যাওয়া খুব জরুরি। সে যা পারবে তা আর কেউ পারবে না। তাই নিজে ইস্তফা দিয়ে সেই আসনে পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে আশ্বেদকরকে জয়ী করেন। সেটা যে দলিত শ্রেণির পক্ষে কতখানি সঠিক কাজ হয়েছে সে তো পরে সারা পৃথিবী দেখেছে। সংবিধানে যে কটি রক্ষা কবচ দলিত আশ্বেদকর না থাকলে কেউ তা দলিতদের জন্য রাখত না।

যে আশ্বেদকরকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যে কোন মূল্যে খামিয়ে দিতে চেয়েছিল, নমঃশূদ্র মানুষরা তাদের সে চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চোখে নমঃশূদ্র সমাজ শত্রু হয়ে গিয়েছিল।

নমঃশূদ্রদের উপর আগে থেকেও তাদের রাগ ছিল। এই জাতি বিদেশী বস্ত্র বর্জন বা স্বাধীনতার যে আন্দোলন চলেছিল তাতে অংশগ্রহণ করেনি। কংগ্রেসী নেতারা বার বার নমঃ সমাজের মাথাধার কাছে আবেদন নিকেন করেছে। সে আবেদনের প্রেক্ষিতে নমঃ নেতাদের জবাব ছিল আমাদের মানুষেরা বিদেশি তো বস্ত্রদূর স্বদেশী বস্ত্রও একটা গামছার মাপের বেশি কিনতে পারে না - পড়তে পারে না এত দরিদ্র। তাহলে সে কী বর্জন করবে? আর 'স্বাধীনতা' বিষয়ে তাদের বক্তব্য ছিল ইংরেজ এসেছে দুশো বছর, আমরা তো তার বহু আগে হাজার বছর ধরে বর্ষপ্রভুদের গোলাম হয়ে আছি। ইংরেজ চলে যাবে, ওরা স্বাধীন হবে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা দেবে কে? আগে সেই স্বাধীনতা দেওয়া হোক।

দেখা যায় যে শুধু বাংলার দলিত মানুষ নয়, সারা ভারতের সব দলিত সম্প্রদায়ের মনোভাব ছিল একই রকম। আশ্বেদকর বলেছেন, স্বরাজ নয়, সুরাজ চাই। তাদের জীবনে বিদেশি শাসনের চেয়ে দেশি কর্তাদের বীভৎস পেষণ ছিল শতগুণে বাহিরে। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে বিদ্যা ভবন প্রবেশ। দলিত জীবনকে দুসেহ করে তোলার লক্ষ্যে হাজার বছরের যে অর্থনৈতিক অধ্যবোধ (শাস্ত্রে নির্দেশ আছে কোন শূদ্র ধন সঞ্চয় করতে পারবে না। যদি তা করে বাস্তুশ্রম কেড়ে নিতে পারবে) তা শিথিল হয়েছে। দলিতরা এখন সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে পারছে। এইসব কারণে ইংরেজ শাসকরা তাদের চোখে অমান্য শাস্যন যতটাই ব্রাহ্মণ্যবাদী-মুন্ডবাদীরা। তাই তারা ইংরেজ শাসকদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দেবার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে উঠতে পারেনি।

১৯৪৭-এ কংগ্রেস নেতাদের চোখে এটা অপরাধ। মুসলমান নেতারা যেমন মনে করত ইংরেজ চলে যাবার পরে শাসন ক্ষমতা হিন্দুদের কৃষিপুত হবে। মুসলমানরা পশ্চিম হয়ে থাকতে বাধ্য হবে হিন্দুদের। দলিতরাও তেমনই মনে করত সব ক্ষমতা থাকবে উচ্চবর্ণদের হাতে। আর লিপ্ত হবে দলিতের মানবিক অধিকার। ১৯৪৭-এ নেতারা মনে করত মুসলমান এবং দলিত নেতারা সব ইংরেজের দালাল। পা চালা কুকুর। এই গালাগালি আশ্বেদকরকেও সহ্য করতে হয়েছে।

গুরুচাঁদ, গুরুচাঁদ, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং আশ্বেদকর—এদের প্রেরণা - পথ নির্দেশে খুলনা-যশোর-বরিশাল-ফরিদপুর চার জেলা জুড়ে নমঃশূদ্র মানুষদের যে আশ্রয় গুরু হয়েছিল, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিস্পর্ধীরাপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিল, বিবেকানন্দ যে শূদ্র জাগরণের আশঙ্কা করেছিলেন সেটা সত্যে পরিণত হবার সম্ভাবনা দৃষ্টি গোচরে আসছিল। দেশভাগ সেই আশঙ্কা খামিয়ে মনুবাদীদের দাঁক দিতে পেরেছে। একটা সংগঠিত শক্তিশালী জনগোষ্ঠীকে জিহ্মিত করে দেখা গেছে। পুনর্বাসনের নামে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে আশ্চর্য্যজনক, মনোহর, মানা, নৈনীতাল আরও কত জায়গায়।

খামানে এলার কথা একটাই যদি জাতিগত কারণে দেশভাগ হয়ে থাকে তবে গুরুচাঁদ, ফরিদপুর, খুলনা হিন্দু সংখ্যাধিক্য এই জেলাগুলো তো ভারতে থাকার কথা। এবং মালদা মুর্শিদাবাদ নদীয়া মুসলমান অধ্যুষিত এই জেলাগুলো যাবার

কথা পূর্ব পাকিস্তানে। হল না কেন? কেন উন্টোটা হল? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে দলিত বিদ্যেব্দের গর্ভে। তেমন হলে তো নমঃশূদ্রদের শক্তিকে এমন চুকুরো চুকুরো করে ফেলা অসম্ভব হতো না।

দলিত বিদ্যেব্দের আর একটা বড় নমুনা জ্বরদখল কলোনিগুলো। একই কারণে দেশভাগ একইভাবে দেশ ত্যাগ। অথচ নিম্নবর্ণ মানুষদের জন্য সুন্দরবনের যোগাযোগ বিহীন অস্বাস্থ্যকর, অনুন্নত স্থাপ মসিচকীপির নাম মাত্র মূল্যের জমিতে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়নি। আর কলকাতা শহরের মধ্যে বা সন্নিকটে সর্ব সুবিধা যুক্ত বহুমূল্য জমিতে স্বয়ং সরকারি কর্তা ব্যক্তিরা ১৪৯টা জ্বরদখল কলোনি পত্তনের অনুমোদন দিয়েছে বামুন, কায়ত, বন্দি বাবুদের। ওইসব কলোনি স্থাপনের পূর্ব শর্ত ছিল এটাই 'ভদ্রলোকদের জন্য'। ওইসব কলোনির একটাতেও নিম্নবর্ণ 'জ্যেটলোক'-দের স্থান হয়নি।

এখন প্রশ্ন একটাই, ব্রাহ্মণ্যবাদী-মহাশূদ্রদের (মন্-খিনি মনুসংহিতা নামক গ্রন্থে শূদ্রদের দমন উদ্দেশ্যে কয় বিধান দিয়ে গেছেন) এই প্রবল বিদ্যেব্দের বিরুদ্ধে, দলন দমন বন্ধনের বিরুদ্ধে করণীয় কর্তব্য কী? এক বন্ধু বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে নাকি প্রায় বাট লক্ষ নমঃশূদ্র রয়েছে। যার একটা বড় অংশ গুরুত্বপূর্ণ ঠাকুরের কল্যাণে যেক বা যে কোন কারণে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে শিক্ষিত। বাবা সাহেব অধ্যক্ষদের দ্বারা সংরক্ষণের মাধ্যমে চাকরি পেয়ে শ্রেক বা অন্য কোন ভাবে আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল। অনেক কিছু বা সবকিছু পেয়ে যাবার পরেও যে অপ্রাপ্তি এদের পীড়া দেয় সেটা হচ্ছে সামাজিক সম্মান। যতই দক্ষযোগ্য ক্ষমতাবান হোন-বামুন, কায়ত, বন্দিরা তাদের 'সিভিলাইজড কাস্ট' বলে উপহাস করে। ঘৃণার চোখে দেখে। তাদের কাছ থেকে সমমর্যাদা আদায় করে নেবার পথ কোনটা?

এমনিতে একটু গভীরভাবে দেখলে এটা একান্তই শিক্ষিত জনের সমস্যা। মাত্র দুটো বড় সমস্যা নিয়ে এরা বিব্রত—একটা শুই মর্যাদা, আর একটা চাকরিতে সংরক্ষণ। বলে তারা সংরক্ষিত বহু আসনে নানা অজুহাতে চাকরি পাবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কোটা পূরণ করা হচ্ছে না। তবে দেশের শক্তকরা নকই বা তার চেয়েও বেশি অংশের অশিক্ষিত, নুন আনতে পাওয়া কুরানো দলিত মানুষদের এটা নিয়ে খুব মাথা ব্যথা নেই। সে মেনে নিয়েছে অপমান-অসম্মান এটা তার নিয়তি, পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ফল। বাবু শ্রমির লোকরা ওটা করবেই। সয়ে

মানুষা হওয়া কোন উপায় নেই। আর সংরক্ষণ? একশতাংশ সংরক্ষণ থাকলেও আরও কোন লাভ নেই, অন্যরা তো পড়াশুনা জানে না।

গুরুত্বপূর্ণ ঠাকুর বা বাবা সাহেব দু'জনেই ভেবেছিলেন আমাদের মানুষজন যদি শিক্ষিত হয়, চাকরি পেয়ে আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হয়ে ওঠে, এর পরে তারা সমাজ উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হবে। নীচে থাকা নিম্নের মানুষদের উপরে তুলে আনাগোণ উদ্যোগ নেবে। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক আশেদকর তৈরি হবে।

পেটা ওয়ানি। যে উপরে উঠেছে অন্যরকম চেঁচা চালিয়ে গেছে আরও উপরে ওঠা। নীচ কোটির মালিক হয়েও শাস্তি নেই তার, পক্ষাঘাত কোটি কেন নেই সেই শোক কাঁত। তার আর অন্যদিকে তাকবার কুরসত নেই। নিম্নবর্ণের দুই দিন খানা দিন বাতারা মানুষ—তাদের যন্ত্রণা-কষ্ট ওদের মনে কোন দাগ কাটে না। নিম্নবর্ণ, নান্দ্যাম, নোনাডাঙ্গার দলিতদের কথা বুকে বাজে না।

শাসন-প্রশাসনকারি কিংবদন্তীদের অনেকের মুখে শোনা যায় যে, বাংলায় কোন জাতিগত বর্ণবাদ এসব নেই। ইউ.পি., বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাত এদের মত অত লক্ষ্য নাহে না থাকলেও বর্ণবাদ এখানেও আছে। এক লাখের চেয়ে নেই, আছে দশ লাখ চাকর করেছে। যাকে আড়াল করে রাখার কয় আয়োজন। অন্যপ্রদেশে যেখানে উচ্চজাত আর নিচুজাত এইভাবে বলার প্রথা বঙ্গে তাকে একটু পালিশ দিয়ে ফলা হয় ভদ্রলোক ও জ্যেটলোক। ভদ্রলোক মানে—যারা ভালো ভালো পড়ে, ভালো বাড়িতে থাকে, দামি গাড়িতে চড়ে, ফটাক্ট ইয়ারজি বলে। বৌদ্ধ মনে দেখা যাবে এরা সবই বামুন, কায়ত, বন্দি। আর জ্যেটলোক মানে—খাল প্যাতে, বাগতে থাকে, ময়লা জামা কাপড়। জন মজুর খাটে বা রিকশা ফিকশা চালান। কোনদিন খেতে পায়, কোনদিন পায় না। শিক্ষা কলতে কেউ নাম সই করতে পারে, কেউ পারে না। জাতি পরিচয়ের সন্ধান নিলে জানা যাবে নমঃশূদ্র না হয় পৌত্তল্যকৃত্রিয়। কাওয়া না হয় বাগদি।

এরা খাট কয়েক বছর চাকরি, ব্যবসা, রাজনীতি নানাবিধ উপায়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে সাকলস্বী হতে পেয়ে কিছু নিম্নবর্ণের মানুষ বস্তি থেকে উঠে গিয়ে কলকাতা-মুম্বাই-এলাকায় বাস করে ভদ্রলোক হতে সুযোগ পেয়েছে। বি-চাকর-বাগদি-দাবোয়ান-জাইতার, মালি-বামুন-কায়ত-বন্দিরা এদের সাথে যে ব্যবহার করা-এলাক সেটা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

বাল্লি বর্ণবাদী সমাজে লম্বালাসি যদি একটা রেখা টানা হয়। একদিকে যদি বামুন, কায়েত, বনি এইসব উঁচু জাত থাকে আর একদিকে থাকবে নমঃ পৌদ, কাওরা, বাগদি—এইসব ছোট জাত। একে আবার আড়াআড়ি রেখা টেনে বিভাজিত করলে উপরের দিকে ছোট জাতের যে অংশ তারা ভদ্রলোক। আর উঁচু জাতের যে অংশ নীচে থাকবে এরাও গণ্য হবে ওই ছোটলোক বলে।

এটা আলাদা কথা যে—যদি কখনও উঁচু জাতির নীচু লোকটি জাতি পরিচয় প্রকাশ করার অবকাশ পায় তেমন কোন কার্য কারণ ঘটে সেটা তার স্বজাতি-বামুন-কায়েত-বন্দিদের মনোযোগ-নয়া, দরদ, দৃষ্টি আকর্ষণের সহায়ক হবে। যেটা কোন ছোট জাত, ছোট লোকের হবে না।

সে বাই হোক, ওই যে নীচু জাতের পাড়া থেকে উঁচু জাতের এলাকায় চলে যাওয়া দুঃশ জন, আর উঁচু জাত থেকে পিছলে বসিতে পৌছে যাওয়া দু-একজন সব মিলিয়ে যে গড়ে ওঠা সমাজ কাঠামো এটা দেখিয়েই ওই বিষয়জন বলে থাকেন দ্যাখো, সব কেমন মিলেমিশে আছে। কোন ভেদভাব নেই।

মুন্সী প্রেমচাঁদের একটা গল্পে দেখা যায়—এক স্থলের চারটে বাচ্চা এক সাপে খেলা করে। একটা বাচ্চা ছোট জাত তবু তাকে কেউ খুশা করে না। কিন্তু যে খেলটি চলছে সেটা কী? ঘোড়া ঘোড়া! আর প্রতিবারই ঘোড়া হতে হচ্ছে ছোট জাতের বাচ্চাকে। উঁচু জাতের বাচ্চারা একের পর এক তার নিষ্ঠে চাপছে। সে তাদের বস্ত্রে মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। কখনও এমন ঘটবে না, তাকেও কেউ নিষ্ঠে তুলবে।

আমি একটা স্থলকে জানি যেখানে দশ বারো জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী কাজ করে। এর মধ্যে চারজন উচ্চকর্ষ, তিনজন কায়েত, একজন বামুন। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর সাধারণত নৈহিক শ্রমের কাজ করতে হয়। ওই চার জনের দু'জন যতটুকু কাজ করে, অন্যদের তুলনায় দশ ভাগেরও কম। আর দু'জন হাজারি বাতায় সই ছাড়া কুটোটি নাড়ে না। একজন তো এরমধ্যে এমন যে আঠারো কুড়ি বছর সর্বমোট আঠারো কুড়ি মাসের বেশি হাজারি পর্বন্ত দেয়নি। বেতন পুরো পায় কি পায় না, জানা নেই।

এরা সব ভদ্র পাড়ায় ভালো বাড়িতে থাকে। বাবা, দাদা, ভাই বা স্বামী বড় বড় চাকরি করে। এই চাকরি এদের দরকার ছিল না। তবু সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে

এই পথে গিয়ে রেখেছে। এদের এই সব কাজ করতে মনের সায় পায় না। শ্রমানে গাশে। দামি জামা প্যান্ট পড়ে আসে। শানিকল্প বসে থেকে চলে যায়। কেউ তাদের কিছু বলে না। আগে ওরা ভদ্র ঘরের। এইসব কাজ করতে তাদের কী বলা যায়। বর্ণবাদ এই ভাবে আজও আছে।

শ্রমিক দলিতরা এই পার্থক্য বিলোপ করতে চায়। উদ্যোগটা অতীব মহৎ কিন্তু এটা কয়েক মাত্র শিক্ষিত লোকের দু-একটা সভা সমিতি, দু-চারটে পত্রিকার লেখালেখি এদিয়ে কী হাজার-বছরের প্রাচীরটা গুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব!

এলা গা ওরা অর্থাৎ উচ্চকর্ষ সংখ্যার হিসাবে মাত্র পনের জন। আমরা অর্থাৎ নিম্নকর্ষ শ্রমিকরা পঁচাত্তি। আমরা ঐক্যবদ্ধ হলে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থা চুরমার করে দিতে পারবো?

এবার এই পঁচাত্তির গোলমেলে হিসাবটা একটু নাড়াচাড়া করা যাক। পঁচাত্তির মধ্যে থেকে মুসলমানদের আলাদা করে দেওয়া হোক। দেখা গেছে দলিত মালমুদার মধ্যে মুসলমান বিবেচ উচ্চকর্ষদের চেয়েও বেশি। পূর্ব পাকিস্তানের যে কটা দাঙ্গা কাঁজিয়ার কথা শুনেছি, ভারতবর্ষের যে কটা দাঙ্গা-কাঁজিয়ার কথা শুনেছি মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই দল। তারাই লড়েছে, তারাই মরেছে। এই দু'টা মাছলে উচ্চকর্ষ অনুবিক্ষল যন্ত্রে বুঁজে পেতে হবে। এই দুই পক্ষের মধ্যে এখনও এত গভীর বিভ্রমণ যে এক মঞ্চে এনে এক দিশায় চালিত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

এবার যে অংশটি পড়ে রইল তা থেকে আদিবাসীদেরও সরিয়ে দেওয়া হোক। এ সমা অঞ্চলে তাদের বাস - ব্রাহ্মণ্যবাদ অতটা খারাপ বসাতে পারেনি যতটা গায়েয়েছে পুঁজিবাদ। যে পুঁজিবাদীদের পিছনে অত্যাধুনিক মারগাস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে স্বয়ং রাষ্ট্র। পুঁজিবাদীদের যেমন কোন জ্ঞাত হয় না, রাষ্ট্র যন্ত্রকে যারাই দালান রাখছে তাদেরও কোন জাতি পরিচয় নেই। সব জাতির লোকই এই দুই কাঞ্চে দৃষ্ট। রাষ্ট্রের বড় বড় অফিসার পদে যেমন নিম্নবর্ণের লোক পাওয়া যাবে, পুঁজিবাদীদের বড় বড় কর্মীর মধ্যেও অমিল হবে না।

পুঁজিবাদীর সমস্যা ব্রাহ্মণ্যবাদ নয়, সমস্যা জল জম্বল জমিনের অধিকার। সেই দালাল তারা লড়েছে। শংকর গুহ নিরোগী, ডাঃ বিনায়ক সেন, মেধা পাটেকর, ব্রহ্ম

দত্ত শর্মা, বাবা আমটে, পি.ভি. রাজ গোপালন, এ. কে. রায় এমনসব কিছু মানুষ সাধারণত তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কবিতা দলিত দরদী নিম্নবর্ণের এক নেতাকেও ওখানে দেখা যায়নি। এই লড়াইকে তাদের নিজেদের লড়াই ভাবতে চায়নি। আদিবাসীদের বিশ্বাস অর্জনের কোন চেষ্টাই করেনি। অতএব দলিতদের যে লড়াই তাতে তাদের পাশে পাওয়া যাবে না।

আলোচনাটা এবার একটু ছোট করে শুধু পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ করা যাক। এখানে নমশূদ্র পৌত্তল্যক্রিয় এবং রাজবংশী দলিতদের তিনটি বড় এবং সংগঠিত শক্তিশালী গোষ্ঠী। রাজবংশীদের বাস উত্তরবঙ্গে। যতটুকু জানি এককভাবে লড়াই তারা। অপর দুই গোষ্ঠীর সাথে কোন গভীর নিবিড় সম্পর্ক নেই। কোন ভরফে তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের অপর যে দুই গোষ্ঠী নমশূদ্ররা এসেছে ওপার বাংলা থেকে, এপার বাংলার বাসিন্দা পৌত্তল্যক্রিয়রা। পৌত্তল্যক্রিয়দের চোখে নমরো যতটা না দলিত তার চেয়ে বেশি বাস্তব। তাদের ধারণায় বাস্তবরা এসেছে বলেই তাদের চাকরি বাকরি পাবার ক্ষেত্রে ঐত সংকোচন। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিযোগিতা, রাজনীতিতে অনাধিপত্য এবং আরও অনেক অসুবিধা।

নমশূদ্ররা তাদের ভাবে অযোগ্য-উদ্যমহীন-অজ্ঞ। এদের যারপায় বঙ্গের দলিত আন্দোলনের তারাই যথার্থ নেতৃত্ব দানের অধিকারী। পৌত্তল্যক্রিয় তো বটেই অন্যসব দলিত গোষ্ঠীর উচিত তাদের নেতৃত্বকে সর্বিনয়ে মেনে নেওয়া। নিজেদের শিক্ষা দীক্ষার উপর এদের অগাধ অহংকার। আচার আচরণে বেটা প্রতি মুহুর্তে পরিশ্রুট হয়। ফলে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তেমন একটা মেলবন্ধন ঘটেনি। যৌথ কোন সম্মেলন, কোন আন্দোলন আজও হয়নি।

এইভাবে কাওরা, বাগদি, মাথিয়া নমশূদ্র পৌত্তল্যক্রিয় কারও সাথে কারও তেমন একাত্মতা বোধ গড়ে ওঠেনি। সব টুকরো টুকরো হয়ে আছে। যাদের মাত্র পনেরো শতাংশ বলা হচ্ছে তাদের মধ্যে এত ভাঙন নেই। ফলে এরা পঁচাশি হয়েও হেরে যাচ্ছে ওদের সংঘবদ্ধতার কাছে।

আমি নমশূদ্র সমাজের মানুষ। এই জাতির একমুঠ মাছ ধরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। কোন এক কালে। এখন তাদের আর সে পেশা

মান্যমান নেই। তা না থাকুক দোষটা আজও আছে। আর এক দল মাছ ধরে খাওয়া নেই। এই খাওয়া দল বেটা দলকে ছোট ভাবে। কোন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায় না। নিজেদের মধ্যেই যাদের এত টুকরো ছেঁব বিচ্ছেদ ভেদভাব এবং প্রাণাণাধারের মত শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে কী করে লড়াই? কী ভাবে জিতবে?

অন্য কে কী ভাবেছে আমার জন্য নেই। তবে আমার বিচার বিবেচনায় এই অংশটা চললে পঞ্চাশ বছরেরও বাংলার দলিত আন্দোলন গড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে বেটা সবচেয়ে বড় অভাব—তেমন যোগ্য নেতা নেই। যার দ্বারা সব দলিত এক সাথে উঠে দাঁড়াবে। আছে কিছু আনি দু আনি নেতা। মানুষ গাদগ ভরসা করতে পারে না। এই সব নেতা আগে চাকরি বাকরি করেছেন। গাদগেচন পুত্র কন্যার সুন্দর ভবিষ্যৎ। এখন ব্রিটার্ড হওয়ার পর এসেছেন দলিত গাদগেচন গড়তে। কেলে আসা দীর্ঘ জীবন পর্বে তাকে কেউ কোনদিন দলিত দলদল ভূমিকায় পায়নি। এখন তাকে কী করে বিশ্বাস করবে? দলিতরা এখন বিদগ্ধ হয়ে রয়েছে সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস এবং অন্যসব দলে। আছে বিদগ্ধ বালক একটা দল। আছে মায়াবত্তী বিরোধী বিএমপি-ও যাদের নেতা মায়াম। তারপরে আর কেউ নয়।

এবং রয়েছে ধর্মীয় সংগঠন। চলা-ডাল-ডেল-নুনের দাম, বাস ভাড়া বেকার দমপা সে সব নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই, মেতে আছে ফরীদাম মহানন্দে। এই ধর্ম আর কদিনের! এরপর আছে অনন্ত জীবন। সেই জীবন যেন যথেষ্ট সুখের গা। গাঁও কামনা।

নমশূদ্রদের সবচেয়ে বড় সংগঠন মতুরা। শোনা যায় ঠাকুরনগরে বাৎসরিক অনুষ্ঠানে নাকি কুড়ি লক্ষ ভক্ত সমাগম ঘটে। যদিও ডংকা বাজানো, হাফোল হুংকা এবং বড় বড় লাক দেওয়া ছাড়া আর কোন কর্ম নেই তাদের। তবু এরা দু-তি নানা বড় ভাই পছন্দী, ছোট ভাই পছন্দী। আর একমুঠ দুই ভাই বিরোধী পছন্দী।

পশ্চিমবঙ্গের এই দলিত সমাজ নিয়ে কবিতা গল্প উপন্যাস লেখা চলে, নাটক চলে। চলে সভা সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়া। কেউ কেউ তথ্য পেতে পারেন পত্রপত্রি ভিত্তির জন্য। তবে এর বাইরে আর কিছু হবে তেমন আশা যার থাকে

থাকুক আমার নেই।

আর একটি কথা, সেটা অনুগ্রহে বিষয়ে। ২০১৪ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার যেমন দশভাষেরও ৬৮ বছর। ৬৮ বছর বড় কম সময় নয়। এই এতগুলো বছর যারা ওপার বাংলার বাস করেছে এখন এমন হঠাৎ কী হলো যে রাতারাতি বর্ডার পার হয়ে এপারে পালিয়ে আসছে! এখন তো সেই ৪৬ বা ৫০ সালের মত দাঙ্গা নেই। তবে?

আমি যে এলাকায় থাকি বেশ কিছু লোকের কথা জানি, যারা প্রচুর ধর দেনা করে পরিশোধ করতে পারেনি তাই পালিয়ে এসেছে এপারে কেউ এমন কোন কৌজলারি অপরাধে অপরাধী, যাকে বাংলাদেশ পুলিশ ধরতে পারলে ঠুসে দেবে দীর্ঘ মেয়াদি জেলে, কেউ পালিয়েছে প্রতিবেশীর বউটাকে ফুঁসলে নিয়ে। আবার কেউ এসেছে নিতান্ত অভাবে এপারে কুজি রোগজ্বরের প্রয়োজনে।

ধরে নিচ্ছি আমার জন্মটা তুল, অন্যকোন কারণে নয়, তারা মুসলমানের অত্যাচারেই পালিয়েছে। সেটাই বা কেন? এ পারে ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের ঘর বাড়ি জমি জিরেত দখল করার জন্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কী কম হচ্ছে? তারা তো পালিয়েছে না! এরা পালিয়েছে কারণ পাল্যাবার মত একটা স্থান আছে। আদিবাসীদের সেটা নেই তাই তারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকছে। লড়ছে-মরছে, মারছেও।

এদেরও সেন্সি করতে হবে। যেমনভাবে ৬৮ বছর রয়েছে বাকি দিনগুলোও কটাতে হবে। এদেশে স্বাধা বাসস্থান বেকার সমস্যা। আছে জনসংখ্যার বিশাল চাপ, বাসে ট্রেনে পাদপাশি ভিড়, হাসপাতালে বেড মেলে না। এমন স্বজাগো সমস্যার যাঁতায় এদেশ জর্জর। তার উপর প্রতিদিন চারশো পরিবার যুক্ত হয়ে সে সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলবে এ জিনিস চলতে পারে না। কোথাও তো একটা দাঁড়ি টনতে হবে।

ওপার বাংলার যে সব হিন্দু এখনও রয়েছে, যদি দেখে পাল্যাবার পথ বন্ধ, তখন ঘুরে দাঁড়াবে—লড়বে। যদি লড়ে সেই লড়াইয়ে আমাদের সর্ব সহযোগিতা থাকুক। পলায়নে নয়।

## কেবল 'ব্যাদে' নয়

# প্রাচীন ভারতে বাস্তবেই সব ছিল নরেন্দ্র মোদীর বিজ্ঞান চর্চা

গুরুপ্রসাদ কর

সম্প্রতি 'নরেন্দ্র মোদী'র 'উগ্রয়নের' মহান কর্মচার তথা ভারতীয় কর্পোরেট পুজির চোখেব মন নরেন্দ্র মোদী নিউইয়র্কে কয়েক হাজার প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে তারদেশে নরেন্দ্র মোদী ও প্রযুক্তিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবার অঙ্গীকার করে ৭০০ পদ্মশ্রীসম্মানের কাছে হিরো হয়ে উঠেছেন। যেন বাংলার এক নরেন্দ্র-এর (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) পর গুজরাটের আর এক নরেন্দ্র আবার আমেরিকা জয়া করলেন। ৩৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগেই তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি সূর্যকে সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নীত করে অস্বাভাবিক (১) গোথরা ঘটনার প্রতিকারায় ২০০২ সালে গুজরাটে গোড়া হিন্দুধর্মাবাদী সংগঠনগুলি কর্তৃক মুসলিমদের উপর সংগঠিত ভয়াবহ দাঙ্গা সমর্থন করতে গিয়ে তিনি নিউটনের গুল সংগঠিত জিরা ও প্রতিজ্ঞার তথা তৃতীয় সূর্যকে টেনে এনেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হবার পর তিনি সেই যারাহিকতাকে বজায় রেখেই আবার অস্বাভাবিক প্রচারণার ক্ষেত্রে নিজের প্রতিভাকে তুলে ধরলেন। এবার তিনি রিলায়েন্সের গ্রন্থপাঠাল উদ্বোধনে এসে এক ধাক্কায় প্রাচীন ভারতের অত্যাশ্চর্য উন্নতির তত্ত্ব হাজির করলেন। আজ আধুনিক বিজ্ঞানের যেসব কৃৎকৌশল ও সমৃদ্ধি আমাদের সাধারণত পাশ্চাত্যের দেশ থেকে আমদানী করতে হয় তা নাকি প্রাচীন ভারতে যত্রতত্র পাওয়া যেত। বিশেষতঃ জিন সম্পর্কিত আধুনিক সমৃদ্ধি ও প্রাসটিক সার্জারী প্রাচীন ভারতে অজানা ছিল না। তিনি তার বক্তব্য সমাপ্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "মহাভারত বলছে যে কর্ণের জন্ম মায়ের গর্ভে ছায়া। এর অর্থ হল যে মানুষ তখন জিন সম্পর্কিত বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিল।" গণেশ ঠাকুর এর হাতির মাথা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'সেইসময় নিশ্চয়ই এমন

একজন প্রাস্টিক সার্জন ছিলেন যিনি গনেশের ধরে হাতির মাথা সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন।' (ইন্ডিয়া টুডে, নিউ দিল্লী, অক্টোবর, ২৫, ২০১৪)

কিন্তু এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই যে প্রাচীন ভারতের ধর্মগ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায়ের অস্তিত্ব মৌলীই প্রথম আবিষ্কার করেছেন। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই আমাদের দেশের তথাকথিত মধ্যশ্রেণি যারা মূলগতভাবে উচ্চবর্ণীয় এবং ব্যবসা সূত্রে বা চাকরী সূত্রে বা জমিদারী চালানোর সূত্রে নানাভাবে ব্রিটিশ শাসনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল, তারা একদিকে যেমন নিজেদের উন্নতির জন্য ব্রিটিশ শাসকদের সেবা করতো তেমনি এর পাশাপাশি নিজেদের অর্থমিকা বোধ চরিতার্থ করতে প্রাচীন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতো। উনিবিংশ শতকে বাংলায় যে 'নবজাগরণের' সূচনা হয়, তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞান ভাষা প্রসারের কিছু প্রগতিশীল উপাদান থাকলেও অচিরেই তা হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীতে রূপান্তরিত হয়। একদিকে ব্রিটিশ শাসকদের সেবায় নিয়োজিত ও অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে চালিত কৃষক সংগ্রামের বিরোধিতা ও দেশের কৃষক সহ নিম্ন জাতি-বর্ণের খেটে খাওয়া মানুষকে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিতে আবদ্ধ মধ্যশ্রেণির সামনে এ জড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। ফলে বিজ্ঞানকে উর্ধ্বে তুলে ধরার স্বপ্ন নিয়ে যে 'নব জাগরণের' সূচনা হয় তার পরিণতিতে আমরা পাই 'স্বামী' বিবেকানন্দকে। বিশ্বে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে তিনি কলছেন, 'আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারের সাথে প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদের মতের অশর্চ সামঞ্জস্য রয়েছে, এমনকি যদি কোথাও কিছু অপূর্ণতা থাকে তাহলে রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যেই।'

সেই ব্রিটিশ আমলেই হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অতিকথা নিয়ে এই ধরনের প্রচারে বিরক্ত হয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা 'সকই ব্যাধে আছে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি এই ধরনের অপপ্রচারকে আক্রমণ করে লেখেন, 'সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোন হিন্দু বা গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কেপলার-গ্যালিলিও-বা নিউটনের বহু পূর্বেই মধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি পাণ্ডলের প্রলাপ বই কিছুই নহে। দুঃখের বিষয় দেশে এইরূপ অপবিজ্ঞান প্রচারকের অভাব নাই, তাহারা সত্যের নামে নির্জলা মিস্তার প্রচার করিতেছেন।'

নাহা।

[ক] [১৭৬০] হিঁসাবে মেঘনাদ সাহা যত বড়ই হোন না কেন, ভারতীয় বিজ্ঞানে তার যতই তার গৌরবময় ভূমিকা থাকুক না কেন তার এই বক্তব্য যাতে বিশেষ প্রচার না পায় তার জন্য ভারতীয় শাসকবর্গ ও বৃহৎ গণমাধ্যমগুলি বিশেষ সচেতন। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকেরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই এই ধরনের অপবিজ্ঞানের পক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং যাকেও আর তাতে সরঞ্জাম থেকে বৃহৎ গণমাধ্যমগুলিই কেবল মদত যোগাবে না, বিভিন্ন সামাজ্যবাদী সংস্থাও তাদের স্বার্থে এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক প্রচারের পক্ষে মদত দিয়ে থাকবে। অনেকে ভাবতে পারেন এই ধরনের প্রচারে লাভ কোথায়? এটা ঠিক যে লাভ আপনার আমার নেই, আপনার জনগণেরও নেই, কিন্তু এই ধরনের অপপ্রচারের সাথে স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে ভারতের বড় বড় পুঁজিপতি ও গণসংগঠনদের, উচ্চবর্ণীয় ফনী সম্প্রদায়ের যারা হয় সরকারি কর্তব্যবাহিনী না হলে সামিল ফনী সম্প্রদায়ভুক্ত।

দেশের বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার ঘটানোর জন্য ভারতের শিল্প মালিকদের কোন আগ্রহ আগেও ছিল না আজও নেই। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই তারা বিদেশী শ্রুতি ও আমদানীকৃত প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে ব্রিটিশ শাসকদের সহায়তায় এক ধাক্কার বৃহৎ শিল্পপতি হয়ে উঠেছে এবং বতর্কিন গেছে তারা এই নির্ভরতাকে বজায় রেখেই দেশের সম্ভ্রম শ্রম এবং দেশের সম্পদকে বিদেশে পাঠান করেই আরও ফনী হয়ে উঠেছে। তাই স্বনির্ভর দেশীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের কর্মসূচীকে এরা বড়ই ভয় পায় কারণ তাতে দেশের অগণিত দেশসেবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের উদ্যোগ ও কর্মোদ্যমের সামনে এদের চাটুকারিতা প্রকাশ পেয়ে যাবে, বিভিন্ন জাতিসত্ত্বগুলির মধ্যে থাকা উদ্যোগপতিদের সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকর্মের সামনে এদের দেশদ্রোহী চরিত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে, অতিকর্ষ প্রণালী গ্রহিণী দুর্বল হয়ে সম্ভ্রম শ্রমের লুপ্ত ও নির্বিকারে জল-অশ্রু জমি দখল করিন হয়ে পড়বে এবং গোটা বাজারের উপর তার একাধিপত্য নষ্ট হয়ে যাবে, যার ফলে আবার তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের অতি মনাগা করার চাবিকাঠিও হাতছাড়া হবে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারতীয় অঞ্চলের সম্ভ্রম অতি প্রাচীন

একটি ছিল একটি উন্নত সভ্যতা। প্রাচীন ভারতে উন্নত কৃষিকাজ, নানা ধরনের বীজের আবিষ্কার, উন্নত সেচ ব্যবস্থা, উন্নত বস্ত্র শিল্প, গণিত ও মহাকাশবিদ্যার চর্চা, লোহার ব্যবহার—এগুলি সবই গর্ব করার মত বিষয়। কিন্তু নিম্ন জাতি-বর্ণের অন্তর্ভুক্ত অগণিত খেটে খাওয়া জনগণের উৎপাদনশীল কাজ ও তার ভিত্তিতে এই সৃষ্টিশীল কার্যকলাপকে স্বীকৃতি দেবার মত কোন ইচ্ছাই এই ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের ছিল না এমনও নেই। তারা কেবল অর্থহীন অতিকথা ও অপবিজ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে হিন্দুদের পৌরব প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যস্ত।

যে রামকৃষ্ণ মিশনকে বিজ্ঞান শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে দেখা হয় তারাও এই হিন্দুবাদী অপবিজ্ঞান প্রচারের বিশেষ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। তাদের মুখপত্র 'উদ্বোধন' কলছে এ কৃষ্ণ গহ্বর (black hole)-এর ধারণা মোটেই নতুন নয়, হিন্দু ঋষিরা অনেক আগেই এর সম্মান পেয়েছে। স্বঘোষিত প্রগতিশীল অদম্যবাজার গোষ্ঠী এই ধরনের প্রচারে বিশেষ আগ্রহণ্য। 'দেশ' পত্রিকার ১৯৯৫-২২শে এপ্রিল সংখ্যায় 'বিজ্ঞান ও ভগবান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে হরীকেশ সেন দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন যে বেদান্তে উর্ণনাত বা মাকড়সার রূপ আছে তা আসলে আধুনিক বিজ্ঞানে প্রস্তাবিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মেডল। যাকে বিয়ট ভারতীয় চিন্তাবিদ হিসাবে গণ্য করা হয় সেই অরবিন্দ ঘোষ বলেছিলেন যে বিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ভারতীয়দের বিবর্তনবাদকে বৈদিক অবিষ্কার হিসাবে দেখা যেতে পারে যদি প্রজাতি বিবর্তনকে আক্ষর পুনঃ পুনঃ শারীরিক রূপ নেওয়ার মাধ্যমে তার আধ্যাত্মিক অগ্রগতি হিসাবে দেখা হয়। সম্রাতি ওকলহামা স্টেট ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার বিভাগের অধ্যাপক সুভাষ কাক দাবী করেছেন যে বেদের শ্লোকগুলির মধ্যে আসলে জ্যোতির্বিদ্যার আধুনিক সমস্ত তথ্যগুলি নিহিত আছে। ডক্টর রাজা রাম মোহন রায় ১৯৯৯ সালে 'সায়েরিফিক অরিজিন অব হিন্দুইজম' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন যার মুখবন্ধটি লেখেন সুভাষ কাক। এই রচনাতে দাবী করা হয়েছে যে স্বকবেদে আসলে কণা পদার্থবিদ্যা ও মহাকাশবিদ্যার মৌলিক বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে। যাইহোক অপবিজ্ঞান চর্চার এরকম উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

কিন্তু এইসব হিন্দুবাদীদের কাকি ধরা পড়ে যায় বিজ্ঞানের নিয়মেই। কারণ বিজ্ঞানের বিকাশের একটি ইতিহাস আছে যেখানে দেখা যায় কীভাবে

উৎপাদনের কাজ সহ প্রকৃতির উপর মানুষের অসংখ্য প্রায়োগিক ক্রিয়াকলাপ ও তাৎক্ষণিক দিয়ে অর্জিত সাধারণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের ভিত্তি তৈরি করে। আবার বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি পরাম্পরা সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষত প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অতীতের তত্ত্বগুলির সীমাবদ্ধতা ভবিষ্যতের তত্ত্ব আবিষ্কারের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। কেপলার ও গ্যালিলিওর তত্ত্ব নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কারের ভিত্তি তৈরি করেছিল, একইভাবে তড়িৎ ও চুম্বক নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বের ভিত্তি তৈরি করেছিল। আবার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব ও ইথার মাধ্যমের তত্ত্বের মধ্যে যে সংঘাত দেখা দেয় তাই আবার পরবর্তীতে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের জন্ম প্রস্তুত করে। তাই বিজ্ঞানের ইতিহাসের বোধাবোধ রহিত ভগ্নাবাদীদের অতীত সব দাবি সামাজ্যবাদী শাসকদের পিঠে চাপরাশি পেতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানমূলক মানুষের কাছে তা নিছক তামাসার বিষয় হিসাবেই থাকবে।

তবে হিন্দুবাদকে অতিকথার মধ্যে দিয়ে চাগিয়ে তোলার অন্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও রয়েছে। যদি প্রমাণ করা হয় সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দুবাদের কী কোন একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। এর উত্তরে কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় সংস্কৃতি গাফিলত করা যাবে না। উত্তর ভারতে রাম পূজা হয় তৌ দক্ষিণে রাবণ পূজা হয়। এরকমভাবে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতি আচার ব্যবহার বিদ্যমান। কিন্তু একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ভারত জুড়ে আছে আর সেটি হল জাতি বর্ণ ব্যবস্থা। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাই হল তথাকথিত হিন্দুবাদের অন্তরায়। তাই শেষবিচারে হিন্দুত্বকে চাগিয়ে তোলার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তার এই অন্তরায় তথা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে মহিমামণ্ডিত করা এবং তাকে রক্ষা করা। গাফিলত এই অন্তরায়কে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই গাফিলতকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করে গেছেন। ১৯৩৬ সালে জাতি-বর্ণ পদা রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ গান্ধীজি বলেছিলেন, 'একজন ভাঙ্গি বা মেথর সমাজের জন্য সেই কাজই করে যা একজন মা তাঁর সন্তানের জন্য করে থাকেন। মা তার সন্তানকে সুস্থ রাখতে তার 'ও-মুত' পরিষ্কার করেন। একইভাবে একজন মেথরানিও সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সকলের পায়খানা সাফ করে...।'

নরেন্দ্র মোদী এ ব্যাপারে কেবল গাফীজির যোগ্য শিষ্যই নন, আরও একথা এগিয়ে ২০০৭ সালে 'কর্মযোগ' বইয়ে মোদী লিখছেন, 'আমি মনে করি না, বাণেশ্বরীকির অন্যের মল সাফ করার এই কাজটি কেবল রুজি-কুটির জন্য করে। তা যদি হতো, তাহলে বংশ তাহলে বংশপরম্পরায় এ কাজ তারা করত না। কোনও এক কালে নিশ্চয়ই তাদের করণে চেতনার দৈব প্রত্যাদেশে এই আধ্যাত্মিক উন্মোচন ঘটেছিল যে, এ কাজ তারা করছে ভগবানকে কুশি করতে। সেই অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিকতার প্রেরণাতেই শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা প্রজন্ম পরম্পরায় একাজ করে যাচ্ছে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, তাদের পূর্বপুরুষরা ইচ্ছে করলে বিকল্প কোনও রুজিরোজগারের সন্ধান পেত না।' ('স্বচ্ছ ভারতের পাশেই অসচ্ছ ভারত'—বৌতম রায়, আনন্দবাজার, ১৫ নভেম্বর ২০১৪)

তাই প্রাচীন ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত কিছুই উপস্থিত ছিল এটা বলার মধ্যে দিয়ে আসলে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়, জাতি-বর্ণ প্রথার মত হিন্দুধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে যাতে কেউ প্রশ্ন না করে তার জন্য একটি ভীতির পরিবেশ তৈরি করবার চেষ্টা করা হয়। এটার একটি উদ্দেশ্য যেমন একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী অহমিকা বোধ তৈরি করে অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও দলিত-আদিবাসী মানুষের উপর দমন পীড়ন নামিয়ে আনা তেমনি এর আর একটি উদ্দেশ্য হল মানুষের বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠবার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিদেশি পুঁজির শক্তা শ্রমের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ইংরেজি জ্ঞান একমুখা ইঞ্জিনিয়ার বা প্রযুক্তিবিদ তৈরি করে বার মধ্যে দিয়ে কিছু ডলার অর্জিত হয় বটে কিন্তু আমাদের দেশের শাসকরা কখনই দেশের উন্নতির লক্ষ্যে সত্যিকারের বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম তৈরি করবার জন্য দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করেনি। বর্তমানে উনার অর্থনীতির দাপটে শিক্ষাব্যবস্থা এতটাই বাণিজ্যের বিষয় হয়ে উঠেছে যে নিম্ন জাতি-বর্ণের মানুষ তো দূর অস্ত, যথেষ্ট ধনী না হলে শিক্ষায় অংশগ্রহণ করাই অসম্ভব। তাদের লক্ষ্য চলতি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও তার ক্রমবর্ধমান জনবিরোধী চরিত্র বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে দেশের আপামর জনসাধারণকে অজ্ঞানতার ভূমিতে রেখে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার মত কুৎসিত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা কর

না' এমন করার পক্ষে জনমত তৈরি করা। এরমধ্যে দিয়েই না এমন অবস্থা জালি নানা সম্ভব হয় যাতে একদিকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও দেশের ৮০% মানুষের দুবেলা নূনতম খাবার জোটে না আর অপরদিকে দেশের জল-জঙ্গল-জমি বিদেশি ও তার সহযোগী দেশীয় কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া হয়। দেশপ্রেমিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এইসব কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে আশান্ন হয়ে উঠবেন হিন্দুধর্মের শত্রু আর সেই কারণে আপনি দেশেরও শত্রু। আশান্ন জন্যে অপেক্ষা করবে সেই ঔপনিবেশিক আমলে চালু হওয়া এবং আগত সরকার কর্তৃক সমস্তে রক্ষিত নানা ধরনের কল্যাণ আইন। বর্তমানে আবার কল্যাণ আইন আছে বারা যখন তখন সম্ভ্রমবাদের মাধে আপনায় যোগ প্রমাণ করে দিতে পারে। বিক্রি হয়ে যাওয়া কৃষক গণমাধ্যমগুলি তো ওং পেতে বসেই আছে গল্প তৈরি করার জন্য। একমাত্র ভবিষ্যতই কলতে পারবে এই দমবন্ধকরা খবরা থেকে জনগণ কীভাবে মুক্তি পাবে।

# মোদি সরকারের 'আচ্ছে দিন' বৃহৎ মালিকদের জন্য পৌষমাস, কিন্তু জনগণের জন্য সর্বনাশ

পলাশ রায়

প্রখ্যাত হিন্দি কবি গোরখ পাণ্ডের একটা গণসঙ্গীত খুব জনপ্রিয় হয়েছিল- 'সমাজবাদ বাবুয়া ধীরে ধীরে আসে'। মোদি সরকারের কাজকর্মের রকম স্কম দেখে সেই পুরোনো হিন্দি গীতটার কথাই আবার খুব মনে পড়ছে। ক্ষমতায় আসার আগে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপিত হ'ত নরেন্দ্র মোদীর সহস্রা মুখ। মোদিজীকে কহমত দেব..... 'আচ্ছে দিন' আসছে। আসছে তবে গোরখ পাণ্ডের সেই গানের মতো। ধীরে ধীরে।

কথাছিল, ক্ষমতায় এসেই প্রথমে মোদিজী দেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যা মেটাচ্ছে। মস্কো মস্কো সেদিন কত ভাষণ। কত প্রতিশ্রুতি। কথা ছিল, দুর্নীতি সমাধানে একটা জবরদস্ত সমাধান করা হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিগুলির পিছনেই যে আছে এক মস্ত দুর্নীতি, সে প্রশ্ন টি টি করে আমরা কেউ কেউ জেলার চেঁচা করেছিলাম বটে কিন্তু কর্পোরেট মিডিয়া আমাদের মত ছ-পোষাদের কথা শুনবে কেন? কিন্তু ঘটনা তো এটাই, যে স্রেফ মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে খরতেই খরচ করা হয়েছে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা বলে অভিযোগ। প্রচণ্ডের বহুর দেখে তার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ জাগে না। এত টাকা এলো কোথা থেকে? প্রশ্নগুলো সহজ, উত্তর তো আজ আর অজানা নয়। কর্পোরেট মিডিয়া দু'হাতে ঢেলেছে যে। কেন ঢালাবে না? একবার ভাবুন তো এই মোদিই তো গুজরাটে টাটার ন্যানো কারখানার জন্য জমি দিয়েছে বর্গ মিটার প্রতি ৯৮০ টাকা দরে, ফলতঃ জমি থেকেই টাটার লাভবান হয়েছে সরাসরি ২২ হাজার কোটি টাকা, কেননা এই জমির বাজার দর বর্গমিটার পিছু ১০ হাজার টাকা। যে টাটার ন্যানো কারখানাকে পশ্চিমবঙ্গের মাদুখ সংগ্রাম করে কৃষিজমি দখল করতে দেখনি, অন্তত

১০৮

পলাশ রায়

শাপাশাপাশে পিছু হঠিয়ে দিয়েছিল, মোদি তাকেই ডেকে নিয়ে গিয়ে জলের দরে ৩৫মি দিয়ে দিলেন নিজের 'শিল্পবান্ধব' ভাবমূর্তি নির্মাণের স্বার্থে। কিন্তু সেদিনই এই শিল্পবান্ধব ভাবমূর্তির পাশাপাশি জনবিরোধী ভাবমূর্তিটাও যে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছিল, তা মোদেই আর কল্যার অপেক্ষা রাখে না। শুধু টাটার নয়, মুম্বার সেজ প্রকল্পের জন্য আদানি গোষ্ঠীকে গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রীদে থাকাকালীন মোদি জমি দিয়েছেন বর্গমিঃ পিছু ১ টাকা দরে। এল এন্ড টি-কেও ৮০ হেক্টর জমি দেওয়া হয়েছে বর্গমিঃ পিছু ১ টাকা দরে। এসার স্টিল প্রজেক্টকে পরিবেশ আইনের ভোয়াকা না করেই শিল্পের জন্য কনভুমি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রচুর পরিমাণে। লার্সেন এন্ড টুবরো, মার্কাস কোম্পানিকেও প্রভূত পরিমাণ জমি সে সময় মোদি সরকার তুলে দিয়েছিল, বলা যেতে পারে জলের দরেই। ফলতঃ মোদিই তখন কর্পোরেট পুঞ্জির কাছে উন্নয়নের 'পোস্টার বয়'। তাঁরা হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করল মোদিদে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসানোর জন্য। বাথা বাথা সাংবাদিকরা কীপিয়ে শড়পেন। মিডিয়ার অধিকাংশ সময় জুড়ে 'মোদি কথা' প্রচারিত হলো! গুজরাট গণজতার নায়ক মোদি ভাই হয়ে উঠল আত্মনীতির চোখে 'দুরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা'। 'মানুষদের প্রভু'। 'নেতাদের নেতা'। রাজাদের মধ্যে রাজধিরাজ'। টাটার চোখ মোদেও তখন 'শিল্পপতিদের সবচেয়ে ভরসার ঠিকানা'।

গাঙ্গার মিডিয়া প্রচার করল বিরাট অগ্রগতি হয়েছে মোদীর গুজরাটে। বাজারি মিডিয়া এমনটাই করে। নিনকে রাত বানায়। সূর্যকে কালো বানায়। ফলতঃ গুজরাটের উন্নয়ন নিয়ে গল্পের ফানুস আকাশে উড়ল। চাপা পড়ে গেল, গুজরাট গণজতার সময়কার নিহতদের পরিজনদের আর্ত চিৎকার। চাপা পড়ে গেল নারীর পট চোনে গর্ভের কৃষ্ণ তলোয়ারের ডগায় খুঁচিয়ে তুলে আনার সেই নৃশংস দৃশ্য। চাপা পড়ে গেল, বেট বেকারির নিহতদের দলাপাকানো লাশগুলি। এমনকি এতো ১৯৮৫র পরও চাপা পড়ে গেল ইশরাত জাহানের কথাও। শুধু তাই নয় উন্নয়নের কথা নিনাদের ভারতের অধিকাংশ লোক জানলই না যে 'উন্নত' গুজরাতে নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীর ৯,৮২৯ জন কর্মিক, ৫,৪৪৭ জন কৃষক ও ৯১৮ জন ফার্ম মজুর দাবীদের ছালায় আতঙ্কিত্য করতে বাধ্য হয়েছেন।

গুজরাট উন্নয়নের প্রকৃত চিত্রটি গুজরাটে ছিল বড়ই কলশ। দরিদ্র, ক্ষুধা, অপুষ্টি, বচনা আর হাশ্বকারের এক হারহিম করা চিত্র। কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচারের সঙ্গে

১০৯



মোদি সরকারের 'আছেদিন' বৃহৎ পুঁজির মালিকদের জন্য শৌখিন, কিন্তু জনগণের জন্য সর্বনাশ

বাস্তবতা যার কোনও মিলই নেই। যদি উন্নয়নকে আর্থিক প্রবৃদ্ধির নিরিখে বিচার করি তবে একটা কথা শুরুতেই স্মরণ রাখতে হবে, সমুদ্র তীরবর্তী বন্দর শহর হওয়ার কারণে বাণিজ্যিক বিকাশের দিক থেকে গুজরাতের শহরগুলি বরাবরই একটু ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির সময়ের চেয়ে পূর্বতন কংগ্রেস জমানায় এই বিকাশের হার বেশি তো ছিলই, এমনকি তা একটু আধটু বেশি নয় মোদি জমানার প্রবৃদ্ধির বিপণ ছিল। যদি ধরে নেওয়া হয় উৎপাদনের (GSDP) বিচারে, তাহলেও দেখবো মোদির গুজরাটকে ফেলে এগিয়ে ছিল বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু! এমনকি মোদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেও গুজরাটের উৎপাদন ছিল পরবর্তী মোদি জমানার বিপণ।

রাজন কমিটির সুপারিশকে যদি ধরি, সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিক্ষমতা, নারী এবং তফসিলী জাতি উপজাতিদের অবস্থা, উন্নয়নে সমাজের সকল অংশের প্রতিনিধিত্বের মতো দশটি মানদণ্ডকে ধরা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে রাজন কমিটি যে উন্নয়নভিত্তিক রাজ্যের তালিকা প্রস্তুত করল তাতে মোদির গুজরাটের স্থান হলো ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ১৭তম। মানবোন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে ধরলে গুজরাটের স্থান দেশের মধ্যে একাদশতম। রথুনাক্ষন কমিটি পশ্চাদপদতার নিরিখে দেশের রাজ্যগুলির যে তালিকা বানাতে তাতে ২৮টা রাজ্যকে তিনভাগে ভাগ করা হলো। ৭টি উন্নত রাজ্য। ১১টি কম উন্নত রাজ্য এবং আরো স্বল্পোন্নত ১০টি রাজ্য। মোদিজীর গুজরাট সেখানে স্থান পেল কম উন্নত রাজ্যের তালিকায়। সম্প্রতি বিশ্বায়নের অর্থনীতির পক্ষে উকিল পণ্ডিতদের রমরমা যুগে, বিনিয়োগের নিরিখে উন্নয়নকে পরিমাপের বিষয়টা বেশ চর্চিত হচ্ছে। তার নিরিখেও মোদিকে 'ফাস্ট বয়' বলা যাচ্ছে না। যেমন স্যোসিয়ো ইকনমিক রিভিউ-২০১২-এর তথ্য কলাহে ২০১১ সালে গুজরাতে ২০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছিল, কিন্তু বাস্তবে লাগি হয়েছিল ২৯ হাজার ৮১৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ শতাংশের হিসাবে ০.২৫ শতাংশ। ৮৩০০টি মউ স্বাক্ষরিত হলেও বাস্তবায়িত হয়েছিল ২৫০টি। ঘটনা হলো প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগেও গুজরাতের স্থান প্রথমে নয় পঞ্চমে। প্রথমে রয়েছে মহারাষ্ট্র।

তবে কয়েকটা ব্যাপারে মোদির গুজরাতে ছিল দেশের মধ্যে প্রথমে। যেমন দারিদ্র বৃদ্ধির প্রপঞ্চ। ২০০১ সালে যেখানে দরিদ্র ছিল ৩২ শতাংশ মোদী জমানায়

পল্লব রায়

দশ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৫ শতাংশ। আদিবাসী উচ্ছেদের প্রশ্ন। অনেকেই হয়ত স্বপ্ন রাখেন না, নরেন্দ্র মোদির গুজরাটে ৪৭.৯০০ শতাংশ আদিবাসী স্থায়ীভাবে বাসভিট্টেইন হয়ে গেছে। দরিদ্রতা এতেটিই তীর ছিল যে গুজরাতে ৪৭ শতাংশ শিশুর গুজর স্বাভাবিকের চেয়ে কম। ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী অনুধ্ব ৫ বছরের ৫০ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। ৭৫ শতাংশ শিশু রক্তাক্ততার শিকার। ৪৬ শতাংশ-এর গুজর গড় গুজনের চেয়ে কম। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ২৮.২ শতাংশ পুরুষদের ও ৩২.৩ শতাংশ মহিলাদের গুজর গড় স্বাভাবিক গুজনের চেয়ে কম। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদনে এলা হয়েছে মোদির গুজরাতে ৮০ শতাংশ মহিলাই রক্তাক্ততার শিকার। শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যেও গুজরাট দেশে প্রথম। যেখানে গুজরাটে লিঙ্গ বৈষম্য ১৩.৩ শতাংশ সেখানে তা মহারাষ্ট্রে ০.০৬ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ১.২৪ শতাংশ। শিক্ষার গুণগত মান এতেটিই খারাপ যে ইউনিসেফের প্রথম সমীক্ষা রিপোর্ট কলাহে যে গুজরাতে পাঠ্যবই পড়তে পারে, যদি দেখে সময় কলতে পারে, পরসর গুণতে পারে এবং প্রাথমিক স্তরের যোগ বিরোধ অঙ্ক করতে পারে এমন ছাত্রের সংখ্যা বিহারের চেয়েও কম।

গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মোদি একদিকে যেমন কর্পোরেট মালিকদের দান ধররাতিতে ছিলেন মুক্ত হস্ত, কৃষক এবং মেহনতি মানুষদের বেলায় ছিলেন ততটাই কৃপণ। কর্পোরেট মালিকরা সস্তার জমি পেয়েছে। জল পেয়েছে। অশ্বত কৃষকরা ভর্তুকি সবচেয়ে কম পেয়েছে মোদী শাসতি গুজরাটে। সারের উপর ভ্যাটের পরিমাণ ছিল মোদি শাসতি গুজরাটে ৫ শতাংশ, দেশের মধ্যে কোথাও ৭০ সারের উপর ভ্যাট নেওয়া হয় না। মোদি জমানায় গুজরাটে ৩.৯৮ লক্ষ কৃষক কিংবা সংযোগ পারনি। গ্রানিং কমিশনের তথ্য অনুযায়ী গুজরাটে স্বাস্থ্য ব্যয় ১৯৯০-৯৫ সালে যেখানে ছিল ৪.২৫ শতাংশ মোদিজীর জমানায় (২০০৫-১০১০ সালে) তা কমে হয়েছে ০.৭৭ শতাংশ। পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিনেও গুজরাটে ভ্যাট দিতে হয় দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। পরিবহন সংক্রান্ত গ্যাস 'সিএনজি'র উপর ভ্যাটও দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল মোদির গুজরাটে।

লাগি বড়ব ডাবমুর্তি বনাতে গিয়ে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গুজরাটে মারাত্মক পরিমানে। নিরমা কোম্পানিকে মোদি সরকার দিয়ে দিয়েছে ক্রিট

মোদি সরকারের 'আছে দিন' বৃহৎ পুঞ্জির মালিকদের জন্য পৌরস্বাস, কিন্তু জনগণের জন্য সর্বনাশ

পরিমাণ জলাভূমি, যার ফলে অন্তত ৯টি বরাপ্রবণ গ্রাম স্থায়ী সর্বনাশের দিকে এগিয়েছে। মানগ্রোভ অরণ্য নষ্ট হয়েছে গুজরাটের ৩৫ শতাংশ। শুধু তাই নয় গুজরাটের শহরগুলি আজ জলপ্লাবিত করনের পরিবেশ দূষণের শিকার।

এই যে এতো করুণ দশা, তা সত্ত্বেও কেন এত ঢকা নিদা? কারণ কর্পোরেট পুঞ্জির কাছে উন্নয়ন মানে হলো মুনাফা করার অবাধ স্বাধীনতা। লুট করার বৈধতা। ফলশ্রুতি লাভবান তারা হয়েছে তো বটেই। তাঁরা কতটা স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে হয়েছে তা বোকা যায় মোদি ঘনিষ্ঠ আলানি গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি দেখলেই। ২০০২ সালে আলানিদের ব্যবসার পরিমাণ ছিল যেখানে ২৮১৬ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ান ৩৫৮৮১ কোটি টাকা। মোদিজী দিল্লিতে সরকার গড়বে বৃহৎ ফেরত এই এক্সিট পোল রিপোর্ট শুনেই আলানি গোষ্ঠীর শেয়ার সূচক এত বেড়ে গেল যে গত ১৬ মে শেয়ার বাজারের দৌলতেই তারা ঘরে তুলল ৬০ কোটি ডলার, টাকার অঙ্কে ৩৫০০ কোটি টাকা। আর একই দিনে মুকেশ আম্বানি লাভ করে প্রায় ৫৮০০ কোটি টাকা। এহেন মোদি সরকার ক্ষমতায় এসে দেশটা যে একটা গুজরাট মডেলেরই একটা বিকৃতরূপ হবে তা আর কলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত সেদিকেই দেশ এগিয়েছে। 'আছে দিন' আসছে। ধীরে ধীরে। তবে তা কতজনের জন্য 'আছে' তা বুঝতে বেশি মাথা ব্যাটাতে হবে না।

রেলভাড়া ভাড়া বেড়ে গেল। ১৪.২ শতাংশ হারে। সঙ্গে বাড়ল পণ্য মাসুলও ৬.৫ শতাংশ। এর ফলে যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে তা তো স্বাভাবিক। তাহলে কোথায় গেল মূল্যবৃদ্ধি রোধের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি? এ যে সরাসরি প্রতারণা! সারের দাম, খাদ্য সুরক্ষা, একশদিনের কর্মসূচিতেও ভর্তুকি কমানোর কথা ঘোষণা করা হলো ক্ষমতায় করার সঙ্গে সঙ্গেই। জ্বালানি তেলে ২২.০৫৪ কোটি টাকা ভর্তুকি কমানো হবে। ডিজেলের দাম প্রতি মাসে লিটারে ৫০ পরমা করে এখন থেকে বাড়বে। লক্ষা ডিজেলের ভর্তুকি ওপ্যতে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে পেট্রোলের মতো ডিজেলের দামও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা যায়। যাতে দাম চলে যায় কেসরকারি মালিকদের নিয়ন্ত্রণে। গ্রাম উন্নয়নে গত বছর যেখানে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫৬,৪০৮ কোটি টাকা এবার বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৩,০৮২ কোটি টাকা। সামাজিক স্বাস্থ্যে গতবার যেখানে বরাদ্দ ছিল ১,৯৩,০৪৩ কোটি টাকা সেখানে এবার বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৭৯,৪১১ কোটি টাকা। তপশিলি জাতি উপজাতিদের

পলাশ রায়

জন্য পৌরস্বাস বরাদ্দ কমানো হয়েছে যথাক্রমে ৪৭ হাজার কোটি টাকা এবং ১৪ হাজার কোটি টাকা। গত বছর সামাজিক কল্যাণ ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল ৬,৮০,১২৩ কোটি টাকা এবার তা কমে হয়েছে ৪,৮৪,৫৩২ কোটি টাকা। এদিকে সাধারণ নাগরিকেরা শীত ও প্রতিরক্ষা নিয়ে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের উৎসাহী ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করা হয়েছে। শিল্পে বিলম্বীকরণের লক্ষ্যমাত্রা রাখা করা হয়েছে ৫৮,৪২৫ কোটি টাকা। বিলম্বীকরণে খাড়া কুলছে বালকো, ফার্মাসি, সেল, কোল ইন্ডাস্ট্রির মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলির মাথার উপর। দেশ বিদেশি পুঞ্জিকে যখন ২২,২০০ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ করে ছাড় দেওয়া হচ্ছে তখন জনগণের উপর পরোক্ষ কর চাপানো হয়েছে ৭,৫২৫ কোটি টাকার মাধ্যমে।

৭৭ আন্দোলনের চাপে সংস্কারিত জমি অধিগ্রহণ আইনটিকে মোদি সরকার পুনরাবস্থা সংস্কার করতে চলেছে। শতকরা পঞ্চাশ শতাংশ জমিদাতার সম্মতিতেই এখন কোন প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ করা যাবে, পূর্বর্তন কেন্দ্রীয় সরকারের সীলন অধিনে যেখানে দরকার ছিল অন্তত আশি শতাংশের সম্মতি। এছাড়া কাগজপত্রের পরিমাণও কমানো হবে। মোদি সরকার এ বছরের বাজেটে অন্তত ১০১ লক্ষ টাকা ব্যক্তিগত আয়কর ছাড় ব্যবদ দান করেছে, এদিকে যখন দৈনিক ১০০ টাকা কম রোজগার করেন অধিকাংশ মানুষ তখন তাঁর সরকার খাদ্য সুরক্ষা পলটিকে ফাইল চাপা দিয়ে দিয়েছে। ১০০ দিনের কাজের জন্য বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে ব্যাপক হারে।

২০১৩ ওষুধের মূল্য নির্ধারণের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ব্যাপারে মার্কিন প্রণয়ন প্রকল্পকারী সংস্থাগুলি চাপ সৃষ্টি করেছিল অনেক দিনই ধরেই। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মার্কিন মূল্যকে পা রাখার আগেই সে দেশের ওষুধ প্রকল্পকারী সংস্থাগুলি প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছিল যে তাঁদের উদ্দেশ্যের বিবরণগুলি যেন নাগাধর্মের সঙ্গে আলোচনার তোলা হয়। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা সফরে যাওয়ার আগে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। কেন্দ্রে ইউপিএ জমানায় ওষুধের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান এমপিসিএ-র মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ কার্যে করেছিল সরকার। তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীকান্ত জেনার নাবি, এমন কিছু ওষুধের দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ

করা হয়েছিল যেগুলি 'ন্যাশনাল লিস্ট অব এসেনশিয়াল মেডিসিন' তথা অত্যাবশ্যক ওষুধের দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল যেগুলি 'ন্যাশনাল লিস্ট অব এসেনশিয়াল মেডিসিন' তথা অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকাভুক্ত না হলেও জীবনদায়ী ওষুধ হিসেবে পরিচিত। এতে ক্যান্সার, মধুমেহ, হৃদরোগ ও রক্তচাপ-জনিত সমস্যার প্রতিকারে ব্যবহৃত ওষুধের দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে গিয়েছিল। উদাহরণ দিয়ে জেনা বলেন, 'গ্লোভেক নামে ক্যান্সারের যে ওষুধের দাম ছিল ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। তা কমিয়ে সাড়ে ৮ হাজার টাকার করা হয়। বহু অ্যান্টিবায়োটিকের দামও কমিয়ে প্রায় অর্ধেক করা হয়। কিন্তু গত ২৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় রসায়ন মন্ত্রকের নির্দেশে এনপিপিএ জমিয়ে দিয়েছে তারা ওষুধের মূল্য নির্ধারণের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিচ্ছে। একমাত্র দেশে আপৎকালীন পরিস্থিতি বা মহামারীর মতো সমস্যা দেখা দিলে তবেই মূল্য নির্ধারণের ওপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ হবে। যদিও সরকারের একটি শীর্ষ সূত্র বলছে, জুলাই মাসের ১০ তারিখ এনপিপিএ-র অ্যান্টি-জয়াবোটিক এবং হৃদরোগ সংক্রান্ত আরও ১০৮টি ওষুধের ওপরেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। সেগুলি অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় নেই। এনপিপিএ-র এই সিদ্ধান্তে কিছু বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা আপত্তি জানাচ্ছিল। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে এনপিপিএ-র জুলাই মাসের নির্দেশিকা তথা সেই মোতাবেক নিয়ন্ত্রণও খারিজ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য ওষুধ প্রস্তুতকারক বহুজাতিক সংস্থাগুলো যখন আরও বেশি বেশি করে এই নীতির কারণে মুনাফা করবে তখন ভারতে ৪.১ কোটি মধুমেহ রোগে আক্রান্ত, হৃদরোগীর সংখ্যা প্রায় ৪.৭ কোটি, ১১ লক্ষ মানুষ ক্যান্সারে ও প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ এডসে ভুগছেন। সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে এই রোগীরা ও তাঁদের পরিবার দুর্দশায় পড়বেন।

গত ৩১শে জুলাই থেকে মোদি সরকার কারখানা আইন-১৯৪৮, ট্রেড ইউনিয়ন আইন-১৯২৬, শিল্প বিবাদ সম্পর্কিত আইন-১৯৪৮, ঠিকার শ্রমিক আইন-১৯৭১, এপ্রেন্টিস আইন ১৯৬১ থেকে শুরু করে সমস্ত আইনকে সংস্কার করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই আইনে সংস্কারের মধ্যে দিয়ে কার্যত শ্রমিকদের যতটুকু আইনী অধিকার ছিল তা-ও কেড়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত পাকা করা হলো। এর ফলে শুভার টাইম সময়সীমা ৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০০ ঘণ্টা করা হবে, যা বহু

কারখানা-শ্রমিকদের রক্ত-স্বাক্ষকে একেবারে নিঙরে নেবে সম্ভব নেই। এইসব সংস্কারের ফলে এখন ৩০০ জনের কম এমন কারখানাকে মালিকপক্ষ কোর্ট বা শ্রমকর্তা-অনুমতি ছাড়াই বন্ধ করে দিতে পারবে। আগে কোন কারখানায় ১৫০ জনের ১০ শতাংশ শ্রমিক মিলেই একটা ইউনিয়ন নথিভুক্ত করাতে পারত এখন ১৫০ জনে লাগবে কমপক্ষে তিরিশ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন। এগুলি সবই শ্রমিকের আশঙ্কায় হরণের দিকে আরো কয়েক কদম। মহিলাদের রাতের ডিউটির ক্ষেত্রেও আগে যে কিছু নিষেধাজ্ঞা ছিল তা শিথিল করা হয়েছে।

এই লেখা যখন লিখছি তার কিছুদিন আগেরই মোদি সরকার ১০০ দিনে পাঁচটি প্রবণতা পরিষ্কার। আমিরদের পক্ষে সত্যিই সে নিয়ে আসছে 'আছে দিন' নয় বার্তা। কিন্তু আম আদমির জন্য তা কিন্তু এক অশুভ ইঙ্গিতবাহী।

# আমেরিকায় বিবেকানন্দ :

## একটি ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা

কবিদ্ব চৌধুরী

৩০ জুলাই, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ পৌঁছলেন আমেরিকার শিকাগো শহরে। লক্ষ ধর্মমতসভায় যোগদান করা। ১৮৯৩-এর ১১-২৭ সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে যে ধর্মমতসভার আয়োজন করা হয়েছিল তার পিছনে ছিল কতগুলি ঐতিহাসিক কারণ। কেন হঠাৎ করে এমন একটি ধর্মমতসভার আয়োজন করা হল? কেনইবা বেছে নেওয়া হল ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দকে? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে অনুসন্ধান চালাতে হবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে মার্কিন অর্থনীতির বিকাশ ধারার মধ্যে।

১.

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুতগতির অর্থনীতির বিপুল বিকাশ ঘটে। ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকায় দ্রুত গঠনকার্য চলতে থাকে। শিল্পের বিরাট বিকাশ হয়। বিশেষ করে প্রসার ঘটে তৈল শিল্প, ইস্পাত শিল্প এবং রেলপথের। কর্পোরেশনগুলির মধ্যে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফলে অনেকগুলিরই কলঙ্কিত ঘটে। এই প্রতিযোগিতায় অধিকতর শক্তিশালী সংস্থাগুলি দুর্বল সংস্থাগুলিকে কুক্ষিপাত করে। তৈরি হয় 'ট্রাস্ট' নামক অতিকায় একচেটিয়া ব্যবসার।

শিল্পে যেমন সমৃদ্ধ হতে থাকল, তেমনিই দেশে শ্রমিকের যোগান হতে থাকল সমান হারে। জ্যাকসনের আমলে যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনি ব্যবসা প্রসারের জন্য ফাটকাবাজী শুরু হয়ে যায়। রেল কোম্পানিগুলি মার্কিন ও বিদেশিদের কাছ থেকে নেওয়া বিশাল অঙ্কের ঋণ ফেরত দিতে অস্বীকৃত হয়। ফলে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, শুরু হয় মন্দার খায়াপ বছরগুলি। পরবর্তী পাঁচ বছর প্রবল মন্দা চলতে থাকে। বেকারত্বও বেড়ে যায় ভীষণভাবে।

এই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে মিশেল বো লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬৯ থেকে

কবিদ্ব চৌধুরী

১৮৭৩-এর ৩০ ভাগের বেশি রেললাইন পাতা হয়েছিল; বর্ধন ক্ষমতাবাহী, শ্রম ক্ষমতার অপ্রতুলতা ও দাম বেড়ে যাওয়া একযোগে দেখা দিয়েছিল ওখন মূল্যস্বল্প অর্থনের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল, রেলপথ নির্মাণের কোম্পানিগুলি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, ব্যাঙ্কগুলি ফেল পড়েছিল এবং স্টক একচেত্রে গ্রাস করেছিল এক উন্মত্ত আতঙ্ক। যেহেতু ঢালাই লোহা উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা মুখ্য বাজার ছিল রেলপথ নির্মাণ, তাই ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যে ঢালাই লোহার মূল্য শতকরা ২৭ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। বেড়েছিল বেকারের সংখ্যা, কমেছিল মজুরি এবং সড়কের ধাক্কা পৌঁছে গিয়েছিল বস্ত্র ও গৃহ নির্মাণ ব্যবসায়। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যে ইংল্যান্ডে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল শতকরা ২৫ ভাগ; নেউলিয়া হয়ে পড়া ব্যবসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল (১৮৭৩-এ ৭,৪৯০; ১৮৭৫-এ ১৩,১০০); বেকারির সমস্যা তীব্রতর হয়েছিল। দ্রুত উৎপাদন হয়ে পড়েছিল বিপুল; ১৮৭৩ সালে কামারশালার মালিকেরা ২৫ এক টন রেল লাইন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু ব্যবহার হয়েছিল ৫,০০,০০০ টন এবং ১৮৭২ থেকে ১৮৮১-এর ভেতর রেল লাইনের দাম পড়ে গিয়েছিল শতকরা ৬০ ভাগ।" (বো। ২০০১:১৩৬-১৩৭)

"যুক্তরাষ্ট্রে রেলপথ নির্মাণের নতুন ঢেউ (১৮৭৮-এ ৪,০০০ কি.মি., ১৮৮২-এ ১৮,৬০০ কি.মি.) 'রেলপথ আতঙ্কের' মুখে জন্ম হয়ে পড়েছিল; ১৮৮৪ সালে রেলপথ নির্মিত হয়েছিল মাত্র ৬,০০০ কি.মি। ক্রমবর্ধমান নির্মাণ ব্যয় ও নিজেদের সত্তার প্রতিযোগিতার জীতাকালে রেলপথ নির্মাণের কোম্পানিগুলি অটকে পড়েছিল। ইউনিয়ন প্যাসিফিকের স্টকের দামে ক্ষয় নেমেছিল এবং তারই সাথে সাথে ক্ষয় নেমেছিল অন্যান্য অনেক রেলপথ ঋণপত্রগুলিতে। ব্যাঙ্কগুলি ফেল পড়েছিল এবং শিল্পে কর্মতৎপরতা হয়ে পড়েছিল শূন্য—অনেক শিল্পোদ্যোগ দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল, বেকারি বেড়ে গিয়েছিল ও অধিক পরিমাণে মজুরি কমে গিয়েছিল (যাতু শিল্পে শতকরা ১৫ থেকে ২২ ভাগ, বস্ত্রশিল্পে শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ)।" (পূর্বোক্ত : ১৩৭)।

যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদী শিল্পায়ন জন্ম দিয়েছিল লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের। এ দেশের সংকট কবলিত ক্ষেত্রগুলিতে প্রকৃত মজুরি পড়ে যাওয়ার ফলে শ্রমিক অসন্তোষ গাঢ় পেতে থাকে এবং জন্ম হয় কঠোর সংগ্রামের। এই পর্বে শ্রমিক শ্রেণির যেমন

বিকশিত হয়েছিল তেমনি পুঁজিবাদী শোষণ ও বঞ্চনার ফলেও শ্রমিক আন্দোলন বিকশিত হচ্ছিল এবং তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। গড়ে ওঠে ট্রেড ইউনিয়নস্। শুরু হয় সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন জন্ম নেয় ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। শ্রমিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৭-এর ভেতর 'নাইটস অব লেবারের' সদস্য সংখ্যা ১,১০,০০০ থেকে বেড়ে হয়েছিল ৭,২৯,০০০। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার (এ. এফ. এল)-এর সদস্য সংখ্যা ১৮৮৬-তে ছিল ১,০০,০০০; ১৯১২-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২,৫০,০০০।

শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশের ফলে বৃদ্ধি পায় সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও ধর্মঘটের সংখ্যা। ১৮৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দে যতগুলি ধর্মঘট হয়েছে তার মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের ধর্মঘটের সংখ্যা তুলনা করলে বোঝা যায় সংগ্রামে উদ্ভূত শ্রমিক চেতনাকে। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে মাত্র ৫০০ ধর্মঘট ও তালাবন্ধ হয়, আর এগুলিতে অংশগ্রহণ করেন গড়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মঘটের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০০ এবং যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ধর্মঘটের সংখ্যা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় বেশি বেড়ে যায়, সংখ্যাটি হয় ১৫৭২। যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যা হয় ৬ লক্ষ। ধর্মঘটের ফলে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে যেখানে জড়িয়ে পড়ে মাত্র ১৪৬৭টি প্রতিষ্ঠান, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে সেখানে জড়িয়ে পড়ে ১১৫৬২টি।

সে সময় শ্রমিকদের প্রতিদিন ১৪.১৬ বা ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হত। মিশরের ক্রীতদাস প্রথা থেকেও তা ছিল ভয়ানক। পাশাপাশি মজুরীর প্রকৃত মূল্য হ্রাস, চাকরির অনিশ্চয়তা, মালিকদের অত্যাচার, বেকারত্ব শ্রমিকসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষকে (একথা ইউরোপের ক্ষেত্রেও সত্য) ঠেলে দিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে। ফলে আন্দোলনে আন্দোলনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (এবং ইউরোপ)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের এই যন্ত্রণাদায়ক জীবনের ছবি বিবেকানন্দের লেখায় ধরা পড়েছে। বরং তাঁর চিঠিতে উঠে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন ও প্রশংসা। তাঁর ভাষায়, "আমেরিকা... সাধারণ লোকের উন্নতিবিধান করিতেছে। এ যেন... শ্রমজীবীগণের

দাবীদাৰী" (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭ : ৯৬-৯৭)। অথচ তিনি সে সময়কার আমেরিকায় সফট সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ববোধ ছিলেন। তিনি একটি চিঠিতে (২৭ জুন, ১৮৯৪) লিখেছিলেন, "এবার আমেরিকায় বড় দুর্ব্বলতার চলিতেছে, হাজার হাজার গরীব বেকার" (পূর্বোক্ত : ১৪৬)।

দ্বাদশ শতকের ৮০-র দশকের শেষভাগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এক অগাধ মন্দার মুখোমুখি হয়। এই মন্দার অবিরতাবের ফলে শ্রমিক, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি চরম দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে। বেকারির প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে দেশের যুবকসমূহকে এক অশুভ নৈরাশ্যের দিকে ঠেলে দেয়। একদিকে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছিল তেমনি সমাজের দুর্দশগ্রস্ত অন্যান্য শ্রেণীগুলিও প্রতিবাদে সোচ্চার হতে শুরু করেছিল। কলকারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট আন্দোলনে বাঁপিয়ে পড়ে। তাদের সাথে এসে যোগদান করে লক্ষ লক্ষ রেল ও গাশ্রমিক। ধর্মঘট আন্দোলন সবচেয়ে তীব্রতা লাভ করে পুলমান ও কোলোরাডোতে। আতঙ্কিত মার্কিন রাষ্ট্র শ্রমিক-জনতার সংগ্রামকে দমন করতে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে। এই রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে কিছু পরিমাণে দমন করা সম্ভব হলেও, মানুষের মনের মধ্যকার ক্ষোভে-আগুনকে নেভানো গেল না। শাসক প্রভুদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, অবিরাম বলপ্রয়োগ পীড়নের হাতিয়ার সহ বলপ্রয়োগের সমগ্র ব্যবস্থাদিকেই সীমাবদ্ধ ও দুর্বল করে ফেলে। তাই বলপ্রয়োগের পরিপূরক হিসেবে ১৮৮৬ সংগ্রামী শ্রমিক-জনতাকে বশে আনতে শাসক প্রভুরা ধর্মকে কাজে লাগাতে লাগলেন।

একাদশ মন্দার প্রেক্ষাপটে মার্কিন পুঁজিপতিরা এই পথটিকে বেছে নেয় এবং পাশাপাশি মানুষের মধ্যে একটি ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। সেই উদ্দেশ্যে শ্রমজীবী, নগরে, গ্রামে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি ধর্মীয় বক্তৃতা, আধ্যাত্মিক আলোচনা সভা, পুস্তক প্রকাশের কাজ শুরু হয়ে যায়। আমেরিকায় শাসন প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ প্রসঙ্গে আট ঘণ্টার কাজের লড়াই, শিকাগো শহরের সংগ্রাম এবং মে দিবসের ইতিহাস স্মরণযোগ্য। ধর্মের ছোট-বড় নানান আশ্রয়কে পদ সৃষ্টি করা শুরু হয়েছিল। একটা ধর্মীয় পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের আহ্বান জানিয়ে শিকাগো শহরে সতেরো

দিন ব্যাপী (১১ সেপ্টেম্বর - ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) এক বিশ্ব ধর্মমহাসভার আয়োজন করা হয়।

২.

জানি না প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের আমেরিকা ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থটি (Sketches of a Tour Round the World 1884) বিবেকানন্দকে প্রেরণা দিয়েছিল কিনা। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে বিশেষ ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা লালিত। ১৮৯৩-এর মে মাসে বোম্বে থেকে জাহাজে ওঠ করলেন যাত্রা। চীন ও জাপান হয়ে অবশেষে ২৫ জুলাই, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভাঙ্গুতারা পৌঁছলেন। তিনি জানতেন না তাঁর জন্য সেখানে কি অপেক্ষা করছে। ভাঙ্গুতার থেকে ট্রেনে পূর্ব দিকে যাত্রা করলেন। ৩০ জুলাই পৌঁছলেন শিকাগোতে। তাঁর সাথে ছিল সামান্য কিছু জিনিষপত্র, ১৭৯ পাউন্ডের মত অর্থ এবং অনিশ্চয়তা ও অসহায়তা। সে সময় বিশ্বমেলার জন্য শিকাগো শহরটিকে সাজানো হচ্ছিল। শহরে লোক উপচে পড়ছিল। ভারতবর্ষে সাধুরা যেমন পাছের তলায় শুয়ে ঘুমাতে পারে বা রাস্তার ধারে বসে ভিক্ষা করতে পারে—তা এ শহরে একেবারেই অসম্ভব। বিশ্বমেলার ধর্মসভার অধিবেশন তখনও প্রায় দেড় মাস বাকী। বিবেকানন্দ তখন বিশ্বমেলার ধর্মমহাসভায় ক্রিভাবে অংশগ্রহণ করা যায়—তার বোজ খবর নিতে শুরু করেন। তাঁর সামনে তখন তিন ধরনের সমস্যা ছিল—

১। ধর্মমহাসভায় অংশগ্রহণের জন্য যে পরিচয়পত্র থাকার দরকার, তা তাঁর কাছে ছিল না;

২। ধর্মসভার প্রতিনিধি হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার নির্ধারিত সময় তখন অতিক্রম করে গিয়েছিল।

৩। ধর্মসভার অনুষ্ঠান শুরু হতে বেশি দেরি ছিল না। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তা শুরু হবার কথা ছিল। অর্থাৎ বিবেকানন্দের হাতে তখন সময় ছিল খুবই কম।

এ ছে পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ মনে হয়েছিল তাঁর আমেরিকা যাত্রা বোধহয় ব্যর্থ হল। তিনি ছিলেন অপরিচিত ও অজ্ঞাত। তাঁর সাথে সে সময় যে সম্প্রদায়বাদের যোগাযোগ হয়েছিল তাঁরাও বিবেকানন্দকে দেখতে আসতেন মজা

না। একে তাঁদের টাকা পরাস্য দেবার প্রস্তাব উঠতো, তখনই তাঁরা পিছু হটে যেতেন। রাস্তার লোকেরা অবাক হয়ে দেখতেন এই অদ্ভুত জীবটিকে। মেলায় কোন কোন দর্শক বিবেকানন্দকে থাকা দিতেন এবং তাঁর গেকরা কাপড় ধরে টানটান করতো। কোনো এক শুভাষীর পরামর্শে তিনি আমেরিকার পূর্ব-উপকূলে বসন্ত শহরে যাওয়া স্থির করেন। কারণ শিকাগোর থেকে অনেক কম খরচে বসন্তে থাকা যাবে। রেলপথে তিনি বসন্ত যাত্রা করেন। অপ্রত্যাশিতভাবে রেলের সাথে আলাপ হয় এক প্রৌঢ়ার। তাঁর নাম ক্যামেরন এন্ট স্যানবার্ন, বয়স ৫৪ বছর। তিনি ছিলেন ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের 'ব্রিজ হেডোজ' নামক এক স্বামীর মালিক। এই স্যানবার্নের বাড়িতে তিনি আশ্রয় পান। স্যানবার্নের এই আশ্রয়দানের লক্ষ্যে একটি উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যটি কেন অর্থেই সন্দেহক নয়। তা প্রকাশ পেয়েছে বিবেকানন্দের চিঠিতেই : "এখানে [স্যানবার্নের আশ্রয়] থাকায় আমার এই সুযোগ হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউন্ড করিয়া যে বরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া দাষ্টেছে; আর তাহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বহুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া 'নাবাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছে!!!' (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭:৭৪)। কিন্তু এই কেট স্যানবার্নের সাহায্যেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক জন রাইটের সাথে বিবেকানন্দ আলাপ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। অধ্যাপক রাইট বিবেকানন্দের পাছ থেকে আর্থিক অনটন, ধর্মসভায় যোগদানের ইচ্ছা, পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সমস্যা চত্যান বিবরণ সম্পর্কে শোনে এবং তার সমাধানের জন্য যথাসাধ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। অধ্যাপক রাইট তাঁকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন—

১. বিবেকানন্দকে একটি পরিচয়পত্র লিখে দেন;
২. ধর্ম মহাসভার প্রতিনিধি নির্বাচক কমিটির সেক্রেটারিকে দেওয়ার জন্য একটি পত্র লেখেন;
৩. সভাপতি ড. ব্যারোজের ঠিকানা দেন; এবং
৪. শিকাগো যাবার রেলের টিকিট কিনে দেন।

অসাধারণতার কারণে বিবেকানন্দকে বারবার নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে পড়ে। এর আগেই অজিত সিং-এর দেওয়া তিন হাজার টাকার সাকুলেটরি নোট পাওয়া গিয়েছিল। এবার হুগলেন ব্যারোজের ঠিকানা বোর্স্টন থেকে জন রাগলেন কেটে দেওয়া টিকিটে চেপে বসলেন ট্রেনে। সেখানে সহযাত্রী এক

কবসারীর সাথে আগাগে এমনই মজে গেলেন যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্কে তিনি বিশেষ খেয়ালই রাখলেন না। শিকাগোয় যখন পৌঁছলেন তখন পকেটে হাত নিয়ে টেরপেলেন কারোজের ঠিকানাটি হারিয়ে গেছে। ফলে পড়লেন বিপদে। যখন তাঁর আধ-রাজকীর আতিথ্য পাওয়ার কথা ছিল, তখন শুধুমাত্র নিজের অসাবধানতার কারণে তাঁকে রাত কাটাতে হল রেল ইয়ার্ডের এক খালি বাস্তের মধ্যে। পরদিন সকালে শিকাগো শহরে পরিশ্রান্ত, একমুখ দাড়িগোফ ভর্তি, কৃষ্ণবর্ণের ময়লা ফেরা পোশাক পড়া এক অধৃত জীবকে ঘুরতে দেখা গেল। বিদেশ জ্বালার (!) ছুঁক্ট করতে করতে গৃহস্থের দরজায় গিয়ে পেলেন রূঢ় ব্যক্তির, অবজ্ঞা ও উপেক্ষা। এরকমই একসময় সাহসঘোর হাত বাড়িয়ে দিলেন এক মহৎপ্রাণ মানুষ। সেই মহিলার নাম ইলেন হেল। ড. ব্যারোজের চার্চের অন্যতম সদস্যা। তিনি বিবেকানন্দকে কেবল স্বাভাবিক বা আশ্রয়ই নিলেন না, সাথে করে নিয়ে গেলেন ধর্মমন্ত্রস্তম্ভার অফিসে। শুধু ইলেন হেলই নয় গাটা হেল পরিবারই হয়ে পড়লেন বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ। ইলেনকে ডাকতেন 'হাওয়ার চার্চ' এবং তাঁর স্বামী জর্জ হেলকে ডাকতেন 'ফলার, পোপ'। ইলেন (১৮৩৭-১৯৩০) ও জর্জ (?-১৯০০)-এর ছিল দুই কন্যা—মেরি হেল (১৮৬৫-১৯৩৩) এবং হারিয়েট হেল (১৮৭২-১৯২৯)। তাদের পরিবারেই থাকতেন হেলের দুই ভাণ্ডী—হারিয়েট ম্যাককিন্ডলে (১৮৬০-১৯৫৫) ও ইসাবেল ম্যাককিন্ডলে (১৮৬৩/৬৪-?)। এদের আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন ছাড়া বিবেকানন্দ আরো কিছু করতে পারতেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এরা সারা জীবন বিবেকানন্দের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা জমিয়ে এসেছেন। এখানে কলা দরকার যে এদের সাহায্য ছিল একেবারেই ইহলৌকিক কেন নৈবিক বা ঐশ্বরিক নয়।

ধর্মমন্ত্রস্তম্ভা গুরুর আগের পর্বে তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন ক্যাথরীন স্যানবার্ন, অধ্যাপক জন ব্রাইট, কেট উডস্ এবং বুল পরিবারে। সময়টা ছিল ১৮৯৩-এর অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই পর্বে তাঁর বক্তৃতা ও কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করলে কয়েকটি আগ্রহজনক বিষয় বেরিয়ে আসবে। ক্যাথরীন স্যানবার্ন বিবেকানন্দকে আশ্রয় নিলেও, এ আশ্রয় ছিল বিবেকানন্দের কাছে যথেষ্ট অপমানকর। স্যানবার্ন তাঁর বন্ধুদের সামনে বিবেকানন্দ নামক 'অধৃত ভারতীয় জীবটিকে প্রদর্শন করে আনন্দ পেতেন। বিবেকানন্দের

১৮৯৩ (১০ অগাস্ট, ১৮৯৩) তা প্রকাশ পেয়েছে। এ হেল অবমান্নাকর অবস্থা না হলেও বিবেকানন্দ একপ্রকার বাধ্য হয়েই স্যানবার্নের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। শাক্য শাখ্যার ব্যবস্থা যেহেতু হয়ে যাচ্ছে তাই, "এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে।" (পূর্বোক্ত)। তাঁর যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল আর্থিক কারণে। ভক্তরা ৭৩৫ 'ভগবানের লীলাকে মহিমাম্বিত' করার চেষ্টা করুন না কেন, বিবেকানন্দ কিছু হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন বিদেশে (বা স্বদেশে) অর্থ না থাকলে কি ধর্মপ্রচার পড়তে হয়। ফলে 'ভগবানের লীলা'র উপর ভরসা না করে তিনি ঐহিক জগতের উপর, মানুষের উপরই বেশি ভরসা করেছিলেন। কিন্তু পারার্থীকই জয়গান গেয়েছেন ইশ্বরের, মানুষের নয়।

২৪ অগাস্ট (১৮৯৩) পর্যন্ত তিনি ছিলেন স্যানবার্নের খামার বাড়ি 'ব্রিজ মেডোজ'-এ। এখানে ছিল প্রায় দুই সপ্তাহ। আর্থিক সমস্যার প্রাথমিক ধাক্কাটা দাঁড়া সামলে নিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের এই যে, ২০ অগাস্ট আলাসিকা পত্রিকাকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি স্যানবার্নের প্রতি কোন ধরনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি। বরং তিনি তাঁদের ব্যঙ্গ করে বলেছেন, "... এখানকার লোকে ইন্দোনেশি খুব যত্ন করিয়া থাকে, কেবল অপরকে তামাসা দেখাইবার জন্য; অর্থ সাগুয়া করিবার সময় প্রায় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়।" (বিবেকানন্দ, ১৯৭৭:৭৩)। এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন, "এখানে আমার খরচ ভয়ানক হইতেছে। তোমার স্বরূপ আছে, তুমি আমার ১৭০ পাউন্ড নোট ও নগদ ৯ পাউন্ড দিয়াছিলে। এখন দাঁড়াইয়াছে ১৩০ পাউন্ড। গড়ে আমার এক পাউন্ড করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে। এখানে একটা চুরটের দামই আমাদের দেশের পাট আনা।" (পূর্বোক্ত)। এটা বোঝা যায় না কি করে তাঁর প্রতিমনি এক পাউন্ড খরচ হত? তিনি থাকতেন স্যানবার্নের বাড়িতে। খাবার সেবান থেকে পাওয়া যেত। তাহলে? সম্ভবত '৩০০ টাকার দামের শীতের পোশাক' (পূর্বোক্ত : ৮২), 'পাট আনা দামের চুরট' ও আরও নানা অনুপ্রবেশিত কারণেই তাঁর গড়ে এক পাউন্ড করে খরচ হত।

এখানে একটি তথ্য বেশ নজর করে। এই চিঠির (২০ অগাস্ট, ১৮৯৩) ৮৩র্থ অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছেন যে, বৃদ্ধা (যদিও স্যানবার্ন মোটেই বৃদ্ধা ছিলেন না) এ বাড়িতে থাকায় তাঁর এক পাউন্ড করে বেঁচে যাচ্ছে। অথচ একটা মাত্র

অনুচ্ছেদ পূর্বেই তিনি একই ঘটনার ক্ষেত্রে ঘটমান বর্তমানের ত্রিরাপদ ব্যবস্থার করেছেন। তাঁর মতো দার্শনিক জ্ঞানী ব্যক্তির ক্ষেত্রে একি বিশ্রুটি! এই চিঠিটির আরও কয়েকটি দিক ভাবন্যপূর্ণ—

ক. চিঠিটির তাঁর মনের মধ্যে যে ঝড়-ঝঙ্কা চলছিল তার একটি ছবি (বর্ণিত হলেও) পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, “এখানে [আমেরিকায়] আসিবার পূর্বে যে-সব সোনার স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা ভাঙিয়াছে।” “শত শতবার মনে হইয়াছে, এ দেশ হইতে চলিয়া যাই...” আবার এই চিঠিতেই তিনি ঘোষণা করেছেন, “মরি বাঁচি, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।” কিন্তু চিঠির শেষ প্রান্তে শোনা যাচ্ছে হতাশার সুর : “যদি তোমরা [আলাসিকা ও তাঁর কক্করা] আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পারো, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও।” (পূর্বোক্ত : ৮২)।

খ. বিব্রিত হৃত হয় এটা দেখে যে একটা বিরাট সত্যকে তিনি নির্বিকারভাবে গোপন করেছেন। আমেরিকা ভ্রমণের প্রায় সমস্ত অর্থ তিনি পেয়েছিলেন রাজা-মহারাজা ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে। অথচ আলাসিকাকে চিঠিতে তিনি তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। “গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনী উপর কোন ভরসা রাখিও না। অর্থদের মধ্যে জীকণী শক্তি নাই—তাহারা একরূপ মৃতকল্প বলিলেই হয়...। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের ঘরে ঘরে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। ... ভগবান অনন্ত শক্তিমান; আমি জানি তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন।” (পূর্বোক্ত : ৭৯)। তিনি আলাসিকাকে আরও লিখেছেন, “রাজা-রাজধানীর দ্বারা মহৎকর্ষ হইবার আশা অতি অল্প।” (পূর্বোক্ত : ৭৫)। “আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না।” (পূর্বোক্ত : ৮০)। রাগের মাথায় বা বৌকের বশে ধনীদের গ্রাহ্য করি না বলা গেলেও তাদের গ্রাহ্য করিতেই হয়। তাই কয়েক মাস বাদেই তিনি আলাসিকাকে বন্ধ চিঠি (১১ জুলাই, ১৯৮৪) লেখেন তখন সেখানে তাঁকে এর উটো পরামর্শই দেন : “একখানা ফটো রামনাদের রাজাকে উপহার দিও...। যেতড়ির রাজার সঙ্গে সর্বদা পত্রব্যবস্থার রাখবে।” (বিবেকানন্দ, ১৯৭৭:১৬৯)। তিনি গুণু পরামর্শই দেননি তাঁর কবিতা ‘মৃতকল্প’ সম্পত্তিবানদের সাথেও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখেছেন। আলাসিকাকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতে তিনি লিখেছেন, “আমি মইশুরের

বান্দা। একখানা পত্র লিখেছি ও কয়েকখানা ফটোগ্রাফ [বিবেকানন্দের নিজের] পাঠাইয়াছি।” (পূর্বোক্ত)। এছাড়াও অজস্র স্থানে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ও নির্দেশ হল গণ্যমান্যদের নৈতা কর (১৯৭৭:৩৩৫), সম্পত্তিবান ও রাজাদের সাথে বন্ধুত্ব ও গোপ্যগোপ রাখা দরকার। (১৯৭৭:১৬০, ১৬৯, ২০১, ২৪৫, ৩০৪)।

গ. এটি চিঠিটির (২০ আগস্ট, ১৮৯০) পাশাপাশি যদি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে যাত্রায়ে পদে ‘আমার সমরনীতি’ বক্তৃতাটি পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে তাঁর তুলে দায়দায় কমতা অসীম। “আমার সমরনীতিতে তিনি প্রাক-ধর্মমহাসভা পর্যন্ত খোঁজাচাওয়া করতে গিয়ে বলেছেন, “... আমি আমেরিকায় পৌঁছলাম। টাকা খরচা অনেক অতি অল্পই ছিল—আর ধর্মমহাসভা বসিবার পূর্বেই সব খরচ হইয়া গেল। বাকী শীত আসিতেছে। আমার গুণু গ্রীষ্মোপযোগী একখানি পাতলা পাবশেষ ছিল। একদিন আমার হাত হিমে আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই ঘোরতর শীত প্রধান দেশে আমি যে কি করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। ... তখন আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল।” (বিবেকানন্দ, ২০১২:৫:৭৩-৭৪)। সমস্যা হল তাঁর ২০ আগস্ট ১৮৯০-এর চিঠিতে তিনি লিখেছেন, তাঁর কাছে আছে ১৩০ পাউন্ড (ডলার নয়)। অর্থের পরিমাণটি একেবারেই অল্প নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি এই চিঠিতে শীতের হৃত থেকে বাঁচবার জন্য কোটের অর্ডার দেওয়ার কথা আশ্রয়গ্রহণ করেন। যার দাম পড়বে ৩০০ টাকা বা তার বেশি। (বিবেকানন্দ, ১৯৭৭:১৬২)। ফলে ‘শীত প্রধান দেশে... কি করিব’ তার ব্যবস্থাটি তিনি না-লোভাবেই করেছিলেন। আরও সুস্পষ্ট করে বলা যায় যে, যাত্রাজে শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্জনুভূতি পাবার জন্য আমেরিকায় প্রাক-ধর্মমহাসভা পূর্বে যে দূরব্যবস্থার ছবি তঁর আঁকতে চেয়েছিলেন তার অধিকাংশটাই বাস্তবের সাথে মেলে না। ধর্মমহাসভার (১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০) পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ করে অগাস্টের দ্বিতীয় দশকে থেকে তাঁর অল্প ও আশ্রয়ের অভাব ঘটেছিল মোটেই। এই পর্যন্ত উপর বর্ণিত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

৭ আগস্ট, ১৮৯০ প্রথম সপ্তাহ বিজ্ঞানবীন্দী কেট স্যানকর্ন-এর কাছে আশ্রয় লাভ। ২৫ আগস্ট পর্যন্ত সেখানেই থাকেন।

২৬-২৭ আগস্ট অধ্যাপক হেনরী রাইটের

আতিথ্যগ্রহণ।

২৮ অগাস্ট লেখিকা ফেট উডসের গৃহে এক সপ্তাহ বাস করেন।

সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, ৮ সেপ্টেম্বর শিকাগো যাত্রা। রাইট ট্রেনের টিকিট কেটে দেন।

৯ সেপ্টেম্বর ড. ব্যারোজের ঠিকানা স্থিরিয়ে ফেলার মাল গাড়ীতে রাবি যাপন।

১০ সেপ্টেম্বর সম্পত্তিবান হেল পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ।

অর্থাৎ 'আমার সমগ্রনীতি'তে উল্লেখিত বা জীবনী গ্রন্থগুলিতে এসময়ের (অগাস্ট মাস ও সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখ অবধি) দরিদ্র ও দুঃস্থদের যে কৰ্ম পাওয়া যায়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

বাস্তবে বিবেকানন্দ ছিলেন তিন সপ্তাহের কাজকাছি সময়। এই সময়ে তিনি মোট এগারোটি বক্তৃতা দেন। ২২ অগাস্ট শাবোর্ন রিকমেন্টেরী কর উইমেন-এ তিনি যে বক্তৃতা দেন তার বিষয় ছিল, "ভারতের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী।" ২৭ অগাস্ট অ্যানিঙ্কোয়াম চার্চে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল একই। ২৮ অগাস্ট 'হিন্দুধর্ম ও হিন্দুপ্রথা' শীর্ষক বক্তৃতাটি করেন সালেমের ওয়েসলি চার্শেলে। ২৯ অগাস্ট সাহিত্যিক ফেট ট্যানট উডস-এর বাগানে 'ভারতীয় কলক-বালিকাদের জীবনরীতি, ক্রীড়াকৌতুক, ক্রিয়াশিক্ষা' ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। ৩ সেপ্টেম্বর সালেমের ইস্টচার্চে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "ভারতের ধর্ম ও দরিদ্র স্বদেশবাসী।" সারাটোয়া স্প্রিংস-এ আমেরিকান সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে তিনি ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর বক্তৃতা দেন। প্রথমটি হল 'ভারতের মুসলিম শাসন' এবং দ্বিতীয়টি হল 'ভারতে রূপোর ব্যবহার'। মেরি লুই বার্ক তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বিবেকানন্দের বসন্ত অঙ্কলে বসবাস ও বক্তৃতা প্রদানের খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে সে সময় প্রকাশিত হতে শুরু করে। অর্থাৎ প্রাক-ধর্মসভা পর্বেই তিনি খানিকটা প্রচার পেয়ে গিয়েছিলেন।

লক্ষ্য করার বিষয় হল এই পর্বে তাঁর বক্তৃতার যতটুকু অংশ পাওয়া যায় তা

১৮৯৩-১৮৯৪ সালে। ভারত সম্পর্কে আমেরিকাবাসীর সামনে যে তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন সেগুলি বহু ক্ষেত্রেই অর্থসত্য বা নির্জলা মিথ্যা।

ক অধ্যাপক হেনরি রাইট-এর স্ত্রী শ্রীমতি রাইট তাঁর মাকে (শ্রীমতি রাইট-এর মা) বিবেকানন্দের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটি চিত্রিত (২৯ অগাস্ট, ১৮৯৩) লিখেছেন যে, বিবেকানন্দ ১৮ বছর বয়সেই সম্মান গম্য গ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মানীদের কোন সংঘ বা সম্পত্তি থাকে না। তাঁরা শিক্ষা পূর্বক করতে পারেন না। তাঁরা কেবল বসে থাকে আর অপেক্ষা করে, গবেষণা না কেউ তাদের শিক্ষা দেয়। (Burke, 2000:1:88)। ঘটনা হল বিবেকানন্দ তাঁর নিজের সম্পর্কে শ্রীমতি রাইটকে যদি এই তথ্য দিয়ে থাকেন, তা নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ ১৮ বছর বয়সে বিবেকানন্দ এক এ. ক্রাসের ছাত্র ছিলেন। চোখে তাঁর বিলেতে আইন নিয়ে পড়তে যাবার স্বপ্ন। দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দ কলীপুর উদ্যানবাটি পর্বে ও কলকাতার মঠে থাকাকালীন দল বেঁধে শিক্ষা করতে গিয়েছেন। তৃতীয়ত, সম্মানীরা সর্বস্বত্বাঙ্গী বলে ঘোষণা করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সত্য নয়। কারণ ভারতে সম্পত্তিবান ধর্মগুরু ও সম্মানীদের অভাব এখনও ছিল না, এখনও নেই। চতুর্থত, কলকাতার মঠ ছিল একটি সংঘ। তাই বিবেকানন্দের সংঘ ছিল না এটা একেবারেই ঠিক নয়। তা ছাড়া তাঁরা পরবর্তীকালে আধুনিক চর্চে রামকৃষ্ণ মিশন তৈরি করেছিলেন—সে কথা তো সকলেরই জানা।

খ অধ্যাপক রাইটের স্ত্রী মেরী রাইটের লেখা একটি প্রবন্ধে বিবেকানন্দের যে বক্তৃতা পাওয়া যায় তা বিস্ময়কর। মেরী রাইট লিখেছেন, বিবেকানন্দের মতে, "... the Mohammedans came upon them [Hindus] slaughtering and killing : slaughtering and killing they overran them." (Burke, 2000:1:32)। অর্থাৎ মুসলিমরা হিন্দুদের উপর হত্যালীলা চালিয়েছিল। বিবেকানন্দ নাকি এটাও বলেন যে, হিন্দুরা কখনও মহিলাদের হত্যা করে না। ১৮৯৩-৯৪ মন্ত্রবিদ্রোহে মুসলিমরাই মহিলাদের হত্যা করেছিল। (পূর্বোক্ত : 35)। ভারত ইতিহাসের সাক্ষ্য কিন্তু অন্যরকম। প্রথমত, জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালানো, ধ্বংস ও হত্যার মুসলিম শাসকদের মত হিন্দুরাও কিছু কম যায় না। নৈরাসিক গল্পগুলির মধ্যে এর যেমন প্রমাণ রয়েছে, তেমনি পরবর্তী ইতিহাসের

মধ্যেও হিন্দু শাসকদের অত্যাচার ও অবিচারের অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে নারী ও শূদ্রের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার, শাসকের বৌদ্ধহত্যা ও কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হর্ষের মন্দির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয়ত, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় শুধুমাত্র মুসলিম সেপাইরাই ইংরাজ শিশু ও মহিলাদের হত্যা করেছিল এবং হিন্দু সেপাইরা মহিলাদের হত্যা করেনি—এসব তথ্য একেবারেই অনৈতিহাসিক। তৃতীয়ত, ‘হিন্দুরা মহিলাদের হত্যা করেন না’—এ বক্তব্য যে কতটা অসত্য তা সতীদাহের সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়।

গ. ২৯ অগাস্ট, ১৮৯৩-এর ‘ইভনিং নিউজ’-এ তাঁর ২৮ অগাস্ট-এর বক্তৃতার উপর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, “He [বিবেকানন্দ] explained the old custom of women being burned on the death of their husbands, on the ground that they loved them so that they could not live without the husband. They were one in marriage and must be one in death.” (Burke. 2000:1:48)। অর্থাৎ বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা অনুযায়ী “মৃত স্বামীর সাথে একই চিতায় স্ত্রীর সহমরণে যাওয়া ভারতের একটি প্রাচীন প্রথা। ভারতে স্ত্রীগণ স্বামীকে এত ভালোবাসেন যে স্বামী ছাড়া তাঁরা বাঁচতে পারেন না। বিবাহের মধ্যে দিয়ে তাঁরা এক হয়েছেন, মৃত্যুতেও তাঁরা এক হবেন।” এইভাবে তিনি মহিমাযিত করলেন সতীদাহের মত একটি দমনবীর কু-প্রথাকে এবং নির্বিচারে সমর্থন জানালেন। পরবর্তীকালেও তিনি সতীদাহের প্রতি সমর্থন ও এর গুণগান চালিয়ে গেছেন (বিবেকানন্দ। ২০১২:১:৩০)। কথাসিঙ্গী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘নারীর মূল্য’ নামক প্রবন্ধে সতীদাহ প্রথাকে পতিপ্রেমের উজ্জ্বল প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টাকে তীব্রভাবে বাদ্য করেছিলেন। (চট্টোপাধ্যায়। ১৪০০ বাংলা : ৪: ৫৭১)।

ঘ. ২৯ অগাস্ট (১৮৯৩)-এর “ডেইলি গেজেট”-এ ওয়েসলি চার্চে তাঁর বক্তৃতার উপর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী—বিবেকানন্দের বক্তব্য হল : “ভারতে স্বামীর স্ত্রীদের কখনই মিথ্যা কথা বলে না এবং তাদের উপর অত্যাচার করে না” (Burke. 2000:1:49)। লক্ষ্য করার বিষয় হল, তাঁর এই ধরনের দাবির পিছনে হয়তো এই মনোভাব কাজ করেছিল যে, বিদেশিদের কাছে ভারতবর্ষকে যে কোন প্রকারে মহিমাযিত করা। কিন্তু মিথ্যা প্রচারে কি কোন

দেশের মতো বুদ্ধি করে নাকি হতমান করে?

ম. পূর্ণোক্ত রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, বিবেকানন্দের আমেরিকা আগমনের উদ্দেশ্য হল—শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞান সংগ্রহ করা। কিন্তু ঘটনা হল—অন্যত্র তিনি আরোও আগমনের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন।

৬. ১ সেপ্টেম্বর (১৮৯৩) ‘সালেম ইউনিং নিউজ’-এর থেকে জানা যাচ্ছে যে, বিবেকানন্দের বক্তব্য হল, ভারতীয় বিদ্যালয়গুলিতে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয় না। (Burke. 2000:1:51)। উনিশ শতকের বাংলার বিদ্যালয়, টোল ও মাদ্রাসার শাস্তিদানের ঘটনাগুলি বিবেকানন্দের দাবির বিপরীত কথাই প্রমাণ করে। বিবেকানন্দ নিজেই একবার বিদ্যালয়ে জনৈক শিক্ষক দ্বারা দৈহিক শাস্তি পেয়েছিলেন।<sup>১</sup> (গম্ভীরানন্দ। ২০১২:১:৪১)।

৭. সেপ্টেম্বর সারাটোগাতে তিনি শেষ বক্তৃতা দেন। ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় খালবানি থেকে ট্রেন ধরেন এবং পরদিন অর্থাৎ ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শিকাগোয় উপস্থিত হন। হারিয়ে ফেলেন প্রয়োজনীয় কাগজ। ফলে পড়েন বিপদে। হেল পার্কার-এর সে বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। তাঁরই ড. ব্যারোজের সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দকে প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করার স্বীকৃতিপত্র আদায় করিয়ে দেন। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় ১৭ম ধর্ম মহাসভার অধিবেশন।

৩.

শিকাগো ধর্মমহাসভায় কী বললেন বা কী করলেন তা বলার আগে ধর্মসভার একটি সংক্ষিপ্ত ছবি এখানে উপস্থিত করা দরকার।

ইতালিতে তখন নবজাগরণের প্রাধান্য। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের বিকাশে এসেছে দ্রুতগতি। সেই পর্বে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে জেনোয়া (ইতালি)-র খ্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬) স্পেনের রানী ইসাবেলার সাহায্যে ভারত অভিমানে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি ভারতে পৌঁছানোর পরিবর্তে উপস্থিত হন (আমেরিকায়) বাগমাং একটি অংশ সান সালভাদোর-এ। কলম্বাসের আমেরিকায় পদার্পনের

টীকা ১. জনৈক শিক্ষক নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ)-র কন এমনভাবে টেনেছিলেন যে তাঁর কন ছিঁড়ে যায় ও বাহ্য অঙ্গভুক্ত রক্তে ডিগে যায়। (সদ্য মহেন্দ্রনাথ। ২০০৭:১:৩০)

৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো শহরে একটি বিশ্বমেলার বা বিশ্বকলসী প্রদর্শনীর (World's Columbian Exposition)। এই প্রদর্শনী জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় ১ মে, ১৮৯৩। মেলা চলে ঐ বছরের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। এখানে বিভিন্ন প্রদর্শনীর পাশাপাশি ২০টি বিষয়ে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের বিষয়গুলি ছিল ব্যাপক ও চিত্তকর্ষক, যেমন— ধর্ম, সরকার ও আইনসংস্কার, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, গৃহ ও অস্ত্রোপচার, সঙ্গীত, সংবাদপত্র, নারীপ্রগতি, মিতাচার ইত্যাদি।

বিশ্বমেলার প্রাক্কনস্ফলটি ছিল শিকাগো শহরের দক্ষিণ অংশে মিশিগান হ্রদের ধারে জ্যাকসন পার্কে এবং বর্তমানে যেখানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত সেখানে। চার্লস এইচ. ওয়াকার ছিলেন এই বিশাল মেলার ডাইরেক্টর এবং শ্রায়লো এন. হিগিনবোথাম ছিলেন সভাপতি। বহু স্থপতিবিদ, শিল্পী ও পেশাদার মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এই মেলার সাথে। বেশ কয়েক বর্গমাইল জুড়ে ছিল এই মেলা প্রাক্কনটি। শিকাগো শহরের এই অংশটিকে কলা হত 'শ্বেতনগর' (White City)। বিরাট বিরাট বাড়ি ও রাস্তা তৈরি হয়েছিল এই উপলক্ষে। রাস্তা বাড়ি ও রাস্তাগুলিকে আলোকিত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। সে কারণেই এই 'শ্বেতনগর' নামকরণ। অধিকাংশ বাড়িগুলি বানানো হয়েছিল অস্থায়ীভাবে। সে সময়ের দুটি মাত্র বাড়ির অস্তিত্ব এখনও রয়েছে—মেমোরিয়াল আর্ট প্যালেস (আর্ট ইনস্টিটিউট) এবং আর্ট প্যালেস (বর্তমানে মিউজিয়াম অব সায়েন্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি)। এই 'মেলোরিয়াল আর্ট প্যালেস (আর্ট ইনস্টিটিউট)-এ ধর্মমতসভা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিবেকানন্দ এখানেই তাঁর 'বিখ্যাত' শিকাগো বক্তৃতা দেন।

বিশ্বমেলার বর্ষবিধ বিষয়ে মধ্যে ধর্মমতসভা (Parliament of Religions) ছিল অন্যতম অংশ। বিবেকানন্দ ভক্তগণ ধর্মমতসভাকে হেভাবে দেখানোর চেষ্টা করেন তা একেবারেই সত্য নয়। ধর্মমতসভার সংগঠকদের যে উদ্দেশ্য ছিল, তার সাথেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ সংগঠকদের কাছে ধর্মসভার যে গুরুত্ব বিবেকানন্দ ভক্তদের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তার কোন মিল দেখতে পাওয়া যায় না। ধর্মসভা সংগঠিত করার ধারণাটি শিকাগোর বিখ্যাত আইনজ্ঞ চার্লস ক্যারল বনির মধ্যে দিয়ে উঠে এলেও এর পিছনে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক

শেখাপাটের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাকে অস্বীকার করা যায় না। পূর্বেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। বনির সভাপতিত্বে বিশ্বমেলার একটি অংশ হিসেবে ধর্মমতসভার পরিচালনার জন্য ১৭ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়—World's Congress Auxiliary of the Columbian Exposition। এই কমিটির অধীনে আরও একটি কমিটি গঠিত হয়—General Committee of the World's Congress Auxiliary on Religions Congresses। এই দ্বিতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ফ্রেডারিক জন হেনরি ব্যারোজ। কমিটির পক্ষ থেকে জুন, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ধর্মমতসভার অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনকে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য তিন হাজারেরও বেশি চিঠি পাঠানো হয়। সেই ৮১১৩০ ধর্মসভার উদ্দেশ্যগুলি বর্ণিত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম প্রধান বিষয়গুলি হল—

১. নাস্তিকতা ও জড়বাদী দর্শনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং আন্তিকতার সপক্ষে প্রচার চালানো।
২. বিভিন্ন ধর্মের মতোক্তির সত্যগুলিকে জনসাধারণের সামনে চিত্তকর্ষকভাবে তুলে ধরা।
৩. বর্তমান যুগের প্রধান সমস্যাগুলি বিশেষ করে মিতাচার, শ্রম, শিক্ষা, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির উপর ধর্ম কি আলোকপাত করতে পারে, যোগ্য ব্যক্তিদের উপস্থাপনার তার সম্ভাবনা করা।

বিবেকানন্দের জড়ীভূত শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'মহগ্রন্থ' বিবেকানন্দ ও গমকালীন ভারতবর্ষ-তে লিখেছেন : "তিনি [বিবেকানন্দ] দেখেছিলেন, তাঁর দেশ ধর্মের পক্ষে দাঁড়াবার মানুষ নেই। শিকাগো ধর্মমতসভায় ভারত থেকে প্রতিনিধি গাছে, কিন্তু তাঁরা জৈন, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, মুসলমান বা খ্রিয়জফিস্ট, মূল হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ নন। তাঁরা না-হিন্দু, প্রায়-হিন্দু, আলোকিত-হিন্দু কিন্তু হিন্দু নন। এখনো পর্যন্ত হিন্দু-ভারতের মধ্যে যেটুকু স্বধর্মপ্রীতি ছিল, তা ভিতরে-ভিতরে শুষ্ক ও অপমানিত হয়ে উঠেছিল, এবং সেই অপমানবোধ তীব্রতর হয়েছিল দক্ষিণ

ভারতে। দক্ষিণীরাই এই তরুণ সন্ন্যাসীর মধ্যে হিন্দু ধর্মের যোগ্য প্রতিনিধিকে দর্শন করতে পেরেছিল; মাদ্রাজী-তরুণদের হাত দিয়ে 'নবীন' ভারত সেদিন তার নবীন নায়ককে অর্ঘ্যদান করেছিল।' (বসু, ২০১১:১৯)। শঙ্করীকবুর এই বক্তব্য যে যথেষ্ট পরিমাণে ত্রুটিপূর্ণ ও আপত্তিকর তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। কারণ—

প্রথমত, 'তিনি দেখেছিলেন'-এর দেখাটা কার দেখা—বিবেকানন্দের না শঙ্করীপ্রসাদ বসুর? যদি বিবেকানন্দের হয় তাহলে তথ্যটি ভুল। কারণ শিকাগো মহাসভা সম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণাটি ছিল ভাসা ভাসা। শিকাগোয় ধর্মমহাসভা হবে—এইটুকু ছাড়া তিনি আর কিছুই জানতেন না। আবার এই 'দেখাটা' যদি শঙ্করীকবুর হয় তাহলে তা অসত্য। কারণ শঙ্করীকবু ভালোভাবেই জানেন যে কোন কোন ব্যক্তি ধর্মমহাসভায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, শঙ্করীকবুর মতে 'অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ মূল হিন্দু সম্প্রদায়ের' প্রতিনিধি ছিলেন না। মূল হিন্দু সম্প্রদায় বলতে কী বোঝানো হয়—তার কি কোন ব্যাখ্যা তিনি দিতে পেরেছেন? না। করং দেখে নেওয়া যেতে পারে ভারতবর্ষ থেকে মহাসভায় অংশগ্রহণকারী কারা ছিলেন এবং তাঁরা কোন ধর্মবিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ভারত থেকে মোট ২০ জন প্রতিনিধি ধর্মমহাসভায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ১৩ জন সশরীরে মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন—

১. জানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, থিরোসফিস্ট, এলাহাবাদ।
২. হেবিনবর্তনে ধর্মপাল, থেরাবাদী বৌদ্ধ, কলকাতা।
৩. রবার্ট এ. হিউম, খ্রিস্টান মিশনারি, মাদ্রাজ ও নিউ জ্যাকেন।
৪. প্রভাপ মঞ্জুমদার, ব্রাহ্ম, কলকাতা।
৫. কলবন্ত ভাউ নাগারকার, ব্রাহ্ম, বোম্বে।
৬. লক্ষ্মীনারায়ণ, হিন্দু, লাহোর।
৭. নরসিংহচর্চ, হিন্দু, মাদ্রাজ।
৮. মরিস ফিলিপস, খ্রিস্টান মিশনারি, ব্যাঙ্গালোর।
৯. জিন্দারাম, হিন্দু, মজফফরনগর।
১০. মিথুধরাম, হিন্দু, মুলতান, পাঞ্জাব।

১১. জীন সোরাবজী, খ্রিস্টান, বোম্বে।
১২. বীরচাঁদ গান্ধী, জৈন, বোম্বে।
১৩. স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দু, কলকাতা।

যখন ১৩ জনের মধ্যে বিবেকানন্দ ছাড়াও আরও চারজন হিন্দু ছিলেন। এই ১৭ জন ছাড়াও আরও ৭জন ভারতীয় শিকাগো মহাসভায় সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও লেখা পাঠিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এনারা হলেন—

১. এস পার্থসারথি আরেশ্বর, হিন্দু, মাদ্রাজ।
২. মোহনদেব, হিন্দু, লাহোর।
৩. মহিলাল নাভুভাই দিবেদী, হিন্দু, বোম্বে।
৪. পুরুষোত্তম কলকৃষ্ণ বোশী, হিন্দু, মারাঠী ও সংস্কৃত কবি।
৫. জামশেঠজী জিন্দাজী মোদী, পার্সী, বোম্বে।
৬. টি. জে. স্টুট, খ্রিস্টান মিশনারি।
৭. টমাস ই. স্টেটার, খ্রিস্টান মিশনারি, ব্যাঙ্গালোর।

(চট্টোপাধ্যায়, ২০০৭:৮৭-৮৮)।

১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত আর্ট ইনস্টিটিউটের কলম্বাস হলে ধর্ম মহাসভার সূচনা হয়। এই হলেই প্রধান প্রধান বক্তৃতা আরোজন করা হত। কলম্বাস হলে সর্বমোট ৪০০০ জন শ্রোতা অংশ নিতে পারতেন। আর্ট ইনস্টিটিউটে কলম্বাস হল ছাড়াও আরও কতগুলি ছোট ছোট বক্তৃতা কক্ষ ছিল। সেগুলিতে অন্যান্য শাখার মিটিং ও সভা হত। এই ছোট সভাসমূহে ১০০ থেকে ৩০০ জন শ্রোতাকে স্থান দেওয়া যেত। ১৫টি শাখা ছোট সভায় নিয়ে বিজ্ঞান শাখার সভাও ছিল এমনই একটি ছোট সভা। মূল সভায় বিবেকানন্দ মোট পাঁচটি এবং শাখা সভায় তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। (Chattopadhyaya, 2011:40)।

৪.

নরসিংহচর্চ দত্ত থেকে স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠার যাত্রাপথটিতে অনেকেরই অংশগ্রহণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু প্রধান ভূমিকা ছিল বিবেকানন্দের নিজের। তিনি নিজেই ছিলেন নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনকে কেন্দ্র

করেই শুরু হয়েছিল এই প্রচারণা। বিবেকানন্দ এটা বুঝেছিলেন যে, ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে পাশ্চাত্য ভ্রমণের সংসাপত্র তাঁকে সার্বজনীন স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করবে। এই ভাবনা থেকেই তাঁর আমেরিকা যাত্রা। বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে, বহু মানুষের সাহায্য ও করুণা পেয়ে তিনি সুযোগ পেলে ধর্মসভায় বক্তৃতা দেবার। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ শিকাগো শহরে আর্ট ইনস্টিটিউটের কলদ্বার হল বিবেকানের অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা দিলেন। ভক্ত জীবনীকরগণ সেই বক্তৃতা দানের ঘটনাকে এমনভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জনসমক্ষে উপস্থিত করলেন—যা অত্যন্ত বেকাদারক। একই সাথে তাঁরা কোনও কোনও প্রসঙ্গে সত্যকে গোপন করেছেন। বিবেকানন্দকে মহান করার জন্য হতমান করেছেন অন্যান্য ভারতীয়া বক্তাদের। বিবেকানন্দ তাঁর শিকাগো বক্তৃতায় কী বলেছিলেন বা আমাদের দর্প করার মতো উপাদান তার মধ্যে কতটুকু আছে কিংবা এই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের গল্পটা কতটা গ্রহণযোগ্য ইত্যাদি প্রশ্ন উঠতেই পারে।

ভক্তি যে কী ভয়ঙ্কর তা বোঝা যায় বিবেকানন্দের জীবনীকরদের লেখা পড়ে। শিকাগোতে প্রথম দিনের বক্তৃতা শুনেই তিনি আমেরিকানদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় বক্তার পরিণত হয়েছিলেন—এমন দাবি কেবল ভক্তরাই করতে পারেন। ভক্তজীবনীকার প্রমথনাথ বসুর দাবি, “তাঁদের [বিবেকানন্দ] বক্তৃতা শেষ হইবার সভার অধিকাংশ লোক তাঁদের অনুরাগী ও তীব্র মতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী তাঁদের পদানত হইল।” (বসু, ২০১১:১০১৯)।

বিবেকানন্দের ইংরাজী জীবনীতেও প্রায় একই কথা পাওয়া যায়। (EWD, 1997:2:26-27)। প্রকৃতপক্ষে ভক্তদের প্রচারের মূল ভিত্তি ছিল বিবেকানন্দের চিঠিতে প্রকাশিত আত্মপ্রশংসাতন্ত্রি। তিনি আলাসিকাকে একটি চিঠিতে (২ নভেম্বর, ১৮৯৩) লেখেন, “আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল, আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আরও দু-এক কথা বলিয়া একটি বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ব্রাহ্মবৃন্দ সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে যেন তাল্য ধরিয়া যায়। পরদিন সব বয়সের অগণে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতা এই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল; সুতরাং তখন সমগ্র

আলাসিকা আমাকে জানিতে পারিল।” (বিবেকানন্দ, ১৯৭৭ : ৯২-৯৩)। তিনি ১৮৯৪-৯৫ একটি সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : “এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিক শব্দশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন।” (পূর্বোক্ত, ৯৩)।

এক বছরব্যয় বিষয় হল, ১১ সেপ্টেম্বর ধর্মসভায় কেবল বিবেকানন্দই গণতাল ও অভিনন্দন পাননি। শিকাগো ট্রিবিউনের (১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) রিপোর্ট থেকে জানা যায়—কার্ডিনাল নিকনস, জাপ্তের আর্চবিশপ, ড. আলফ্রেড এমারীও যথেষ্ট করতালি দ্বারা অভিনন্দিত হন। (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৭:৯৭)। এল. পি. মার্সের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি বংশপাণ্ডে মজুমদার প্রবল করতালি (wildest applause) পেয়েছিলেন। (পুণ্ডিক এবং sil, 1997:92)। ক্যারোলের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কনফুসীয় দার্শনিক প্রতিনিধি পাং ক্যাং যু সবচেয়ে বেশি করতালি ও অভিনন্দন পাইছিলেন। (Burke, 2000:1:80)। এই প্রসঙ্গে ড. রাজাপোপাল চট্টোপাধ্যায় লেখেন, “[মেরী লুই] বার্ক তাঁর বইতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শিকাগো বক্তৃতার সম্বন্ধে কেবল একটি শিকাগোর সংবাদপত্রের প্রশংসা জোগাড় করতে পেরেছেন পাঁচটি বিভিন্ন কাগজ খেঁটে। সেই প্রশংসটিও আবার বার্কের পাহাশই নয় কারণ তাতে স্বামীজীর দেহসৌষ্ঠব ও পোশাকের প্রভাব মহিলাদের কাছে তাঁর আশ্রয়তার কারণ বলে লেখা হয়েছে।” (২০০৭:৯৭)। এই রিপোর্টে বক্তৃতার সময় সংক্রান্ত কোনও প্রশংসা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ‘পাঁচ মিনিটেই অর্ধেক পৃথিবী তাঁর পদানত হ’ল বা ‘তিনি মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছেন’ বা ‘দর্শন সব কাগজ বলতে লাগল যে বিবেকানন্দের বক্তৃতা এই শ্রেষ্ঠ’—এই প্রশংসার একটিও ঠিক নয়।

৫.

১১ সেপ্টেম্বর কলদ্বার হল—এ যে বক্তৃতাটি নিয়ে এত ঢাক পেটানো হয়, সেটা খানেকো কী? বার্ক চারটি সংবাদপত্র ও ক্যারোলের রিপোর্টের ভিত্তিতে এই বক্তৃতাটি একটি অবয়ব দান করেছেন। বার্কের গ্রন্থে প্রকাশিত এই ইংরাজী বক্তৃতাটি (2000:1:83)-র বাংলা তর্জমা এইরকম—

“ও আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ব্রাহ্মবৃন্দ, [করতালি] আজ আপনারা আমাদের

যে চমৎকার অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, তার উত্তর দিতে উঠে আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর যে প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সমাজ দেখা গিয়েছে, পৌত্তম্য [বুদ্ধ] বার একজন সদস্য, সেই সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সব ধর্মের ধর্ম প্রসূতি, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যার শাখা মাত্র, সেই [হিন্দু] ধর্মের নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সবশেষে, সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের হিন্দু মানুষের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই মঞ্চের কয়েকজন বক্তাদেরও ধন্যবাদ জানাই, যারা আপনাদের বলেছেন যে দূর-দেখপত বিভিন্ন মানুষ এখানে যে পরমতসহিবৃত্ততার ভাবটি দেখছেন তাঁরা সেটিকে বহন করে দেশে দেশে নিয়ে যাবেন। এই চিন্তাটির জন্য আমি তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যে ধর্ম জগৎকে পরমতসহিবৃত্ততা ও সার্বক্ষিক মতগ্রহণ—উভয় শিক্ষা দিয়ে এসেছে—আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গর্ববোধ করি। আমরা কেন্দ্রীয় বিশ্বজনীন সহনশীলতাই নয়, সব ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী exclusion শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলেও গৌরব বোধ করি [হততালি]। যে দেশটি পৃথিবীর সকল ধর্মের এবং দেশের নিপীড়িত এবং উদ্বাস্তদের আশ্রয় দিয়ে এসেছে, আমি সেই দেশের বলেও গর্ববোধ করি। আমি সর্বদা আপনাদের জানাচ্ছি, আমরাই ইহুদিদের সবচেয়ে বীতি কেশধরদের বন্ধে গারপ করে রেখেছি, যে বছর রোমান উৎপীড়নে তাদের পবিত্র মন্দির টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সে বছরই তাদের অবশিষ্টাংশ দক্ষিণ ভারতে আসে এবং আমাদের [মধ্যে] আশ্রয় নেয়। জরথুষ্ট্রের মহান দেশের বংশধররাও আমাদের ধর্মের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, এবং আজও যারা তাদের প্রতিপালন করেছে, তাদের জন্যও আমি গর্বিত।

বাতৃগণ, প্রত্যেক হিন্দু শিশু প্রতিদিন যে জোড়াটি আবৃত্তি করে তারই কয়েকটি পঙ্ক্তি আপনাদের শোনাবো [বা উদ্ধৃত করবো]। এই জোড়াটি আমি খুব ছেলেরা থেকেই আবৃত্তি করে আসছি এবং ভারতের কোটি কোটি লোকে এটি প্রত্যহ আবৃত্তি করে, যা অবশেষে রূপান্তরিত হয়েছে :

'যেমন বিভিন্ন স্থানে উৎস থেকে বিভিন্ন নদী শেষে সমুদ্রের জলে নিজেরা মিলিয়ে যায়, তেমনই, হে প্রভু, নিজ নিজ রুটির বৈচিত্র্যবশত সকল বা

কবিদ্য চৌধুরী

কুটিল, যে পথেই মানুষ চলুক না কেন, তুমিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।'

এই সম্মেলনে, যেটি এবাবৎ অনুষ্ঠিত মহিমামণ্ডিত সমাবেশসমূহের অন্যতম, নাটকই একটি ইঙ্গিত, পৃথিবীর কাছে একটি ঘোষণা গীতার সেই মহৎ বাণীর—

'যে যে-ভাব আশ্রয় করে আসুক না কেন, আমি তাকে সেইভাবেই দেখা দিয়ে থাকি। সকলেই বিভিন্ন পথে সংগ্রাম করছে, কিন্তু শেষে তাদের পথ আমার কাছেই নিয়ে আসবে।'

সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং এগুলির কেশবর ধর্ম অত্যাচারিত্ব এই সুন্দর পৃথিবীকে কঙ্কাল ধরে অধিকার করে রেখেছে। এরা পৃথিবীকে হিসেব পূর্ণ করেছে, বারবার মানুষের রক্তে নিভু করেছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে ও সমগ্র দেশকেও হতাশায় ডুবিয়েছে।

এই ভীষণ পিশাচটি যদি না থাকত, তাহলে মানব সমাজ আজকের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত হত। [এই বাক্যটি মেরী লুই বার্ক বাদ দিয়েছেন]।

কিন্তু এদের সময় শেষ হয়েছে, এবং আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি, আজ এই সভায় সকলে সমগত পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের সম্মুখার্থে যে ঘণ্টাধ্বনি নিদানিত হল, সে ঘণ্টাধ্বনি এই অত্যাচারিত্বের অন্তিমসময় সূচনা করল [হততালি], তারবারি অথবা লেক্সীমুবে অনুষ্ঠিত সর্বকম নির্ধারিতের মৃত্যু ঘোষণা করল, এবং একই লক্ষ্যে অভিযুক্ত অথচ বিভিন্ন পন্থের পথিক শ্রাতৃগণের মধ্যে সকল নির্মম ভাবের শেষ ডেকে আনল [হততালি]।<sup>১০</sup>

বিবেকানন্দের ভাষ্যের পূর্ণাঙ্গ পাঠটির প্রয়োজন এই কারণেই যে 'বাণী ও রচনা' এই পাঠের কোনও কোনও অংশ বাদ গেছে। বর্তমান অনুবাদের নিম্নরেখাঙ্কিত বাক্যাংশগুলি 'বাণী ও রচনা'য় নেই। কেন নেই? ইহুতো এ কারণেই যে, সেই বাক্যাংশগুলি অত্যন্ত আপত্তিকর ও অস্বস্তিকর। যেমন, 'বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম হল হিন্দু ধর্মের শাখা'—এ বক্তব্য যে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়—তা কলবার

টীকা ২. বার্ক কর্তৃক নির্মিত বিবেকানন্দের ভাষ্যটির বহনুবাদ করেছেন ড. প্রভাচন্দ্রপাল চট্টোপাধ্যায়। (চট্টোপাধ্যায়। ২০০৭ : ৯৪-৯৬)।

অপেক্ষা রাখে না। তাঁর বক্তব্যের অন্যান্য অংশগুলিও কিছু কম অস্বস্তিকর নয়।

৬.

বিবেকানন্দের 'বাপী ও রচনা' (২০১২)-র প্রকাশিত মহাসভায় প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতাটি (অভ্যর্থনার উদ্ভব, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)-র সাথে যদি আলাপ চলানো যায়, তাহলে পাঠকের মনে সন্দেহ, সংশয় ও প্রশ্নের আবির্ভাব ঘটবেই। প্রথম অনুচ্ছেদে রয়েছে,

"পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে [আমেরিকাবাসী ও ধর্মসভার সংগঠক] ধন্যবাদ জনাইতেছি। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।" (বিবেকানন্দ। ২০১২:১:৭)।

হতবাক হতে হয় এসব লেখা পড়ে। আশ্চর্যের মা বুদ্ধির কী দুঃখজনক প্রচেষ্টা। 'পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি-সমাজের পক্ষ' বলতে তিনি কী বোঝাতেন? নিঃসন্দেহে তা স্পষ্ট নয়। ভারতীয় সন্ন্যাসীরা বহুদিকভিত্তিক—সেখানে বেদান্তবাদীরা যেমন রয়েছেন, তেমনই আরও বহু ধরনের সন্ন্যাসীও রয়েছেন। কীসের ভিত্তিতে তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসী-সমাজকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে চিহ্নিত করলেন? দ্বিতীয় বাণীটি আরও ভয়ঙ্কর। যেখানে তিনি হিন্দু ধর্মকে 'সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।<sup>১</sup> সমস্যা হল 'হিন্দু' শব্দটিই একটি অগাঠীন শব্দ। প্রাচীন ভারতে শব্দটি প্রায় অপরিচিত ছিল। আবার কেনও ঐতিহাসিক বা সমাজবিজ্ঞানী বা নৃতাত্ত্বিকই তখন বা এখন মনে করেন না যে, হিন্দু ধর্ম থেকেই সকল ধর্মের জন্ম। অন্যান্য ধর্মের মানুষের পক্ষে এই ধরনের দাবিকতা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। সুতরাং বিবেকানন্দের এ ছেন দাবি একবারেই অস্বাভাবিক ও ভিত্তিহীন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন,

"যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভূক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা

টীকা ১. বিবেকানন্দের ইংরেজী ভাষায় হিন্দু ধর্মকেই 'সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। (EWD. 1997 : 1 : 417)।

সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'একত্বশব্দ' (ভাবার্থ : বহিষ্করণ, পরিবর্তন) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভূক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি।" (বিবেকানন্দ। ২০১২: ১:৭)।

তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে তিনটি দাবি তোলা হয়েছে—

- ১) হিন্দুধর্ম চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়ে আসছে।
- ২) হিন্দুধর্ম সকল ধর্মকেই সত্য বলে মনে করে।
- ৩) 'একত্বশব্দ' শব্দটির সমার্থক শব্দ সংস্কৃতে নেই।

প্রথম দাবিটি সম্পর্কে বলা দরকার হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত কেনও কোনও গোষ্ঠী/সম্প্রদায় পরমতসহিষ্ণুতার কথা বললেও, অধিকাংশেই অসহিষ্ণুতার পরিচয় কম দেয়নি। বহিরাগতদের ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য, অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। যেমন, ধরা যাক চার্বাক দার্শনিক ও চার্বাক দর্শনের উপর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের (হিন্দু) আক্রমণের কথা। চার্বাক দর্শনকে বৈদিক দার্শনিক ও নৃপতিগণ কেবল মৌখিক দিক থেকে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হননি, এই দর্শনকে সুযোগমতো বিকৃত করেছেন, এমনকি বলপ্রয়োগও করেছেন। চার্বাক দর্শনের পুঁথিগুলিকে ধ্বংস করে, দার্শনিকদের হত্যা করে তাঁরা ভারতবর্ষের মাটি থেকে এই দর্শনকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মহাত্মতারতের শান্তিপূর্বে যুক্তিগতের অভিযোজন অনুষ্ঠানে চার্বাক-বোধের ঘটনাটি এখানে স্মরণযোগ্য। (বসু, রাজশেখর। ১৩৯৪ বাংলা : ৫৫৬-৫৫৭)।

হিন্দু ধর্মের (ব্রাহ্মণ্যধর্ম) অন্যতম চিন্তাগত ভিত্তি হল উপনিষদ। এই উপনিষদের সামাজিক অংশটি কেনম ছিল? "বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম উন্নততর মানুষ হিসাবে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছিলেন। যেখানে বলা হয়েছে এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ, তুমিও ব্রহ্ম আমিও ব্রহ্ম। এই তুমি-আমির মধ্যে কিন্তু প্রমোদনীয় মানুষের পড়েন না। জ্ঞানোন্মত্ত উপনিষদে চণ্ডালকে কুকুর ও শূকরের সমগোষ্ঠীয় বলা হয়েছে। শঙ্করাচার্য, তাঁর মতে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জ্ঞাতিপ্রথাকে কিন্তু মিথ্যা বলেননি। শ্রুতদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার যে সব উৎকট ব্যবস্থাপত্র মনু দিয়েছেন সেগুলির সবকটিই শঙ্কর অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেছেন, শূদ্ররা

তার রক্ষণে সর্ববিধ শ্রম নয়। বৌদ্ধধর্ম ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে বেদ (জ্ঞান) ও কৃষি পরম্পরের শ্রেষ্ঠ।" (ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। ২০০০ : ৮৯)।

প্রাচীন উপনিষদগুলির রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রাষ্ট্রশক্তির বিকাশ ঘটেছিল। আবির্ভাব ঘটেছিল যোনেটি মহাজনপদ (রাষ্ট্র হিসেবে বিকশিত হবার প্রাথমিক পর্ব)। এদের মধ্যে অলম্বী, বৎস, কোশল ও মগধ বুকের জীবদ্দশাতেই শক্তিময় রাষ্ট্র পরিণত হয়েছিল। এদের আবির্ভাবের ইতিহাস হল সংস্কারগঠকে বঞ্চিত করে মুন্নিমের শক্তি ও সম্পদের বৃদ্ধির ইতিহাস। অবিরাম সংঘাত ও মৃত্যুর ইতিহাস। বিবেকানন্দ হয় সে ইতিহাস জানতেন না অথবা জানলেও তাকে ভুলে গিয়ে অহতুক প্রাচীন ভারত ও হিন্দু ধর্মের পরিমা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছেন।

বিবেকানন্দের দ্বিতীয় দাবিটিও সমান পরিমাণে ভাঙা। হিন্দু ধর্ম কখনই অন্য ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণুতা দেখায় না বা প্রাচীন অতীতেও দেখত না এবং অন্য ধর্মকে সত্য বলেও মনে করে না। কারণ এদের ভাষাটি হল—‘স্বর্গে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ’। ইন্ডের কাছে শ্বেতকার আর্যরা প্রার্থনা করতেন, “হে ইন্ড! তোমার গুণবর্ণ বহুদিগের সহায় হও এবং কৃষ্ণবর্ণকে নিঃশেষ কর।” (N. K. Dutta, চন্দ্র কর্তৃক উদ্ধৃত। ১৯৯৬ : ১৭)। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র কেবল শূদ্রদের উপরই অত্যাচার চালায়নি। কৃষিজীবী কৈশ্যগণও ছিলেন ভয়ঙ্কর অত্যাচারে জর্জরিত। চণ্ডালদের দিকে তাকানোও ছিল একপ্রকারের পাপ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম (হিন্দু ধর্ম) বিদ্রোহী বৌদ্ধ ধর্মকে কখনোই সত্য বলে মনে করেনি। বরং সুযোগ পেলেই বৌদ্ধদের উপর নির্বাচন চালিয়েছে। শৈব রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধদের হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট প্রচার করেছিলেন, “বৌদ্ধ মাত্রই কথ্য”। মাদুরার হিন্দু রাজা অজিতনারায়ণ গৌড়া জৈন ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মস্তক চূর্ণ করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের কৃতিত্ব হল কুমারনুর সমস্ত বৌদ্ধমন্দিরগুলির বিলুপ্তি ঘটানো। (চন্দ্র। ১৯৯৬ : ২৩)। আর ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে হিন্দু ধর্মের অসহিষ্ণুতা সর্বজনবিদিত। বিবেকানন্দ নিজেই এই ধরনের অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে খুন ও ধ্বংসের অভিযোগ করেছেন। শুধু তাই নয়, মুসলিমরাই মহিলাদের খুন করতে পারে, হিন্দুরা নয়—এহেন মন্তব্যও তিনি করেছেন। (Burke. 2000 : 1 : 32, 35)।

তৃতীয় দাবিটি যে সম্পূর্ণই ভাঙা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দাবিটি ছিল exclusion শব্দটিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করা যায় না। অর্থাৎ ‘যখন’, ‘সেই’ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ভাষার মধ্যে রয়েছে। এই শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে exclusion বা বিতাড়ন, বর্জন, বহিষ্করণ ইত্যাদি বোঝানো হয়। গ্রীক, রোমান, আরবদের ‘যখন’ বা ‘সেই’ অভিহিত করার রীতি ছিল। ‘সেই’ শব্দ বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল তুর্কি, পারসিক এবং আরবদের ক্ষেত্রে। এই ‘সেই’ শব্দটি যথেষ্ট প্রাচীন এবং স্বপ্নে সর্বপ্রথম শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। যে সব লোক অন্য-ভাষী এবং আর্য সংস্কৃতির সাথে যাদের পরিচয় ছিল না, প্রথমত তাঁদের সম্বন্ধেই শব্দটি ব্যবহৃত হত। (খাপার, মুখিয়া, চন্দ্র। ১৯৮৯ : ১৯)। এর পাশাপাশি সমাজচ্যুত করা, একঘরে করে নেওয়ার বিধান ইত্যাদি কি বিবেকানন্দ জানতেন না?

বক্তৃতার চতুর্থ অনুচ্ছেদ ও শেষ অনুচ্ছেদে শিকাগো মহাসভার উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করে বলেছেন, “পৃথিবীতে এভাবে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাসম্মেলন এই ধর্ম-মহাসভা গীতা প্রচারিত সেই অপূর্ব মন্তেরই সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে, ...”। শেষ অনুচ্ছেদে ঘোষণা করেছেন, “আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্ম-মহাসম্মেলনের সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোচ্ছৃঙ্খলতা, ভয়ভারি অথবা লেঙ্কনী মুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্বাতন এবং একই লক্ষ্যের নিকে বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসন্তোষের সম্পূর্ণ অবসানের স্বার্থ ঘোষণা করুক।” (বিবেকানন্দ। ২০১২:১৮)। এমন কথা ধর্মমহাসভার কলেও পরবর্তীকালে তিনি এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেন। তিনি একটি চিঠিতে লেখেন, “খ্রিস্টধর্ম অপর ধর্মোপেক্ষ মহত্তর এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই ধর্মমহাসভার আয়োজন হইয়াছিল।” (গম্ভীরানন্দ। ২০১১:২:২১)। অন্য সময় একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “আমার মনে হয়, ভারতের কাছে বিধর্মীদেরকে বিদূষকুলে দেখানোই ছিল ধর্ম মহাসভার উদ্দেশ্য।” (পূর্বোক্ত)।

বিবেকানন্দ-স্বীকৃতিস্বরূপের মধ্যে যারা ভক্তির দ্বারা চালিত হয়ে কলাম ধরেছেন, তাঁদের গ্রন্থগুলি পরিণত হয়েছে স্ফুটিকার সংকলনে। ফলে বিবেকানন্দের প্রকৃত ছবিটা চলে গেছে আড়ালে। তাঁরা বিবেকানন্দকে যেভাবে দেখতে চান, সেভাবেই দেখেছেন। বক্তৃতা সত্যতা সেখানে থাক বা না থাক—

আমেরিকায় বিবেকানন্দ : একটি কুঁকিপূর্ণ যাত্রা

তাদের কিছু যায় আসে না। ফলে তাঁর মেধা ও প্রতিভা কল্পনার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায়। বহুনিষ্ঠ আলোচনা হয় অবহেলিত। মানুষ বিবেকানন্দ থেকে যান অচর্চিত, অজ্ঞাত।

শিকাগো ধর্মসভার পরবর্তীপর্বে বিবেকানন্দ 'ভারতের কাজ'-এর জন্য অর্বসংগ্রহ ও প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন। সরাসরি অনুদান প্রার্থনা না করে, অর্থ রোজগারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ধর্মসভার পরের দুই মাস তিনি শিকাগোতেই থেকে যান। এই দুই মাসে শিকাগোতে প্রধানত যাদের বাড়িতে থাকতেন তাঁরা ছিলেন জন লায়ন ও জর্জ হেন। এরা দু'জনেই যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞান। বিবেকানন্দ বরাবরই এই বিজ্ঞানদের সাথেই মেলামেশা করা পছন্দ করতেন। তাঁর চিঠিতে তাই পাওয়া যায় : "শহরের অনেক সুন্দর সুন্দর আবাস আমার কাছে উন্মুক্ত। সব সময়ই আমি কারও না কারও অতিথি হচ্ছি।" (বার্ক, ২০১১ : ১ : ১৫৭)। এই পর্বে শিকাগো ও পার্শ্ববর্তী কয় আরগায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতাগুলির বেশ কয়েকটি সাময়িক সংবাদপত্রে রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়। মেরী বার্ক এর মধ্যে কয়েকটি 'রিপোর্ট' সংগ্রহ করতে পেরেছেন। রিপোর্টগুলির মধ্যে কোন কোন রিপোর্ট বিবেকানন্দের পক্ষে একেবারেই সমর্থক নয়। যেমন, ডেইলি ট্রি প্রেস (৯ অক্টোবর, ১৮৯৩)-এ প্রকাশিত সংবাদে বিবেকানন্দের বক্তৃতাকে প্রীতিমত বিরক্তিকর ও দণ্ডপূর্ণ হিসেবে সমালোচনা করা হয়েছে। (Burk, 2000:1:170)।

#### এভান্সটন, ইলিনয়

শিকাগো ইভনিং জার্নাল (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)-এর ঘোষণা থেকে জানা যায়—ইভান্সটনে তাঁর তিনটি বক্তৃতার কথা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ৩ ও ৫ অক্টোবর এই বক্তৃতা সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সাপ্তাহিক কাগজ ইভান্সটন প্রেস ও ইভান্সটন ইন্ডেক্স-এ বিবেকানন্দের বক্তৃতা সংক্রান্ত রিপোর্টে তাঁর গৌরবক সৌন্দর্য ও বাস্তবতার প্রশংসা পাওয়া যায়। সভাগুলির প্রবেশমূল্য ছিল ৫০ সেন্ট। এই বক্তৃতায় তিনি 'আত্মার পুনর্জন্মবাদ' নিয়ে কথা বলেন। (বার্ক, ২০১১ : ১ : ১৫১ - ৫২)।

#### স্টুটিং, ইলিনয়

স্টুটিং-এ তিনি ৭ অক্টোবর বক্তৃতা দেন। এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 'স্টুটিং ডেইলি প্রেস' (৯ অক্টোবর, ১৮৯৩)-এ। এই রিপোর্টে বক্তৃতার প্রশংসা করা না হলেও তা আগ্রহ স্বত্বক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে তিনি 'জাতিভেদ ব্যবস্থা'-কে সমর্থন করেছিলেন। "the mildly defended the caste system of India..." (Burk, 2000:1:170)।

#### শিকাগোর কিরে আসা

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি শিকাগো শহরের হেল পরিবারেই আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। ততদিনে বক্তৃতা দিয়ে টাকা রোজগারের কল্যাণকৌশল তিনি কিছুটা শিখে গেছেন। এবং রোজগার করতেও শুরু করেছেন। সর্বভাগ্যী সম্রাসী বিবেকানন্দ শিকাগো থেকে কেট উডসকে ১০ অক্টোবর ১৮৯৩ লিখেছেন, "এখন আমি শিকাগোর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি—আমার বিবেকনায় তা বেশ ভালই হচ্ছে। ৩০ থেকে ৮০ ডলারের মধ্যে প্রতি বক্তৃতায় পাওয়া যাচ্ছে; সম্প্রতি ধর্মমতসভার দরুন শিকাগোর আমার নাম এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে, এই ক্ষেত্রেটি ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। ... গতকাল স্টুটিং থেকে কিরেছি, সেখানে একটি বক্তৃতায় ৮৭ ডলার মিলেছে। এই সপ্তাহে প্রতিনিয় আমার বক্তৃতা আছে। সপ্তাহের শেষে আরও আমন্ত্রণ আসবে বলে আমার বিশ্বাস।" (বিবেকানন্দ, ১৯৭৭:৯০)।

অক্টোবর (১৮৯৩) মাসের শেষের দিকে বা নভেম্বরের শুরুতে তিনি হ্যাটেন লাইসিয়াম লেকচার ব্যারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু এই বক্তৃতা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা তিনি নিদারুণভাবে প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে চিঠিতে তিনি সেই দুখে জানিয়ে লিখেছেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁকে শোষণ করেছে। ২০ নভেম্বর (১৮৯৩) তিনি আমেরিকার অন্যান্য অংশে ভ্রমণ করার জন্য শিকাগো পরিত্যাগ করেন। প্রথমে গেলেন উইসকন্সিন (Wisconsin) রাজ্যের ম্যাডিসনে।

#### ম্যাডিসন, উইসকন্সিন

ম্যাডিসনে তিনি একটি ভাষণ দেন। শিরোনাম ছিল Religions of India (ভারতের ধর্ম)। ২১ নভেম্বর উইসকন্সিন স্টেট জার্নাল (১৮৯৩) এই বক্তৃতার উপর একটি প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বিবেকানন্দের দাবি হল অমৃত, গোড়ামী,

কুসংস্কার ও মূর্তিপূজার স্থান ভারতের ধর্মগুলিতে নেই।' দি ডেইলি কার্ডিয়ান এই বক্তৃতার উপর লেখা একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছে : "No Hindoo man is dishonest, no Hindoo woman unchaste." (Chattopadhyaya. 2012:8)। অর্থাৎ "কোন হিন্দু পুরুষ অসৎ নয় এবং কোন হিন্দু নারী অন্তী নয়।" উপরোক্ত পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত (বিবেকানন্দ) বক্তব্য পাঠ করলে যে কোন ভারতীয় পাঠক চমকে উঠবে, কারণ—

ক. 'ভারতীয় ধর্মগুলিতে পৌড়ামী, কুসংস্কার বা মূর্তিপূজা নেই'—ভারত সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত ধারণা প্রচার তুলনাইন।

খ. দ্বিতীয় রিপোর্টটিতে প্রকাশিত তাঁর বক্তব্যটি যতদূর সম্ভব ততটাই ভ্রান্ত।

মিনেয়াপোলিস, মিনেসোটা

২১ নভেম্বর (১৮৯৩) তিনি মিনেয়াপোলিস-এ পৌঁছন। এখানেই তাঁর প্রথম বরফ দেখার অভিজ্ঞতা হয় ও প্রথম ঘোড়ার চড়ার সুযোগ হয়। ২৪ নভেম্বর ইউনিটেরিয়ান চার্চে 'হিন্দু ধর্ম'-এর উপর বক্তৃতা দেন। 'মিনেয়াপোলিস স্টার' পত্রিকায় ২৫ নভেম্বর এই বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হয়। বক্তৃতাটি যথেষ্ট প্রশংসিত হয়। ২৬ নভেম্বর, রবিবার (১৮৯৩) ইউনিটেরিয়ান চার্চে আবার বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি খ্রিস্ট ধর্মকে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করেন। এই ধর্মকে তিনি 'দোকনদারীর ধর্ম' বলে চিহ্নিত করেন। (Burke. 2000:1:196)। বিপরীতে হিন্দু ধর্মকে বৌদ্ধবোধিত করার জন্য বলেন যে, হিন্দুরা ভগবানকে উপাসনা করে শুধু ভালোবাসার জন্য। ঈশ্বরের কাছ থেকে কি পাওয়া যাবে তার জন্য নয়। (পূর্বোক্ত : 197)।

ডে ময়ন, অইওয়া

২৭ ও ২৮ নভেম্বর (১৮৯৩) সেন্টাল চার্চ অব ক্রাইস্ট-এ সম্মানীয় তিনি দুটি বক্তৃতা দেন। ২৮ নভেম্বর অইওয়া স্টেট প্রেসিডেন্টে ২৭ তারিখে দেওয়া বক্তৃতার একটি বিবরণী প্রকাশিত হয়। এখানে বলা হয়, বিবেকানন্দ সকল ধরনের জাতিপাণ্ডের উচ্ছেদ এবং অর্থ স্পর্শ করার বা বিবাহ করার

টীকা : "Bigotry and superstition and idle ceremony, he declared, have no place in the religions of India." (Chattopadhyaya. 2012:8).

কনিষ্ঠ চৌধুরী

অনুমতি তাঁর নেই। তিনি এখানে যে বক্তৃতা দিতে এসেছেন তার উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষে বিন্যাস স্থাপন ও সাধারণ মানুষকে দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করা। (Burke. 2000:1:205)।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, অর্থ স্পর্শ করা তাঁর মতো সম্মানীয় পক্ষে অনুমোদিত নয়—এ কথাটি কতটা অর্থপূর্ণ তা ভাবা প্রয়োজন। কারণ তিনি বক্তৃতার যোগ্য করেছেন যে, আমেরিকায় তাঁর আসার উদ্দেশ্যই হল—অর্থ সংগ্রহ করা। শুধু তাই নয়, তিনি অর্থ শুধু রোজগারই করেননি তা ব্যাঞ্চেও জমিয়েছেন—ফলে 'অর্থ স্পর্শ না করার' গল্পটি একেবারেই দাঁড়ানি। আবার এটাও বোঝা যায় না যে, আমেরিকায় বক্তৃতা দিলে ভারতে কি করে বিন্যাস গড়ে উঠতে পারে।

বিবেকানন্দের বক্তব্য অনুযায়ী সম্মানীয় বিবাহ অনুমোদিত। বিষয়টির কিছর প্রচার প্রয়োজন। 'সম্মানীয় বিবাহ' প্রসঙ্গটির শিকড় খুঁজ রয়েছে রামকৃষ্ণের কমিনী-কান্তনের ধারণার সাথে। পুরুষতান্ত্রিক ডাক্তার অনুযায়ী 'নারী নরকের দ্বার', 'আধ্যাত্মিক সাধনার পথে বিরতি বাধা' আর তাই সম্মানীকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়, 'কামিনী'র থেকে দূরে থাকতে হয়। রামকৃষ্ণ ছিলেন ভয়ঙ্কর নারী বিদ্বেষী। বতই তিনি 'মা মা' করে সারাজীবন কাটান না কেন 'কথামৃত' গ প্রকাশিত তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নারী সম্পর্কে অমৃত নয় কেবল গরলের সন্ধানই পাওয়া যায়? বিবেকানন্দ আমেরিকায় বিরাট সংখ্যক মহিলা শ্রোতাদের সামনে এসব কথা বলার সাহস না পেলেও সম্মানীয় পক্ষে বিবাহ অনুমোদিত নয় বলেই তাঁকে থামতে হয়। তার বেশি এগোতে পারেননি এবং চাননি। অজ্ঞতা আমেরিকার নারীদের কাছ থেকে তিনি বিরাট সাহায্য পেয়েছিলেন। সে কথার স্বীকৃতি এই বক্তৃতাতেও আছে। এখানে তিনি বলেছেন, "They (মার্কিন নারী) are the best women in the world." (Burke. 2000:1:206)। অর্থাৎ আমেরিকার নারীগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী।

২৮ নভেম্বর (১৮৯৩) তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'পুনর্জন্ম'। 'ডেইলি অইওয়া কার্পিটাল'-এ প্রকাশিত রিপোর্টটি এইরকম :

"গত রাতে স্বামী বিবেকানন্দ পুনর্জন্ম নিয়ে কথা বলেন। তাঁর যুক্তি অনুযায়ী জগতে নতুন কিছু কখনও সৃষ্টি হয় না; এই অস্তিত্ব ও ঈশ্বর অনাদিকাল থেকেই

সংগৃহীত করছে। বিদেশী সাংসার আবার তাদের সংস্কার অনুযায়ী নতুন বেহতে বসবাস করে, সেই দেহ পূর্বের তুলনায় নিকট বা উৎকৃষ্ট হতে পারে এবং এটা ঘটে কর্মফল অনুযায়ী।" (পূর্বোক্ত : 139)।

বিবেকানন্দ-ভক্তগণ প্রায়শই বিবেকানন্দকে বিজ্ঞান ভাষায় ভাবিত মানুষ হিসেবে দেখেন। কিন্তু এই 'পুনর্জন্ম' সম্পর্কে তাঁর গভীর বিশ্বাস এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার যে চেষ্টা তিনি চালিয়েছেন তা থেকে তাঁর ভাষাটি কতটা বিজ্ঞান অনুসারী তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

৩০ নভেম্বর (১৮৯৩) তিনি ডে ময়েন ত্যাগ করেন। তাঁর চলে যাওয়ার তিনদিন পরে 'আইওয়া সেট রেজিস্টারে' (৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৩) তাকে প্রশংসা করে সম্পাদকীয় লেখা হয়। এই লেখাটির কিছু অংশ তাঁর ইংরেজী জীবনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সপ্রতিভতা, দয়ালু ও সরল আচরণের কথা পাওয়া যায়।

#### মিনেরাপোলিস

ডে ময়েনের পর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অবধি তিনি কোথায় ছিলেন বা কি করলেন তার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় না। মিনেরাপোলিস জার্নাল (১৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৩)-এ আবার তাঁর বক্তৃতার কথা পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "ভারতের রীতিনীতি ও প্রথা" (Manners and Customs of India)। এই বক্তৃতায় ভারতীয় বিবাহ সম্পর্কে এমন একটি তথ্য দেন যা সভ্য দুনিয়ায় খুবই অস্বস্তিকর। তিনি বলেন, "They [wife and husband] grew up with the idea that they were to be married and they loved each other as brothers and sisters." (Burke, 2000:1:217)। অর্থাৎ ভারতীয় স্ত্রী ও স্বামী গড়ে ওঠে এই ধারণা নিয়ে যে একদিন তারা বিবাহিত হবে এবং তারা একে অপরকে ভাইবোনের মত ভালোবাসবে।

এই বক্তৃতার পর জানুয়ারির (১৮৯৪) মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ড. চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এই সময় তিনি সত্বেত বড়দিন উপলক্ষে শিকাগোয় ফিরে যান। (২০০৭:১৪৩)।

টীকা ১: শ্রীম শ্রীশ্রীসামন্ত কথাবৃত

#### মেম্ফিস, টেনেসি

সম্ভবত, শিকাগো থেকেই তিনি মেম্ফিসে পৌঁছান। শনিবার, ১৩ জানুয়ারি, ১৮৯৪। এখানে তিনি অতিথি হয়েছিলেন মি. হু. এল. ব্রিঙ্কলের। ২২ জানুয়ারি মেম্ফিস থেকে আবার শিকাগোয় ফিরে যান। মেম্ফিস তিনি যে বক্তৃতাগুলি দেন, সেগুলির বিষয় ছিল—'হিন্দু ধর্ম'; 'মানুষের ভবিষ্যৎ'; 'পুনর্জন্মবাদ'; 'ভারতের রীতিনীতি' এবং 'তুলনামূলক ঈশ্বরতত্ত্ব'। ১৪ জানুয়ারি 'মেম্ফিস কমার্শিয়াল' পত্রিকায় বিবেকানন্দের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎকারে তিনি যা বলেন তাতে যে কোন সুস্থ মানুষের লুক্কান হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এখানে তার কয়েকটির উল্লেখ করা হল—

১. তিনি বিজ্ঞান ও মধ্যবিত্ত আমেরিকাবাসীর সম্ভ্রমতা, সংস্কৃতি ও সমর্থন পাওয়ার লক্ষে বলেন যে, আমেরিকায় দারিদ্র অনুপস্থিত। "I have especially remarked on the absence of poverty in America." (Burke, 2000 : 1 : 24)। মার্কিন ইতিহাসে উনিশ শতকের শেষ দুই দশক ছিল শ্রমিক আন্দোলনে উদ্ভল। মে নিবসের জন্মের ইতিহাস পাঠ করলেই জানা যায় সে সময় শ্রমজীবী মানুষের কি অবস্থা ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, কোন কোন কারখানায় শ্রমিকদের অবস্থা ছিল মিশরের দাসদের থেকেও ককম। এক অসহনীয় দারিদ্র ও বঞ্চনার মধ্যে থাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সে সময় শ্রম-সময় কমানোর দাবিতে, মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে, নিরাপত্তা ও মর্যাদার দাবিতে লাড়াই গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের বিশ্বয় এটাই 'চিন্তাময়ক' বিবেকানন্দ এইসব মানুষদের দেখতে পাননি।

২. বিবেকানন্দের মতে, চিন্তাধারার বিস্তৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বধর্ম সম্মেলন সুফল প্রসূ হয়েছে। (Burke, 2000 : 1 : 241)। কিন্তু এই বিবেকানন্দকেই পরে বলতে দেখা যায় : "ব্রীটিশধর্ম অপর ধর্মপেক্ষা মহত্তর এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই ধর্ম মহত্তরতার আয়োজন করা হইয়াছিল।" এবং "আমার মনে হয়, জগতের কাছে বিধর্মীদিগকে বিদ্রূপাঙ্কলে দেখানোই ছিল ধর্মমহত্তরতার উদ্দেশ্য।" (গঙ্গীরাচন্দ। ২০১১:২:২১)।

৩. জাপানি়া, শূন্যে ভাষা এবং সাময়িকভাবে জীবকে তত্ত্ব (suspended animation) করার ঘটনাগুলি সম্পর্কে বিবেকানন্দের মত জানতে চাওয়া হলে,

তিনি বলেন, “আমরা আদৌ অলৌকিকতায় বিশ্বাসী নই, কিন্তু এইসব আপাত অশুভ ঘটনাগুলি প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের অধীনেই ঘটতে পারে।” (Burke, 2000:1:241)<sup>১</sup> তিনি আরও বলেন যে, “হঠাৎযোগীরা অন্যের চিন্তা পাঠ (thought reading) এবং ভবিষ্যৎবাণী সফলভাবেই করতে পারেন।” (পূর্বোক্ত : ২৪২)। শুধু তাই নয় তিনি এমন একজনকে দেখেছেন যিনি একটা বস্তুর পাথরের দরজা বন্ধ করে বহুদূর অভূতপূর্ব অবস্থায় যাপন করেছেন। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করে যে, ভারতে একজনকে সমাধিস্থ করার সাথে সাথে তার কবরের উপর যব শস্য চাষ করা হয় এবং তাঁকে যখন কবর থেকে বের করা হয় তখনও সে জীবিত ছিল এ তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। (পূর্বোক্ত)।

ঘটনা হল শুন্যে ভাসা, ভবিষ্যৎবাণী করতে পারার ক্ষমতা, অন্যের চিন্তা পাঠ করার ক্ষমতা, বছরের পর বছর না খেয়ে থাকা এবং দীর্ঘদিন কবরস্থ হওয়া সম্ভবও বেঁচে থাকা ইত্যাদিতে তিনি বিশ্বাস করেন, অথচ তিনি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন না—এ কৈমন করে হয় বোকা যায় না।

অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের (১৮৯৩) শুরুতে বিবেকানন্দের সাথে একটি লেকচার ব্যুরোর চুক্তি হয়। এই সংস্থাই আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করেছিল। সে বিষয়ে স্থানীয় পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত শুধু নয়, ফল্যও করে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হত এবং তাঁকে প্রশংসা করে রিপোর্ট লেখা হত। মেমফিসে বিভিন্ন কাগজে বার্ক উদ্ধৃত প্রশংসামূলক সত্ত্বত এই বক্তৃতা ব্যবসায়ী সংস্থা ও সংবাদপত্রের পারস্পরিক যোগাযোগের ফল।

#### শিকাগোর প্রত্যাবর্তন

মেমফিস ছেড়ে তিনি ২২ জানুয়ারি, ১৮৯৪ শিকাগোয় ফিরে আসেন। এখানে তাঁর প্রধান আশ্রয় ছিল হেল পরিবার। এটাই ছিল তাঁর শিকাগোর প্রধান যোগাযোগের স্থান ও প্রধান কার্যালয়। তিন সপ্তাহ এখানে থাকেন। এই পর্বে তিনি কোথাও বক্তৃতা দেননি। মূলত বিশ্রাম, আচ্ছা এবং পড়াশুনাতাই তিনি

টীকা ১. Burke-এর ইংরেজী গ্রন্থ (2000:1)-র প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেছেন মনিমৌর্যজন চট্টোপাধ্যায় (২০১১:১)। তাঁর অনুবাদ কমটি অসঙ্গত ভ্রুটিপূর্ণ। অর্থাৎ কেউই তিনি মূল গ্রন্থ থেকে সরে যেছেন। ফলে অর্থাৎই পাঠে গেছে। হ. পৃ. ২১৬ এবং Burke-এর 2000:1:242-242

এসময়টা কাটিয়েছিলেন।

#### ডেট্রয়েট, মিশিগান

শিকাগো ত্যাগ করে তিনি সোমবার, ১২ জানুয়ারি, ১৮৯৪, ডেট্রয়েট শহরে পৌঁছান। সেখানে মিশিগানের প্রাক্তন গভর্নর জন ব্যাপলির বিধবা স্ত্রী ফ্যানসেস ব্যাপলির আতিথ্য গ্রহণ করেন। মিসেস ব্যাপলি ছিলেন একজন যথেষ্ট প্রভাবশালী মহিলা। তিনি শিকাগোতে বিশ্বমেলার অন্যতম পরিচালিকা ছিলেন। এখানেই তাঁর সাথে বিবেকানন্দের আলাপ হয়। ডেট্রয়েট ভ্রমণে বিবেকানন্দকে তিনি যে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন তা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

বিবেকানন্দ সম্পর্কে মিসেস ব্যাপলির আগ্রহের একটি বিশেষ কারণ ছিল। ব্যাপলি নিজে যেমন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন তেমনি শিক্ষার প্রসারের ও তাঁর অদম্য আগ্রহ ছিল। ডেট্রয়েটে কিনালয় ও বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রসারের তাঁর আগ্রহ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। হেলেনীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য গঠিত ইংলিশ সোমাইটিং তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সদস্য। এছাড়াও নৃতাত্ত্বিক সংঘ ও মিশরীয় আবিষ্কারক সংঘের সদস্যপদ তাঁর ছিল। যে সময়টার কথা এখানে বলা হচ্ছে তা হল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়। এ সময় ইউরোপ ও আমেরিকায় ‘প্রাচ্য দেশীয় নবজাগরণের’ একটি ছন্দ চলছিল। গটফ্রিড হর্ডার, ব্রিডারিশ স্পেন্গেল এবং বিশেষ করে ম্যাক্সমুলারের রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে বারবার প্রাচ্যের বা ভারতের প্রাচীনত্ব ও (তথাকথিত) গৌরবময় অতীতের কথা উচ্চারিত হচ্ছিল। ম্যাক্সমুলারের একটি বক্তৃতার শিরোনাম ছিল India : What can it teach us? (১৮৮২)। এই ধরনের বই ও বক্তৃতা মিসেস ব্যাপলির গতে পড়াটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে একজন আগ্রহী মানুষ। অর্থাৎ ভারত সম্পর্কে এই ধরনের বই ও রচনা দ্বারা মিসেস ব্যাপলি আগেই প্রভাবিত হয়ে বসেছিলেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল প্রাচ্যের প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ ও অস্বাভাবিক মোহ।<sup>২</sup> কলে ‘প্রাচ্য দেশীয় নবজাগরণ’-এর কল্প প্রভাব দ্বারা তিনি সহজেই উৎসাহিত হন। শুধু

টীকা ১. মেমফিসে তাঁর অন্যান্য বক্তৃতাগুলির মধ্যেও ছিল অলৌকিক ও আলমুবি ধারণার ছড়ানি। Burke. 2000:1:5th Chapter

প্রয়োজন ছিল পেরুয়া বস্ত্রধারী এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর। বিবেকানন্দ সেই অভাব পূরণ করলেন। বিবেকানন্দ ছাড়া অন্য যেকোন ইংরাজী বলতে পারা ভারতীয় সন্ন্যাসী মিসেস ব্যাণলির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও—একই ধরনের অভ্যর্থনা ও সাহায্য পেতেন। ফলে বিবেকানন্দের বাণীতা বা জ্ঞান-সংক্রান্ত যে সব গল্প বিস্তার লাভ করেছে—সেগুলি একান্তভাবেই তত্ত্বদের কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবে তাঁর বাণীতা বা অগাধ (১) জ্ঞান কতটা ভূমিকা পালন করেছিল, তা সন্দেহাতীত নয়।

তিনি ডেট্রয়েটে ছিলেন ১২ থেকে ২৩ জানুয়ারি (১৮৯৪) এবং মার্চের ৯ থেকে ৩০ তারিখ অবধি। এই সময়কালের মধ্যে ডেট্রয়েটে তিনি মোট আটটি বক্তৃতা দেন। এছাড়া কয়েকটি ঘরোয়া বৈঠকেও ভাষণ দেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি 'ফ্রি প্রেস' পত্রিকার প্রতিনিধিকে একটি সাক্ষাৎকার দেন, যা প্রকাশিত হয় ১৪ ফেব্রুয়ারিতে। এই সাক্ষাৎকারে তিনি যা বলেন, তা অস্পষ্ট, অসত্য ও অনিরোধিতাপূর্ণ। দুই একটি উদাহরণ দিলেই এখানে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

ক. বৌদ্ধ ধর্ম হল হিন্দুধর্মের শাখা।

খ. খ্রিস্টধর্ম প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু ধর্মের থেকে উদ্ভূত।

গ. ভারতে মিশনারি কাজের কোন প্রয়োজন নেই।

ঘ. ভারতীয়রা দার্শনিক অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাস করেন।

টীকা ১. যাক্সবুন্ডার বোর্ড অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ কর্তৃক অমুদ্রিত হয়ে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কন্সটান্টিনোপোল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডিয়ান স্টাডিজ সার্ভিসের প্রার্থীদের (যারা অংশগ্রহণ ইতিপূর্বে) সামনে এই শিরোনামে সার্বভৌম ভাষণ দেন। পরবর্তীকালে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মজার কথা হল এটি ইংরেজি বিভিন্ন সার্ভিসের তুলনায় ভারতীয় সন্ন্যাসীদের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। (Dalmia, 2007 : X)

২. ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪-এ 'ফ্রি প্রেস' পত্রিকার বিবেকানন্দের যে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে দিয়ে সেই সময় আমেরিকাবাসীরা একাধারে যাচ্ছে যে খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে এক অন্ধৃত মোহ তৈরি হয়েছিল, সেই মনেভরো প্রতিদ্বন্দ্বিতাকার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়।

(Burke, 2000:1:298 বার্ষিক ২০১১/১২/১৩)

৩. ঊনবিংশ শতকে সমগ্র ইউরোপে এক ধরনের বিশ্বাস জন্মায় যে প্রচণ্ডে জনমতে পারলে পুনরায় এক নব্যজাগরণের জেঁই আসবে এবং নব্যজাগরণের সে জ্ঞানে সব দিশা উন্মোচিত হবে। Scholar, R. 1984 (translated). The Oriental Renaissance : Europe's Rediscovery of India and the East, 1680-1880. New York : Columbia University Press. রেমিলা পাশ্কার কর্তৃক উল্লিখিত। বাংলায়, রেমিলা ও অন্যান্য ২০১১/১২/১৩ এবং Dalmia, 2007।

৬. আমেরিকায় তিনি কোন মিশনারি কাজ করতে আসেননি।

তাঁর এই বক্তব্য সম্পর্কে দু-চার কথা না বললেই নয়। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ বৌদ্ধধর্মকে কখনই হিন্দুধর্মের শাখা বলা যায় না। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে। বর্ণব্যবস্থা (পরবর্তীকালে জাতিভেদ), যাগ-যজ্ঞ, পশুবধ, অর্থহীন আচার-রীতি, ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ইত্যাদিকে নস্যাৎ করেই বৌদ্ধধর্ম বিকশিত হয়েছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অস্বীকারই হল বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু সেই বৌদ্ধধর্মকেই হিন্দুধর্মের শাখা হিসেবে আমেরিকাবাসীদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এটা মেনে নিতে পারলেন?

দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দের আশ্রাসী হিন্দুত্ববাদ কল্পনার দূরতম বাঁপে গিয়ে পৌছায় তখনই, যখন তিনি বলেন খ্রিস্টধর্ম প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুধর্মের থেকে উদ্ভূত।<sup>২</sup> কিন্তু ঘটনা হল খ্রিস্টধর্ম মূলগতভাবে হিন্দু ধর্মের থেকে ভিন্ন। প্রথা, আচার, বিশ্বাস—সব দিক থেকেই। শুধু একটি বিষয়েই ধর্ম দুটি সদৃশ তা হল—উভয়েরই লক্ষ হল মানুষকে প্রভাবিত করা আর শাসকের হাত শক্ত করা।

তৃতীয়ত, যখন তিনি বলেন যে, ভারতে মিশনারিদের কোন প্রয়োজন নেই—তখন তাঁর পিছনে কোন সদর্থক যুক্তিবোধ কাজ করে না। কাজ করে এক ধরনের বিচিত্র হিন্দু দান্তিকতা। তাঁর কথাটি যে অসঙ্গতিপূর্ণ তা তিনি পরবর্তীকালে স্বীকার করে নেন অন্যভাবে। ১১ মার্চ তিনি বলেন, মিশনারিরা শিক্ষাকে সুলভ করেছে। “মিশনারিদের যারা পাঠায় তারা কিছু টাকা দেয়, ভারত সরকারও ঋণিকটা টাকা দেয়—তাতে মিশনারিদের মাধ্যমে নেটিভদের জন্যে কিছু ভাল কাজ ও স্কুল তৈরি হয়েছে।” বিবেকানন্দ আরও বলেন, “তোমরা [মিশনারিরা] যদি ভারতের দরিদ্র মানুষকে কাজ ও খাদ্য দিয়ে খ্রিস্টান বানাতে চাও, তাতে আমি খুশি। ঈশ্বর তোমাদের সেই কাজে গতিবেগ সঞ্চার করুন।” (বার্ক। ২০১১:১:৩৬৭)। তিনি মিশনারিদের আন্তরিক জানিয়ে বলেন, “আমরা খ্রিস্টের মিশনারিদের চাই। এরকম শত শত সহস্র সহস্র ভারতে আসুক। খ্রিস্টের ঐক্যকে আমাদের কাছে নিয়ে এস। সেটা সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হোক। ভারতের প্রতি গ্রামে, প্রতি প্রান্তে তাঁর বার্তা ধ্বনিত হোক।” (বার্ক।

টীকা ১. তাঁর আরও মন্তব্য হল, “জের্মান ক্যাথলিক চিন্তাবিদ যে খ্রিস্টপূর্ব বৌদ্ধ ধর্ম হতে ধর্মীয় ধারণা—একথা প্রমাণিত। (বার্ক। ২০১২/২:১০)

২০১১:১:৩৬৮)। এখানে এটাও কলা দরকার যে মিশনারিদের বহু নগর্যক ভূমিকার পাশাপাশি কয়েকটি সদর্থক ভূমিকাও ছিল, যা অস্বীকার করার অর্থ হল ইতিহাসকে অস্বীকার করা।

চতুর্থত, 'ভারতীয় দার্শনিকেরা অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাসী' এ মন্তব্যটি অর্থসত্য। কারণ ভারতীয় দর্শন-ঐতিহ্যে ভাববাদ, বস্তুবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ—সবকটি ধারারই অস্তিত্ব রয়েছে। এদের মধ্যে ভাববাদী ধারাটিই প্রবল। তিনি নিজে একজন ভাববাদী চিন্তাবিদ হওয়া সত্ত্বেও অক্রেমে বলেন, "অবশ্যই, দার্শনিক অজ্ঞেয়বাদী—তোমরা যাকে বল অবিশ্বাসী।" (বার্ক। ২০১১:১:২৬৮)। কথা হল অজ্ঞেয়বাদীরা কি আদৌ অবিশ্বাসী? অজ্ঞেয়বাদের অর্থ হল, ঈশ্বর আছে কি নেই তা জানা যায় না।

পঞ্চমত, স্যারগিনোর বক্তৃতায় তিনি নিজেকে ধর্ম প্রচারক হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। (বার্ক। ২০১২:২:১৬)।

তার ডেটুয়েট ভ্রমণ ছিল দুটি পর্বে বিভক্ত—প্রথমে ফেব্রুয়ারি মাসে ও দ্বিতীয় পর্বে মার্চ মাসে। এই মাস দুটিতে তিনি যে বক্তৃতা, সাক্ষাৎকারগুলি দেন তা বার্কের New Discoveries' প্রকাশিত হয়েছে। এই বক্তৃতাগুলির উপর সমীক্ষা চালালে যে কোন ভারতীয় পাঠক রীতিমত ধাঁধায় পড়ে যাবেন। কারণ ভারত সম্পর্কে এমন আজগুবি আর অসত্য তথ্য যে কেউ দিতে পারে তা ভাবাই যায় না।

১. তিনি প্রথম বক্তৃতায় (১৪.২.১৮৯৪) বলেন, "তারা [ভারতীয়রা] তাদের দেশকে 'ইন্ডিয়া' বলে না এবং নিজেদের হিন্দু বলেও অভিহিত করে না। দেশটির নাম ছিল হিন্দুস্তান এবং অধিবাসীরা ছিল ব্রাহ্মণ। প্রাচীনকালে তারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতো।" (Burke, 2000:1:309)। এই বক্তৃতাতেই তিনি আরও দুটি দাবি করেন—(ক) ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া কেউ ক্ষুধার মারা যায় না, এবং (খ) ইংল্যান্ডে কেখানে প্রতি ৪০০ জনের মধ্যে একজন মদ্যপ,

টীকা ১. এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে ভারতীয় সংস্করণের অনেকেই মিশনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়ে 'ভারতীয় বৈষম্যমূলক সমাজের পরিবর্তনে অগ্রসর হন।'

২. ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪-এ 'ফ্রিপ্রেস'-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, "তোমরা কি অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাস কর?" (বার্ক। ২০১১:১:২৬৮)। প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ এই উত্তর দেন।

সেখানে ভারতে প্রতি দশ লক্ষে মাত্র একজন। (পূর্বোক্ত : 310)। সুতরাং ভারতের স্থান নৈতিক দিক থেকে বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় উচ্চতর। (পূর্বোক্ত : 308)।

২. দ্বিতীয় বক্তৃতাটি (১৫.২.১৮৯৪)-তে একটি ভয়ঙ্কর দাবি তিনি করেন, যা হল হিন্দু ধর্মই সবচেয়ে প্রাচীন। (বার্ক। ২০১১:১:২৮৪)।

৩. তার তৃতীয় বক্তৃতাটি (১৭.২.১৮৯৪) ছিল ইউনিটেরিয়ান চার্চে। বিখ্যাত ছিল 'মনুষ্য সেবক'।<sup>১</sup> (Burke, 2000:1:333)। বক্তৃতার পর শ্রোতারা তাঁকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন—

প্রথম প্রশ্ন : ভারতীয়রা কি তাদের সন্তানকে কুমিরের মুখে ফেলে দেয়?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : তারা কি জগন্নাথের রাথের তলায় নিষ্পিষ্ট হয়ে আত্মহত্যা করে?

তৃতীয় প্রশ্ন : তারা কি বিধবাগণকে মৃত স্বামীর/দের সাথে পোড়ায়?

বিবেকানন্দ প্রথম প্রশ্নের উত্তরটি দেন অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে। এবং রীতিমত ব্যঙ্গও করেন। কারণ তাঁর কাছে হয়তো মনে হয়েছিল। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটাই হাস্যকর। কিন্তু ঘটনা হলো, এর মধ্য দিয়ে তিনি সত্যকে এভাবে যান্ত্রিক চেষ্টা করেন, কারণ গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন দেওয়ার প্রথা সম্পর্কে সবলেই জানতেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটির ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরনের অবহেলা দেখিয়েছেন। তিনি এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "পবিত্র শহরে [পুরী] এই রথটানার রীতি

টীকা ১. Burke, Marie Louise. 2000. Swami Vivekananda in the West - New Discoveries — His Prophetic Mission. Part One Calcutta : Advaita Ashrama. First Volume (Completed in Six Vols.)

২. 'বানী ও রচনা' (২০১২:২:১৮)-তে এই বক্তৃতাটি 'ভারত কি অসম্পন্ন দেশ?' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। 'বানী ও রচনা' প্রকাশিত প্রবন্ধটির শুরুতে যে তথ্যটি দেওয়া আছে তা বার্ক প্রদত্ত তথ্যের সাথে মেলে না। বার্কের মতে, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪, টি গেসে বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু বানী ও রচনা অনুযায়ী কোন ইউনিট ট্রান্সক্রিপ্ট, ৫ এপ্রিল, ১৮৯৪।

সুপ্রাচীন, হয়তো কেউ কেউ দড়ি ধরার ও রথ চানার প্রকল আগ্রহে পিছলে পড়ে গেছেন এবং মারা গেছেন।" (বার্ক। ২০১১:১২৯৮)।

এ উদ্ভট অর্ধ-সত্য। কারণ ধর্মীয় উদ্ভাবনার এ ধরনের আশ্ব নিঃসৃত, আশ্বহত্যার ঘটনা একেবারেই অস্বাভাবিক ছিল না। এবং এটা ঘটতোও বটে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেন, তা ছিল অবিমিশ্র মিথ্যা। তিনি সরাসরি বিশ্বাসের পুড়িয়ে মারার ঘটনাকে অস্বীকার করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর জবাব ছিল, "তবে একথা সত্য, বিশ্বাসের স্বৈচ্ছিক অধিগতে আত্মত্যাগ দেন। এইরকম অল্প কিছু ঘটনার সমস্ত পুরোহিত ও ধর্মিক লোকেরা যারা সব সময়েই আশ্বহত্যার বিরোধী, বিশ্বাসের নিরস্ত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিশ্বাসের যখন স্বামীদের সঙ্গে মৃত্যুবরণে জিহ্বা ধরে, তখন তাদের একটা অগ্নি পরীক্ষা হয়। অল্পস্ব আত্মনে হাত দিয়ে যদি তারা সহ্য করতে পারে তখন তাদের সংকল্পের আর কোন প্রতিরোধ করা হয় না। একমাত্র ভারতেই নয়, অন্যত্রও প্রেমিকের মৃত্যুতে স্ত্রী বা প্রেমিকারা অমরত্বলাভের জন্য মৃত্যুবরণ করে।" (বার্ক। ২০১১:১২৯৮)। উনিশ শতকের শেষভাগে যে কোন বাঙালি বা ভারতীয় এসব শুনে চমকে উঠতেন নিশ্চিতভাবেই! রামমোহন রায় তাহলে কিসের বিকল্পে এত লড়াই করলেন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে কোন প্রয়োজনে সতীদাহ প্রথার অবসানে অগ্নি প্রবীত হল? এসব প্রশ্নের জবাব বিবেকানন্দের বক্তৃতায় পাওয়া যায় না।

বিবেকানন্দ যখন নরেন্দ্র ছিলেন, তখন তাঁর একটা রোগ ছিল—'এক এক কথার বলায় রোগ।' আমেরিকায় গিয়েও সে রোগের হাত থেকে তিনি মুক্তি পাননি। ডেট্রয়েট ভ্রমণকালে তাঁকে অল্প বক্তৃতা দিতে হত। তিনি ভেবে পেতেন না পরদিন বক্তৃতায় কি বলবেন। "এই অবস্থায় সময়ে সময়ে তাঁহার কতকগুলি অদ্ভুত অনুভূতি হইত। গভীর রাতে তদ্ব্যবশেষে শুনিতে পাইতেন, পরদিন তাঁহাকে যে সব কথা বলিতে হইবে, কে যেন তাহা উচ্চস্বরে (তদেব) তাঁহার নিকট বলিতেছে। কখনও কখনও ঐ শব্দ দূর হইতে আসিত, যে বৃক্ষ শ্রেণিশোভিত রাজপথের অপর পার্শ্ব হইতে আসিতে আসিতে ক্রমাশু নিকটবর্তী হইত, অথবা মনে হইত কে যেন তাঁহার পার্শ্ব দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছে, আর তিনি শুইয়া শুইয়া তাহা শুনিতেছেন। কখনওবা শুনিতেন যেন দুইটি কণ্ঠস্বর

তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পরদিনকার বক্তব্য—বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতেছে। সময়ে সময়ে এই অদ্ভুত উপায় নূতন, নূতন কথা, নূতন নূতন ভাব তাঁহার কর্ণপোরের হইত—সে সব তিনি ইচ্ছাশ্রমে কখনও শুনে নাই বা ভাবেন নাই। সময়ে সময়ে এই অলৌকিক বক্তৃতাগুলি এত জোরে হইত যে, অন্য ঘরের লোকের কানে পর্যন্ত তাহা পৌছিত। তাঁহার সেই জন্য পরদিন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "স্বামীজী, কাল অত্যাশ্রমে আপনি কার সঙ্গে এত টেচিয়ে টেচিয়ে কথা বলছিলেন?" স্বামীজী কথটা কোন রূপে কাটাঁইয়া দিতেন। (বসু, প্রথমখণ্ড। ২০১১:১৩৪৮-৩৪৯)। স্পষ্টতই বোঝা যায় এই রোগ ডেট্রয়েটের কৃত্তিমূলক জীবনে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা নিশ্চয়ই সে সময় ঘটেছিল কিন্তু ভক্তদের কলমে তা উঠে আসেনি বা উঠে আসলে সম্পাদকের কল্যাণে সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

ডেট্রয়েট ভ্রমণের সময়টি ছিল সমস্যা ও সম্ভাবনার। ফলে সে সময় তিনি ভারতকে মহান করতে গিয়ে এমন সব তথ্য দিয়েছেন যার ফলে ভারতের সম্মান তুলুস্তিত হয়েছে। প্রচা সম্পর্কে আমেরিকাবাসীর আশু ধারণা আরও শক্তিশালী হয়েছে। তিনি আমেরিকাবাসীর সামনে নিজেকে সত্যের প্রচারক হিসেবে তুলে ধরবার চেষ্টা করে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার যে সম্ভাবনা তৈরি করতে পেরেছিলেন, তা শেষ বিচারে তাঁর সমস্যাকে কমাতে পারেনি বরং বৃদ্ধিই করেছিল অনেকগুণ। ফলে আমেরিকা ভ্রমণে কৃত্তিমূলক ছিল সে কৃত্তির বোঝা তাকে বহন করতে হয়েছিল বহুদিন।

এসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

১৮৮১-৮২, স্বামী। ২০১২।

১৮৮১, উদ্ভা। ২০১২

১৮৮১, উদ্ভা। ১৯৮৯।

দুর্ভাগ্যবশত বিবেকানন্দ : কলকাতা : উদ্ভা। ২০১২।

"নরী প্রসঙ্গের নিবিল ভূমিকা", অত্যাশ্রম ও নিজেগী পৌত্তম সম্প্রদায়। ২০১২। উনিশ শতকের বাংলা : কলিকাতা : গান্ধী।

"রামমোহন ও নারীমুক্তি"। সেন, বসু, ভক্ত ও বিশ্বাস কর্তৃক সম্পাদিত। ১৯৮৯। রামমোহন "স্বপ্ন"। কলিকাতা : গান্ধী।

টীকা ১. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য কণিত চৌধুরীর 'বিবেকানন্দ মানস' (২০১৩)-এর পঞ্চম অধ্যায় প্রত্যয়।

|                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| চট্টোপাধ্যায়, শ্যামচন্দ্র। ১৪০০ বাংলা। | রামমোহন রায় স্মৃতিবন্ধা সমিতি।                                                                                                                 |
| চট্টোপাধ্যায়, রাজগোপাল। ২০০৭।          | শরৎ রচনাবলী। কলিকাতা : বাক্য পাবলিশিং। বণ্ড ৪।                                                                                                  |
| চন্দ, পুলক। ১৯৯৬।                       | মিথুনাত্ম বিবেকানন্দ। কলকাতা : রাজগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।                                                                          |
| চৌধুরী, কনিষ্ঠ। ২০১৪।                   | ইতিহাস সাংস্কৃতিকতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। কলিকাতা : লোকনী প্রকাশন।                                                                                  |
| গাঙ্গার, রেমিলি; মুখিয়া, ছরেশ।         | বিবেকানন্দ মানস। কলকাতা : সেতু                                                                                                                  |
| চন্দ্র বিপিন। ১৯৮২।                     | সাংস্কৃতিকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা। কলকাতা : কে. পি. বাকী এন্ড কোম্পানী।                                                                           |
| গাঙ্গার, রেমিলি ও অন্যান্য। ২০১১।       | ভারতবর্ষ : ঐতিহাসিক সূচনা ও আর্থ ধারণা। নয়দিল্লি : ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট। অনুবাদ-আবীরা বসু চক্রবর্তী।                                            |
| নর, মহেন্দ্রনাথ। ২০০৭।                  | লঙনে স্বামী বিবেকানন্দ। কলকাতা : দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি। তিন বইতে সমাপ্ত।                                                                   |
| বসু, প্রমথনাথ। ২০১১।                    | স্বামী বিবেকানন্দ। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়। দুই বইতে সম্পূর্ণ।                                                                               |
| চন্দ্র, শঙ্করপ্রসাদ। ২০০২।              | বিবেকানন্দ ও সন্ন্যাসীনা ভারতবর্ষ। কলকাতা : মডেল বুক হাউস। সাতবইতে সমাপ্ত।                                                                      |
| বার্ভ, মেরি লুইজ। ২০১১।                 | পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ (নতুন তথ্যাবলী)। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়। ছয়বইতে সমাপ্ত।                                                              |
| বিবেকানন্দ, স্বামী। ২০১১ (অনুবৃত্ত)।    | বাণী ও রচনা। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়। দশ বইতে সম্পূর্ণ।                                                                                      |
| বিবেকানন্দ, স্বামী। ১৯৭৭।               | পত্রাবলী। কলিকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়।                                                                                                          |
| বো, মিশেল। ২০০১।                        | পুস্তিকাভের ইতিহাস। কলকাতা : ক্যারিগেটন পাবলিকেশন। দুই বইতে সমাপ্ত। অনুবাদ—দীপক রায়।                                                           |
| ডাঃ জাফা, নরেন্দ্রনাথ। ২০০০।            | ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস। কলিকাতা : চেন্নায়ের প্রিন্টার্স।                                                                                        |
| ঐশ্বর্য-কবিতা। ১৯৬৬ বাংলা।              | ঐশ্বর্য রামকৃষ্ণস্মৃতি। কলিকাতা : কথামৃত ভবন। প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগ (১৯৭৭ বাংলা), তৃতীয় ভাগ (১৯৭৭ বাংলা) মোট পাঁচ ভাগে প্রকাশিত।             |
| সেন, গিরিশচন্দ্র। ১৪২০ বাংলা।           | ঐশ্বর্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংকলিত জীবনী। কলকাতা : পাতাবহর। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এটিই প্রথম সেরা রামকৃষ্ণ জীবনী। |

English Books :

|                                                |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burke, Marie Louise. 2000.                     | Swami Vivekananda in the West : New Discoveries—His Prophetic Mission. Part-I, Vol. I. Calcutta : Advaita Ashrama. Completed in Six Vols. |
| Chattopadhyaya, Rajagopal. 2011.               | World's Parliament of Religions, 1893. Salt Lake; Rajagopal Chattopadhyaya.                                                               |
| Chattopadhyaya, Rajagopal 2012.                | Swami Vivekananda in the West. Salt Lake : Published by Dr. Rajagopal Chattopadhyaya.                                                     |
| FWD (His Eastern And Western Desoiples). 1997. | The Life of Swami Vivekananda. Calcutta. Advaita Ashrama. Vol-I. Completed in two vols.                                                   |
| Dahma, Vasudha. 2007.                          | Oriental India. Gurgaon (Naryana)! Three Essays Collectine.                                                                               |

গুরু গ্রন্থ :

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| গুরুগ্রন্থ, স্বামী। ২০১২।      | বুধদেব বিবেকানন্দ। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়। তিন বইতে সমাপ্ত। |
| চট্টোপাধ্যায়, রাজগোপাল। ২০০৭। | মিথুনাত্ম বিবেকানন্দ। স্টলেক : লোক।                             |
| চন্দ, পুলক। ১৯৯৬।              | ইতিহাস সাংস্কৃতিকতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। কলিকাতা : লোকনী প্রকাশন।  |

# ‘নিম্নবর্ণের’ ফলিত ইতিহাসে বাংলার ‘নমঃশূদ্রদের’ প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

সুনীল কুমার রায়

‘নিম্নবর্ণের’ ফলিত ইতিহাস চর্চায় শ্রেষ্ঠ অথবা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আলোচ্য এই Cast Protest and Identify in Colonial India : The Namasudras of Bengal নামক গ্রন্থে ‘নমঃশূদ্রদের’ প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্ব-এর অনেক ‘উদাহরণ’ দেওয়া হয়েছে। যেমন—

(১) ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরের মাদারিপুর, কৈজিনিপাড়, গোপালগঞ্জ থানার দুর্ভিক্ষের সময়ের ফরিদপুর সুহৃদসভার ত্রাণবিতরণে, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল-ফরিদপুরের বিস্তীর্ণ জলা অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে স্বদেশ বহুব সমিতির ত্রাণকর্ষ সঙ্কেত সংস্থাস্থিকে বিদ্যমান দুর্ভিক্ষপীড়িত ‘নমঃশূদ্রদের’ মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারিদের এবং ব্রিটিশ সরকারের ত্রাণ দপ্তরের ত্রাণ বিতরণে,

(২) তাঁদের প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিকে সরকারি অনুমোদন এবং বার্ষিক অর্পণ প্রদানে,

(৩) বরিশাল, ঢাকা এবং তারপর রাজধানী কলকাতায় ‘নমঃশূদ্র’ অবদমিত জাতির’ ছাত্রদের জন্য সরকারি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠায়,

(৪) সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার দানে এবং

(৫) বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান পরিষদে তাদের প্রতিনিধিকে গভর্ণরের মনোনয়ন দানে

সেই পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ রয়েছে কলা উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন এই পক্ষপাতিত্বের (Protective Discrimination) উদাহরণগুলির অন্তর্গত কয়েকটি সম্পর্কে তাদের প্রেক্ষাপটে একটু বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে, তবে তার পূর্বেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্বাহ পক্ষপাতিত্ব বা

সুনীল কুমার রায়

অনুকূল্য এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চালিত ভারতের উপনিবেশিক সরকারের আবশ্যিক দায়িত্বের মধ্যেকার সীমারেখা নির্দেশ করে উল্লেখিত বিষয়গুলি সেই সীমারেখার কেন অংশের মধ্যে পড়ে তা বিচার করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা এখন সেই প্রয়োজনে সাজা দিচ্ছি।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর থেকে ভারতীয় উপনিবেশ শাসনের দায়িত্ব ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সরকারের হাতে অর্থাৎ ব্রিটিশ সংবিধানের এজিন্ডারে আসে। সেই সংবিধানানুসারে ভারতে নিযুক্ত উপনিবেশিক সরকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত মানুষদের ত্রাণের, শিক্ষণ্যত্বে আগ্রহী মানুষদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারণের, জাতিগোষ্ঠীর বা অন্য কোন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের নির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া বিচার-বিশ্লেষণের পর স্বীকৃতিদানের আবশ্যিক দায়িত্ব ছিল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত উদাহরণগুলি নির্বাহ পক্ষপাতিত্ব বা অনাকুল্যের মধ্যে পড়ে না, আবশ্যিক রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। আর সেই দায়িত্ব পালনে পক্ষপাতিত্ব ছিল কিনা তা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে অবশ্যই বিচার্য বিষয়।

সেই ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এবং পরবর্তী সার্ববিধানিক ব্রাঞ্চে আমাদের নির্বাহ পক্ষপাতিত্বের কয়েকটি ভুলস্ত উদাহরণ তুলে ধরার বাধ্যতা আমাদের আছে। সমগ্র ব্রিটিশ আমলের অবাধ অনাকুল্যের কয়েকটি হল—(ক) ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং দেওয়ানি লাভের (১৭৬৫ খ্রিঃ) পর কোম্পানির কর্মচারি ইত্যাদির এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সুদক্ষ কৃষক-কারিগরদের উৎপাদিত সম্পদ অবাধে লুণ্ঠনের অকৃত্রিম সগরকরণে অবাধা সম্প্রদায় সমূহের পুরোহিত, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, ভবঘুরে ইত্যাদি সুযোগসম্পন্নীদের প্রিন্স ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত আভিজাত্যের শীর্ষে উত্তোলন,

(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (The Permanent Settlement, 1793) সূত্রে সেই অভিজাত সগরকবর্গকে সমস্ত জমির মালিকানাযুক্ত জমিদারি প্রদান এবং কৃষকদের প্রথমে রায়তি স্থিতিবান প্রজার এবং তারপর খানকড়ারি ঠিক প্রজার পরিণত করার জন্য নজিরবিহীন শোষণ-পীড়নের নির্বাহ অধিকার প্রদান।

(গ) সেই অভিজাতবর্গের জাতিগোষ্ঠীদেরই আধুনিক শিক্ষার এবং চাকরির নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান।

(খ) ব্রাহ্মণ বংশাভিজাতের ভিত্তিরূপে আর্থজাতির দ্বারা তত্ত্বকে সত্যরূপে কোম্পানির আমল থেকে শুরু করে পার্লামেন্টারি আমল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাদানের পরোক্ষ অথচ সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা।

(ঙ) ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি সরকারের অর্থ-প্রত্যক্ষ তত্ত্ববধানে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে Indian National Congress নামক রাজনৈতিক দল ভারতীয় অভিজাত-তত্ত্বীদের উপস্থর প্রদান। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে Indian Muslim League নামক রাজনৈতিক দলখনেনেও ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতা।

এগুলির একটিও আবশ্যিক রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের তালিকায় স্থানলাভ করে না; তাই এসব হল অবাধ পক্ষপাতিত্ব। লক্ষ্যণীয় শুধু এই যে, এই সব আনুকূল্য অভিজাতবর্ণের উপরই বর্ষিত হয়েছিল।

অতঃপর আমরা আলোচ্যগ্রন্থে উল্লেখিত ব্রিটিশ সরকারের ‘নমঃশূদ্রদের প্রতি’ আবশ্যিক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে পদ্ধতিগত পক্ষপাতিত্ব ছিল কিনা তা বিচার বিশ্লেষণে ব্রতী হতে পারি। তাই আমাদের প্রাথমিক বিচার ফরিদপুর-বরিশালে ত্রাণ বিতরণ প্রসঙ্গ।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর, কেটিলিপাড়া এবং গোপালগঞ্জ থানার বিত্তীর্ণ অঞ্চলে কন্যার ফলে শস্যহানিতে ভরস্বর দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। ঐ অঞ্চলে ‘নমঃশূদ্র’রা সংখ্যাগরিষ্ঠ বসবাস করেন। সুতরাং দুর্ভিক্ষে তাঁরাই যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তালুদা ধানকড়ারি ঠিকাপ্রজা প্রথা প্রবর্তন এবং তার দৌলতে ঐ কৃষকদের ফলানো কসল আত্মসাতে সঞ্চিত ধান-চালের পাইকারি ব্যবসা ফাঁদার অন্যতম প্রবক্তা ডাকসহিটে জমিদার এবং জাতীয়তাবাদী নেতা অধিকাংশ মজুমদারের ফরিদপুর সুহৃদসভার ত্রাণ বিতরণে দুর্ভিক্ষপীড়িত ‘নমঃশূদ্র’ কৃষকরা কী পরিমাণে বঞ্চিত হয়েছিলেন তা অনুমান করতে পারি; কারণ ধানকড়ারি ঠিকাপ্রজা প্রথা বিরোধী আন্দোলনে আলোচনার ভিত্তিতে আমরা তার আভাস পেয়ে এসেছি। ঐ প্রসঙ্গে আলোচ্যগ্রন্থে জাতীয়তাবাদী উদ্যোগ সম্পর্কে আর যা কিছু বলা হ’ক, কিন্তু অকপট স্বীকৃতি আছে যে ফরিদপুর সুহৃদ সভার ত্রাণভাণ্ডার অচিরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল [“... soon the samiti ran out of funds: ...”, p55]। সুতরাং সরকারের ত্রাণদপ্তরের এবং মিশনারিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের মধ্যে ত্রাণকার্য

পরিচালনার আবশ্যিক দায়িত্বকে পক্ষপাতিত্বের তালিকায় ফেলা যায় না।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পূর্বোক্ত কারণে ফরিদপুর-বরিশাল জেলা দুটির সীমান্তবর্তী বিত্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল। ঐ অঞ্চলেরও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হলেন ‘নমঃশূদ্র’ কৃষক ধারা জাতীয়তাবাদী উচ্চস্তরের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের পরিবারের ধানকড়ারি ঠিকা প্রজারূপে ধান-চালের বিশাল পাইকারি কারবারের রসদ জুগিয়ে কতুর হয়েছিলেন। ঐ বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতার স্বদেশ বান্ধব সমিতিও ত্রাণকার্যে এগিয়ে এসেছিল। আলোচ্যগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বদেশ বান্ধব সমিতির ত্রাণকার্যে দরিদ্র ‘ভদ্রলোকদের’ মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ দুর্ভিক্ষপীড়িত ‘নমঃশূদ্র’ কৃষকদের ত্রাণের দায়িত্ব খ্রিস্টান মিশনারিদের এবং সরকারি ত্রাণ দপ্তরকেই গ্রহণ করতে হল।

“But while the swadeshi relief fund. ... was largely used for the benefit of the ‘bhadrakalok’ classes, the christian missionaries... did excellent work among the distressed Namasudra peasants of the bil tracts, in co-operation with the government officials.” [p56.]

সুতরাং আলোচ্যগ্রন্থের উদ্ধৃতি অনুসারেই ব্রিটিশ সরকারের এবং মিশনারিদের ত্রাণকার্যে মানবিক কর্তব্য পালনের জন্য প্রশংসা এবং স্বদেশবান্ধব সমিতির ইমতাই সূচিত হচ্ছে। ঐ গ্রন্থের বিষয়গত আলোচনার মধ্যে অবশ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত ‘নমঃশূদ্র’দের প্রতি ত্রাণ বিতরণে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্বের (Protective Discrimination) কোন উদাহরণ বুঁজে পাওয়া গেল না।

কিন্দালয় অনুমোদন, অনুদান এবং ছাত্রবাস প্রতিষ্ঠা :

নমোজ্ঞাতির শিক্ষার প্রতি আকৃতি ছিল প্রবল। তা আলোচ্যগ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে। এক সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ফরিদপুর জেলাতেই তাঁরা বালকদের জন্য ১১৭টি ও বালিকাদের জন্য ৪০টি নিম্নপ্রাথমিক কিন্দালয়, ৯টি উচ্চপ্রাথমিক কিন্দালয় এবং অষ্টটি মধ্য ইংরেজি কিন্দালয় পরিচালনা করতেন।

“According to a report, eight Middle English Schools, nine Upper Primary Schools, 117 Lower Primary Schools for boys and forty Lower Primary School for girls, managed by the

Namasudras in Foridpur, ... apart from fifteen Board Primary School exclusively for them.” [p105.]

উদ্ধৃত এই রিপোর্টের শেষাংশে তাঁদের জন্যই কেবল ১৫টি বোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ এর দ্বারা প্রথমত বোঝা যাচ্ছে, ভ্রমলোকদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে তাঁদের শিশুদের ভর্তির সুযোগ না মেলায় দরিদ্র নমোরা নিজেরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় বাধ্য হয়েছিলেন; তদ্ব্যতীত বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা সম্ভ্রমদের শিক্ষার জন্য প্রবল আন্দোলনের ঢেউ তুলেই বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

আধুনিক শিক্ষার প্রতি নমোজাতির প্রবল আগ্রহ, ‘ভ্রমলোক’দের অমানবিক বাধা উপেক্ষা করে তাঁদের নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি আদায় শুধু ফরিদপুর জেলার একক বৈশিষ্ট্য ছিল না, সমস্ত নমোপ্রধান্যময় জেলাগুলিরই বৈশিষ্ট্য ছিল।

কিন্তু তাঁরা সর্বকালে শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। সংস্কৃত ও পারসি প্রতিপক্ষে তাঁরা নিজস্ব ব্যবসায়িক বিদ্যাকে ধরে রেখেছিলেন। আমরা পূর্বে উল্লেখও করেছি যে তাঁদের কাছে ঊনবিংশ শতাব্দির শেষদিকে খরোটি মিশ্রিত ব্রাহ্মী লিপিতে প্রকৃত ভাষায় লেখা নানা ব্যবসায়িক বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাদিও ছিল। তাই নমোরা কোনক্রমেই অস্বীকৃত ছিলেন না। স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা সামাজিক অযোগ্যতার সূচক সংস্কৃত শিক্ষা এবং পারসি শিক্ষাকে বর্জন করলেও সমাজ প্রগতির সূচক আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রবল আন্দোলনে বাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আর সেই আন্দোলনকে কেনমতেই অস্বীকার করতে না-পেরে ব্রিটিশ সরকার তাঁদের প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন এবং বার্ষিক অনুদানের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কলকাতা এবং ঢাকার ছাত্রাবাসগুলিতে ব্রাহ্মসমাজের তাঁদের প্রবেশাধিকার রোধ করে রেখে নমো সম্ভ্রমদের উচ্চশিক্ষালাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল তাঁদের পৃথক ছাত্রাবাসের জন্য আন্দোলন চলে এবং আন্দোলনে জয়লাভও (১৯১৮ খ্রিঃ) হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল এই যে, ‘রাষ্ট্রভক্ত’ সুরেন্দ্রনাথ

বন্দোপাধ্যায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় এবং কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে সেই পৃথক ছাত্রাবাসের জন্য একাধিকবার সরব হয়েছিলেন বটে তবে সাধারণ ছাত্রাবাসগুলির দ্বারা তাঁদের জন্য বুলে দেওয়ার মত উদারতা এবং সংসাহস দেখাতে পারেননি। তদ্ব্যতীত ‘রাষ্ট্রভক্ত’র সরবতাও স্বতঃস্ফূর্ত নয়, উদ্যোগটি প্রথম গ্রহণ করেছিলেন নীলরতন সরকার।

ব্রাহ্মণপ্রতিরোধ চূর্ণ করে উচ্চশিক্ষালাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নমোদের প্রবল আন্দোলনে অভিজ্ঞত বিপ্লবী শিক্ষাব্রতী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর একাধিক দরদি উদ্যোগের মধ্যে সর্বশেষ উদ্যোগটি নমো ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে এমনভাবে প্রকাশ্যে নিয়ে আসবে তা তিনি নিজেও ভাবেননি। আলোচ্যগ্রন্থের মতে ড. সর্বাধিকারীর শেষ উদ্যোগ ছিল এমনই।

["... he pleaded, as these students could not get admission to any mess except through deception, i.e., by concealing their real caste identity by adopting kayastha surnames. He therefore, wanted the government to consider the proposal sympathetically, so that the university could start immediately a hostel for about thirty or forty Namasudra boys." p102

(বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের কাছে উপাচার্য অর্থের জন্য অ্যাকেন করেন যাতে সেই অর্থে ৩০ থেকে ৪০টি নমঃশূদ্র ছাত্রের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি ছাত্রাবাস অর্থাৎ নির্মাণ করে তাঁদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন আর তাঁদের আত্মপরিচয় গোপন করে কয়েক উপাধিতে ছাত্রাবাসে ভর্তির সমস্যাটিও মিটে যায়।)

আর তার প্রত্যুত্তরে সরকারের তরফে DPI Mr. Hornell-এর প্রতিক্রিয়া এইভাবে প্রকাশিত হল :

["If a Namasudra can by simple device of calling himself 'Ghose' pass as a Kayastha, we need scarcely hold up our hands in horror and unloose the public purse strings." p103

(একজন নমঃশূদ্র যদি ‘ঘোষ’ পদবি ব্যবহার করার মত অস্তি সহজ পদ্ধতিতে

‘নিম্নবর্ণের’ কলিত ইতিহাসে বাংলার ‘নমঃশূদ্র’দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

কায়স্থ হলে সমস্যা মিটে যায়, তা হলে জনস্বার্থে ব্যয়ের টাকা আমরা সেই সমস্যা সমাধানে খরচ করতে পারি না।)।

স্বভাবত পরবর্তী বাজেটে (১৯১৭-১৮) সরকারি পদক্ষেপে বেধুন কলেজের ছাত্রীদের আবাসের সম্প্রসারণে সেই অর্থ বরাদ্দ করা হল।

["The government therefore concluded that the improvement of the girls hostel attached to the Bethune College in Calcutta was a more urgent reform for the furtherance of female education in this Presidency and decided to spend the anticipated savings on this project." [p103]

(অতঃপর সরকার বাংলা প্রেসিডেন্সির নারী শিক্ষায় গতি সক্ষমের ন্যায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপরূপে বেধুন কলেজের ছাত্রী আবাসের সম্প্রসারণে সেই অর্থ বরাদ্দ হল।)।

আলোচ্যগ্রন্থে বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে যে ব্যাখ্যা এবং মন্তব্যাদি থাক না-কেন এই মূল ঘটনা থেকে ‘নমঃশূদ্র’দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে না, বরং ব্রাহ্ম্যভিজাত্যের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অস্বাচিত অনাকুল্যই প্রদর্শিত হচ্ছে এবং নমোদের প্রতি রাষ্ট্রীয় আবশ্যিক দায়িত্ব পালনে মরাধক অবহেলা এবং কথকটে লালিত তাঁদের মেধাবী ছাত্রদের সমাজকৃত করে ব্রাহ্ম্য শিবিরে ঠেলে দেওয়ার ভয়ঙ্কর অপচেষ্টা লক্ষিত হচ্ছে।

চাকরিতে সংরক্ষণ :

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে সরকারি চাকরি সংরক্ষিত ছিল ব্রিটিশদের এবং প্রধানত বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যদের জন্য; তবে পরে কোম্পানির সার্বভৌমত্বের সম্প্রসারণের ফলে বাঙালি ‘উচ্চবর্ণের’ হলে ভারতীয় ‘উচ্চবর্ণ’-এর সংরক্ষণ অঘোষিত ভাবেই প্রচলিত ছিল।

ভারতীয় উপনিবেশে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি শাসনের প্রবর্তনের ফলে গ্রেট ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইন-কানূনের বাধ্যতা ভারত শাসনের ক্ষেত্রেও আবশ্যিক হয়ে পড়ল। স্বভাবতই ভারতের বহুবিভক্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্যবহারযোগ্য অংশগুলি সনাক্ত করে এবং দক্ষিণে পুষ্ট করে তুলে প্রতিপক্ষকে অথবা সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে দক্ষতার সঙ্গে বশীভূত অথবা নিপীড়িত

সুনীল কুমার রায়

করার পক্ষে বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং প্রয়োগই সেই বাধ্যতার ফলস্রুতি।

সুতরাং ভারতীয় উপনিবেশে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি শাসন প্রবর্তনে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হল না, তবে প্রশাসনিক প্রথা-প্রকরণে এবং প্রয়োগ কৌশলে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটল। সেই অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপে যেমন নির্দিষ্ট আইনের উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হ’ল তেমনই ক্ষেত্র বিশেষে নমনীয়তাও লক্ষ্য করা গেল।

ব্রিটিশের অবিমিশ্র ব্রাহ্ম্য পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রপটে নিপীড়িত জাতিবর্ণের চাকরিতে এবং রাজপ্রতিনিধিত্বে সংরক্ষণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী কর্মধারায় সেই কৌশলগত নমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই দুটি বিষয়ে তাই কিঞ্চিৎ আলোচনার অবকাশ আছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রাদেশিক সরকারই সর্বপ্রথম জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর সরকারি অধিকার স্বীকার করে নেন (১৮৮১ খ্রিঃ)।

"In 1881, the Bombay government... had laid down the important principle that in distributing public patronage endeavour should be made to secure a due admixture of the various races and castes in the service of the government." [p59]

(সরকারি চাকরির সুযোগদানের ক্ষেত্রে এমন সতর্ক উদ্যোগগ্রহণ করবেন যাতে চাকরির ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের একত্রে মেলামেশার এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।)

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ যাবত কাল শিক্ষার অঙ্গন থেকে বহিষ্কৃত নিপীড়িত জাতিবর্ণের ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত না-করে সেই সৃষ্টি এবং সৃষ্টি মেলামেশার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং এই অবস্থায় সরকারি সব নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে চাকরির সুযোগ দিলেও অফিসের ঝাড়ুদার এবং মজ-মুত্র পরিষ্কারকের চাকরি ব্যতীত পিণ্ডনের চাকরিও দিতে পারবেন না; ফলে চাকরির সুযোগদানের নামে অফিসেও ব্রাহ্ম্য জাতিভেদপ্রথা জঁকিয়ে বসবে, এই সত্যটি সরকারের কাছে অবিলম্বিত ছিল না। বস্তুত জ্ঞাত সারাই বোম্বাই প্রাদেশিকসরকার প্রশাসনিক কৌশলগত এই ‘নমনীয়তা’র অগ্রসর

নিরেছিলেন।

তার মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় (১৮৮৬ খ্রিঃ) বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রাদেশিক সরকার চাকরি প্রদানে আর সেই সর্বজনীনতার মুখোশটিকে ধরে রাখতে পারলেন না, সরকার শুধু সংখ্যাগুরু এবং প্রভাবশালী মুসলমানদের হতাশা দূর করার জন্য তাঁদের চাকরি প্রদানের বিশেষ সুযোগ দিতে স্বীকৃত হলেন। [p59]

বাংলার সরকারের তীতির কারণ ছিলেন নমো, রাজবংশী এবং পৌত্তরা, যাদের মধ্যে থেকে অচিরে উচ্চপদের দাবিদারদের অগ্রগমন তখনই দৃশ্যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন ছিলেন যথাক্রমে পঞ্চানন সরকার (রাজবংশী, এম.এ., ১৮৯০), কেশবলাল সরকার (নমো, বি.এ., ১৮৯৯) এবং ব্রাইচরণ সরকার (পৌত্ত, বি.এ., ১৯০১); আর তারপর ছিলেন অনেক অনেক কীর্তিমান ব্যক্তি। সমস্ত প্রকারের দুর্জয় বাধা অতিক্রম করে সম্পদহীনদের কুল থেকে আগত এই সব সংগ্রামী বিদ্বানদের উচ্চপদে বসিয়ে অফিসে তো জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করা যাবে না এবং অফিসগুলিকেও সম্পদহীনদের শোষণ-দমন-পীড়নের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা যাবে না। অথচ পার্লামেন্টারি শাসন প্রবর্তনের শর্তে প্রচারিত রূপীয়া ঘোষণানুসারে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রভাবশালী ব্রাহ্মণপ্রধার মর্যাদা দিতে বাধ্য।

“In 1858, when the Indian empire passed out of the hands of the East India Company, the Queen's Proclamation assured the Indian people that due regards would be paid to their ancient rites, usages and customs.” – [Sakhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and the Raj, p 24.]

এই প্রাচীনপ্রথা-পদ্ধতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ‘জাতিভেদ’ নিশ্চয়ই প্রধান। সুতরাং নিপীড়িত এই জাগ্রত শক্তিকে প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে পুষ্ট করে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী এবং অভিজাত মুসলমানদের ন্যায় ব্রিটিশ পুঁজির ভবিষ্যৎ পাহরদার রূপে নিযুক্ত কল্যাণ সরকার করতে পারলেন না। অতঃপর তাঁদের অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপে সরকার নিরন্তর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেই চলেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সচেষ্ট ছিলেন বলেই চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বাইরে তার

উপযুক্ততা নির্ধারণ করার যে শর্ত ছিল তার ভিত্তি নির্দেশ করেননি। তার ফলে চাকরিতে নিযুক্তি শেষ পর্যন্ত নিয়োগকারী অফিসারের ব্যক্তিগত পছন্দের উপরই নির্ভর করত। আর প্রাপ্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সরকারি আমলারা তাঁদের বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতার প্রভাবে নিপীড়িত জাতিবর্ণের প্রার্থীদের শুধু জাতিগত পরিচয়ের কারণেই অযোগ্য বলে স্বীকৃতি করতেন এবং একান্ত বাধ্য হলে শ্রমসাধ্য কিছু নিম্নপদেই স্বল্প শিক্ষিত প্রার্থীদের নিযুক্ত করতেন। [p176]

এর ফলে পূর্ববঙ্গে বহু অফিসই ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যদের পারিবারিক মিসনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলে পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেঃ গভর্নর Sir Lancelot Hare তাঁর প্রতিবেদনে Lord Minto-কে অবহিত করেছিলেন।

“... the frequent exclusion in many offices of all but a few castes of Hindus had sometimes gone so far as to make some offices almost a family gathering.” — [Sakhar Bandyopadhyay, Caste, Protest and the Raj, p54.]

নিপীড়িত জাতিবর্ণের যোগ্যতা সম্পন্ন চাকরি প্রার্থীদের ব্রিটিশ রাজত্বে ধারাবাহিকভাবে প্রতারণার স্বীকৃতি আলোচ্যগ্রন্থেও আছে।

“The allegation were not certainly baseless, as the available evidence suggests that the officials had stereotyped such candidates as generally of poor standards and suitable, if at all, for only certain specific types of manual jobs.” [p176]

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কলীয়া প্রাদেশিক অফিসভায়া (বাণেশ থেকে নির্বাচিত MIA) বসিমুল্লাহ বিশ্বাস সরকারিতে নিযুক্তির উপযুক্ততার মানদণ্ডের অভাবে নিপীড়িত জাতিবর্ণের প্রার্থীদের ধারাবাহিক বঞ্চনার অবসানের দাবির [p176] পাবপ্রেক্ষিতে আলোচ্যগ্রন্থের এই স্বীকারোক্তির পর চাকরির ক্ষেত্রে ‘নমঃশূদ্রদের’ পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্ব-প্রসঙ্গের কোন গুরুত্ব থাকে?

**রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব :**

নমোদের জনসংখ্যার অনুপাতিক হারে চাকরি এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি এবং সেই প্রতিনিধিদের পৃথক নির্বাচনের দাবি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে All India Depressed Classes Association-এর দাবিতে পরিণত হয়েছিল।

‘কলিকাতার জালগ্রাউন্ডি ফ্রায়াসে’ এই Association-এর সংস্থান মঞ্চ থেকে ০১/১১/১৯১৭ তারিখে উদ্বাপিত এই দাবিগুলি অচিরে ‘বোম্বে’, ‘মাদ্রাজ’ এবং নিম্নলিখিত ক্ষমিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। প্রবল জনসমর্থনে পুষ্ট এই সংগঠনের আন্দোলন সারা দেশে তীব্র আকারে ছড়িয়ে পড়ার সূচনায় ব্রিটিশ সরকার তার গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের মনোনিবেশের শৃঙ্খলে আইনসভার রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব দানের এবং নির্বাচিত হওয়ার জন্য The Government of India Act 1919-এ তার আইনি সংস্থান তৈরি করেন। তার ফলে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে বরিশাল থেকে নমোজাতির প্রথম নির্বাচিত প্রতিনিধি হলেন নীরোদ বিশ্বাসী মল্লিক এবং ঘটনাক্রমে ঐ বছর গভর্ণরের মনোনীত প্রতিনিধি হলেন ঐ জাতির ভীষ্মদেব দাস। আইনসভার কার্যবিবরণীর মধ্যে নির্বাচিত মানুষদের স্বার্থে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের আদর্শ ভূমিকার সাক্ষ্য এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী রূপে মোহিনীমোহন দাসই একমাত্র নমোজাতির পক্ষে থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর পার্টিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নির্বাচিত মানুষের স্বার্থে সচিব হয়েছিলেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের কেউই নির্বাচিত হতে পারেননি, তবে গভর্ণরের মনোনীত সদস্য হয়েছিলেন রেবতীমোহন সরকার। The Bengal Tenancy (Amendment) Bill 1928-এর আলোচনায় চাষি-কৃষকের প্রতিনিধিদের ভূমিকার রেবতীমোহন সরকার এবং রাজবংশী নেতা রূপনারায়ণ রায়ের সংসদীয় সংগ্রামের তেজস্বিতা আমরা সর্বদা স্মরণ করি।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে স্বরাজ্য পার্টির মোহিনীমোহন দাসই কেবল নমোজাতির প্রার্থী রূপে জয়লাভ করেন। নির্বাচনের পর কোন গুচ্ছ কারণে গভর্ণর একজনের পরিবর্তে তাঁদের দুই জনকে (রেবতীমোহন সরকার এবং মুকুন্দবিশ্বাসী মল্লিক) মনোনীত সদস্যের পদে নিযুক্ত করলেন। অতঃপর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে স্বরাজ্য পার্টির নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পদত্যাগ করলেন যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তাঁদের তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল। তাঁরা হলেন—অমৃতাঞ্জন রায় (যশোর), ললিত কুমার বসু (বরিশাল) এবং শরৎচন্দ্র বসু (ফরিদপুর)। এই তিন জনকে নিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক

আইনসভায় তাঁদের জাতির প্রতিনিধি হলেন ৫ জন, যেখানে বাংলার নির্বাচিত জাতিগুলির প্রতিনিধিরা হলেন সর্ব মোট ১০ জন।

গোটা পরিপ্রেক্ষিত অনুসৃত্ত রেখে এই নমোপ্রাধান্যের জুজু দেখিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার Indian Franchise Committee-এর কাছে এ রাজ্যে নির্বাচিত জাতিসমূহের পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করলেন।

সুতরাং বোঝা গেল যে, সাইমন কমিশন গঠন করে নির্বাচিত জাতিবর্ণের পৃথক নির্বাচনের যৌক্তিকতা বিচার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার দুজন সদস্যকে মনোনয়নদানে গভর্ণরের বদন্যতা এবং তাতে স্বরাজ্য পার্টির মৌনতাব্যঞ্জক সার ভল ট্রিটিশ-রাষ্ট্রপাচারের সেই বড়যন্ত্র ঘাতে কৌশলে নমোদের প্রাধান্যের অজুহাত সৃষ্টি করে বাংলার নির্বাচিত জাতিগুলির পৃথক নির্বাচনের দাবিকে নাকচ করে সারা ভারতে নমোনেতৃত্বের প্রধান অস্ত্রটিকে এবং সেই সুবাদে তাঁদের নেতৃত্বকে চূর্ণ করা যায়।

এই শড়যন্ত্রকে যদি ‘নমঃশূদ্র’ের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্ব” প্রদর্শনের উপায়রূপে উপস্থাপনের গলদঘর্ম প্রচেষ্টার নাম ইতিহাস চর্চা হয় তবে সেই ঐতিহাসে ‘নমঃশূদ্র’-দের প্রয়োজন কী?

একতারা উদ্বাপিত সকল বিষয়ে আলোচনার শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সেগুলিকে উপযুক্ত প্রেক্ষাপটে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়নি। আর নমোরা বাস্তবতাত্ত্বিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অনুগত সেবকের ভূমিকা গ্রহণ না করে বরং সমগ্র দেশের নির্বাচিত জাতিবর্ণের মানুষদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশভোগ্যতা পাবলিখে উর্ধ্বে তুলে ধরার ‘অপরোধে’ আলোচ্যগ্রন্থে এইভাবে ‘নমঃশূদ্র’দের বদাধারে টিকিত করা হয়েছে।

# রেনেসাঁস ও বাংলার মুসলমান সমাজ

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলার কলকাতাকেন্দ্রিক যে তথাকথিত রেনেসাঁস সূচিত হয়েছিল তাকে আদৌ রেনেসাঁস বলা যায় কিনা তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। সেই রেনেসাঁসের প্রকৃতি, কারণ ও ফলাফল নিয়েও পরস্পরবিরোধী মতামত আছে। কিন্তু একটি ব্যাপারে অনেকেই একমত যে এই রেনেসাঁস বাংলার মুসলমান সমাজকে তেমনভাবে স্পর্শ করেনি। একে রেনেসাঁস বলা যায় কিনা সেই বিতর্কে প্রবেশ না করে আমরা বরং দেখি রেনেসাঁসের ঐতিহাসিকরা মুসলমান সমাজের প্রসঙ্গটিকে যেভাবে দেখেছেন তা কতদূর সঠিক? আমরা এই নিবন্ধে দেখব মুসলমান সমাজে একটি বিলম্বিত জাগরণ হয়েছিল। নানা বিতর্কনার মধ্যে দিয়ে সেই জাগরণ তাদের একটি ঠিকানাতে পৌঁছে নিয়েছে।

মুসলমান সমাজের প্রসঙ্গটি মাথায় রাখলে আমরা বঙ্গীয় রেনেসাঁস সম্পর্কিত আলোচনাগ্রন্থগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) না-আলোচনা বা প্রায় না-আলোচনা; (২) অল্প আলোচনা বা নগণ্য আলোচনা; (৩) সদর্থক আলোচনা।

## ১. না-আলোচনা

মুসলমান সমাজের প্রসঙ্গ আলোচিত বা প্রায়-অন্যায়চিত রয়েছে এমন গ্রন্থগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ভারত বা বাংলাদেশে মুসলমান-বর্জিত একটি পৃথিবী এইভাবে এক ধরনের গ্রন্থ লেখা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের 'ভারতের নবজন্ম' বা David Kopf এর British Orientalism and Bengal Renaissance এই ধরনের গ্রন্থ।

বিজ্ঞাতীয় বিপ্লবতা নিয়ে এক ধরনের গ্রন্থ লেখা হয়েছে যেন মুসলমান সমাজের উপস্থিতিটাই বাংলার রেনেসাঁসের পক্ষে একটা বিড়ম্বনা। এই মানসিকতার গ্রন্থ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের 'Glimpses of Bengal in the 19th Century' ... আরেক ধরনের গ্রন্থে রেনেসাঁসের দুর্বলতার দিকটা দেখানোর জন্যে মুসলমান সমাজের প্রসঙ্গটি আনা হয়েছে। কিন্তু এ উল্লেখ উপেক্ষমাত্র। শ্রীসুশোভন সরকারের 'On the Bengal Renaissance'-এর

১৭০

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

কথা বর্তব্য।

## ২. অল্প আলোচনা বা নগণ্য আলোচনা

রেনেসাঁস সম্পর্কিত কিছু গবেষণা গ্রন্থ যেখানে মুসলমান সমাজের প্রসঙ্গ অগ্রাহ্য বা নাড়াচাড়া করা হয়েছে। রেনেসাঁসের বৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অনালোকিত ভূমি হিসাবে এসেছে মুসলমান সমাজের কথা। এসব গ্রন্থে পারতপক্ষে নির্দেশ করার চেষ্টাও হয়েছে কেন তারা রেনেসাঁসের বৃত্তে প্রবেশ করতে পারেনি সে বিষয়ে। শ্রীসুশীলকুমার গুপ্তের 'উনবিংশ শতাব্দিতে বাংলার নবজাগরণ', A. F. Salahuddin-এর 'Social Ideas and social changes in Bengal 1818-1835'; শ্রীধ্বপনকুমার বসুর 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস' এই গাতীয় গ্রন্থ। মুসলমান সমাজের প্রসঙ্গ এদের গ্রন্থে নগণ্যক আলোচনার পর্যায়সত্তা হয়েছে তার কারণ এদের আলোচনার সময়সীমা সীমাবদ্ধতা। শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত আলোচনা করেছেন ১৮০০ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আর শ্রীধ্বপনকুমার বসুর আলোচনা সময়সীমা ১৮২৬-১৮৫৬। আমরা পরে দেখব এদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে মুসলমান সমাজের বরফ গেলেনি।

## ৩. সদর্থক আলোচনা

শিল্পে হলও মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে জাগরণ এসেছিল এই ধরনের সদর্থক ও তথ্য প্রমাণের সাহায্যে কিছু কিছু গবেষণা গ্রন্থে বা আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের 'Creative Bengal' (১৯৬৪), আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৭-১৯১৮) ১৯৬৪, কাজী আবদুল মাল্লার 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (১৯৬৯), রশীদ আল হাফিজীর 'মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া' (১৯৮১), শ্রীঅমলেন্দু দেবের 'বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' (১৯৮৭), ওয়াকিল আহমদের 'উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা' (১ম ও ২য় ভাগ) ১৯৮৩, মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 'সাময়িক পরে জীবন ও জনমত' (১৯৭৭), খোন্দকার সিরাজুল হক-এর 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজ চিন্তা।

চরমোৎকর্ষ ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬-এ 'মুসলমান সাহিত্য সমাজ'র আত্মপ্রকাশ ও আন্দোলনে প্রদীপ্ত হয়েছে। দুই রেনেসাঁস এই পর্বে

১৭১

এনে মিলেছে এক বিন্দুতে।

মুসলমান সমাজে জাগরণের সূচনা থেকেই রিভাইভালিগামের যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল তা তাদের নিজে যার দেশভাগের পথে। তাদের পৌঁছে দেয় পূর্ব-পাকিস্তানে (১৯৪৭)।

বাঙালি মুসলমান সমাজে রেনেসাঁসের সর্ধর্ক সভা জয়যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিতে (১৯৭১)।

এখন একে একে বক্তব্য সূত্রগুলি বিশদ করা যাক :

#### প্রথমার্ধে রেনেসাঁস বৃত্তের বাহিরে

কবীন্ড রেনেসাঁসের মূলকথা যদি 'medievalism'—থেকে 'modernism'—এর দিকে যাত্রা হয় তবে তার কারণগত উপাদান (cause element) পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি। মেকল লিখেছিলেন—

'What the Greek and Latin were to the contemporaries of (Thomas) More and (Roger) Ascham, our tongue is to the people of India. The literature of England is now more valuable than that of classical antiquity.'

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান সমাজ রেনেসাঁসের সেই কারণগত উপাদান থেকে দূরে ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার সঙ্গে কেন তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি তার অনেক কারণ নির্দেশ করা যায়। তার মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি এইরকম :

- ক. ব্রিটিশরা মুসলমানদের স্থলিত করেছিল রাজ্যের জাতির মর্বাদ বোকে সেই কারণে তাদের প্রতি স্বাভাবিক বিরূপতা।
- খ. ওয়াহাবী আন্দোলনের ঘোষিত জিহাদতত্ত্ব। কলা হয়েছিল ভারত দার-উল-হুদায়া। বিঘ্নী শাসকের দেশ শত্রুর দেশ। প্রথমে এটি উচ্চাচারিত হয় শিখদের বিরুদ্ধে তারপর প্রযুক্ত হয় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। সুতরাং ঘোষিত তত্ত্বের কারণে তাদের ব্রিটিশ বিরোধিতা ছিল।
- গ. ঐতিহাসিক A. F. Pollard মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকার উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন—'Where you had no middle class, you

had no Renaissance and no reformation.' বিনয় ঘোষ লিখেছেন—'পোলার্ডের এই উক্তি ও যুক্তির সমর্থন আধুনিক ইতিহাস ধারার মধ্যে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের মতো বাংলাদেশের ইতিহাসও প্রধানত মধ্যবিত্তের দ্বাতে গড়া।' নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেছেন—মুসলমান সমাজে আশরাফ (অভিজাত) শ্রেণি ছিল আতরাক (নিম্নবৃত্ত) শ্রেণিও ছিল কিন্তু সেই অর্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল না।'

- ঘ. রেনেসাঁস হয়েছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করে। কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থানহেতু হিন্দুপ্রধান জেলা হুগলী, হুগুড়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর থেকে হিন্দুদের পক্ষে বিকাশমান নতুন জীবনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের দূরবর্তী জেলাগুলি থেকে মুসলমানেরা তেমনভাবে আসতে পারেনি।
- ঙ. মুসলমানদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। ভূমির স্থায়ী আর্থিক নির্ভরতা ত্যাগ করে শহরের অনিশ্চিত আর্থিক জীবনের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়নি।
- চ. আহমদ ছল বলেছেন—সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক ঘটনা পরম্পরার চাপে বাঙালি মুসলমানদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের মতো। নতুন জীবনরোত তাদের অবস্থানগত ত্তরে সহজে পৌঁছাতে পারেনি।'

#### দ্বিতীয়ার্ধে অবস্থার পরিবর্তন

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে জাগরণের বৃত্তে প্রবেশ করে। জাগরণের কারণগত উপাদান থেকে প্রথম দিকে তারা যে দূরে ছিল দ্বিতীয়ার্ধে সেই দূরত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। এই অবস্থা (situation) পরিবর্তনের ক কারণে আছে। গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি এইরকম :

- ক. ভারতে ব্রিটিশ বিরোধিতার মূল তত্ত্বটি ছিল জিহাদতত্ত্ব। W. W. Hunter-এর 'Indian Mussalmans' গ্রন্থ বাঁদের পড়া আছে তাঁরা জানেন রীতিমতো সভা করে লিখিত বয়ান মারফৎ মুসলমান

ধর্মনেতারা এই জিহাদ তত্ত্বের ব্যাখ্যা বদল করে দেন। কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন :

'1868 the year of Wahabi trail may be regarded as a decisive year for the Mussalmans of Bengal and India as much as it witnessed on the one hand the dying embers of militant wahabism and on the other hand the beginning of the era of Mussalmans loyalty to and co-operation with the British way of governance.'"

খ. এই মনোভাব পরিবর্তনের ব্যাপারে শুধু মুসলমানদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল তা নয় ব্রিটিশদের পক্ষ থেকেও হয়েছিল। W. W. Hunter-এর 'Indian Mussalman' গ্রন্থটি ব্রিটিশদের ভিত্তিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্রমোন্নয়নের যুগে ব্রিটিশরা মুসলমান সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

গ. ইতোমধ্যে মুসলমান সমাজের নবযুগের নেতৃবৃন্দ এসে যান। ইরাজী শিক্ষিত স্যার আবদুল লতফ খান ইরাজী শিক্ষা ও মুসলমান সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ করে পুরাতন মনোভাবের অনড় বরফটি ভাঙেন। ১৮৬৩ সালে 'মহমেদান লিটারারি সোসাইটি' তাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ. ঊনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে পাটশিল্পের বিকাশ ঘটে। ফলে কৃষিজীবী মুসলমান সমাজের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে।" M. N. Roy তাঁর 'India in transition'... গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন : কৃষিজাত পণ্য ক্রিয়ারে ধনতাত্ত্বিক পণ্য ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়।" এরফলে কৃষিজীবী মুসলমান সমাজের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি যেমন হয় সাংস্কৃতিক জীবনে সংক্রমিত হয় নতুন জীবনধারণার বীজ। বাণিজ্যিক চলাচলের পথ ধরে ভৌগোলিক দূরত্বের অতলতা স্বাভাবিক কারণেই অনেকখানি অপসারিত হয়েছিল। ইত্যাদি—

এওলি হচ্ছে ব্রিটিশ ও ইরাজী শিক্ষা সংস্কৃতি সম্পর্কে মুসলমান সমাজের অবস্থান বা মনোভাব পরিবর্তনের প্রেক্ষিত। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে রাজভাষা পরিবর্তনের সরকারি নির্দেশনামার কথা। আগে আরবী ফার্সী পড়ে সরকারি চাকরি পাওয়া যেত। ইরাজী সরকারিভাবে রাজভাষার স্বীকৃতি পাওয়ায় মুসলমানদের সে সুযোগটুকুও গেল।" ইরাজী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা তাদের পক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব হল।

### ৩. অন্যান্য পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে

নবজীবনের দৌড়পায়ায় মুসলমান সমাজ অন্যান্য পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে দৌড় শুরু করেছিল ওয়াকিল আহমদের এই বক্তব্য অস্বীকার করা যায় না। হিন্দু সমাজে আগরণের প্রথমদিক চিহ্নগুলির সূচনা বর্ষ ও মুসলমান সমাজে আগরণের প্রাথমিক চিহ্নগুলির সূচনা বর্ষ পাশাপাশি অনুধাবন করলে—

|      |                                               |      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| ১৮১৫ | রামমোহনের 'আত্মীয়সভা'                        | ১৮৬৩ | আবদুল লতিফের 'মহমেদান লিটারারি সোসাইটি'             |
| ১৮১৭ | 'হিন্দু কলেজ' স্থাপন                          |      |                                                     |
| ১৮১৮ | গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বঙ্গাল গেজেট' প্রকাশ | ১৮৭৫ | 'আলিগড় মহমেদান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' (উঃ ভারত) |
| ১৮৪৮ | বালিকা বিদ্যালয়                              | ১৮৭৩ | আবদুল রহিম কর্তৃক 'বালারঞ্জিকা' প্রকাশ              |
| ১৮৫০ | এরপর বাঙ্গালা সাহিত্যের কর্মমুখী বিকাশ        | ১৮৯৭ | 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা'                            |
|      |                                               | ১৮৭০ | নাগাদ মোশারফ হোসেনের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ           |

সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের দিক থেকে আনিসুজ্জামান ১৮৭০-কে বাঙালি মুসলমান সমাজে আগরণের সূচনা বর্ষ ধরতে চেয়েছেন।" 'মহমেদান লিটারারি সোসাইটি'র স্থাপনকাল ১৮৬৩-কে সূচনা বর্ষ ধরলেও হিন্দু সমাজের সঙ্গে আগরণের সময়গত ব্যবধান কাছকাছি পঞ্চাশ বছরই থাকে।

### জাগরণের ঘটনাগত লক্ষণ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজে যখন তুমুল আলোড়ন চলছে তখন বাংলার মুসলমান সমাজ যে তিমিরে সেই তিমিরে ছিল। সেই তুলায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটা স্পষ্ট পালাবদল চোখে পড়ে। সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, বাদ-প্রতিবাদ, শিক্ষা-দীক্ষা, সুজ্ঞানশীল-মননশীল সাহিত্যসাধনা সমস্ত দিক থেকেই একটি জাতির জন্মজাগরণ সূচক হতে শুরু করে। ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা' (নয় খণ্ড) গ্রন্থে প্রচুর তথ্য প্রমাণের সাহায্যে মুসলমান সমাজের জাগরণের সেই তরঙ্গভঙ্গগুলি দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন।

ড. আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে দেখিয়েছেন মিশ্র ভাষারীতির জগাঝড়ের পর্ব পেরিয়ে মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা সৃষ্টিশীল সাহিত্য কর্মের বলয়ে কিভাবে উদীর্ণ হয়।

সভা-সমিতির মধ্যে দিয়ে নবজাগরণ যুগের ধর্ম, জাতি সংগঠন, সমাজ সংস্কার, মননশীলতার আন্দোলন দানা বাঁধে। ১৮৫৫—'অঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া', ১৮৬৩—'মহমেদান লিটারারি সোসাইটি', ১৮৭৫—'মাদ্রাসা লিটারারি এন্ড ডিবেটিং ক্লাব', ১৮৭৮—'সেন্ট্রাল মহমেদান এসোসিয়েশন', ১৮৮৩—'ঢাকা মুসলমান সুফি সন্মিলনী', ১৮৯৩—'কলিকাতা মহমেদান ইউনিয়ন', ১৯০৩—'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' ইত্যাদি সভা-সমিতি মুসলমান সমাজের ভালোমন্দ আলোচনায় বে সচেতন সক্রিয়তা দেখিয়েছিল তা 'প্রথমার্ধের হিন্দু সমাজের প্রাথমিক জাগরণ পর্বের মতোই।

পত্রপত্রিকায় মঞ্জুরিত হয় জাগরণ পর্বের লিপি সামাজিক ব্যাকুলতাজলি। শেখ আব্দুর রহিম অন্তত ৯টি পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। বালায়গুজিকা (১৮৭৩), সুধাকর (১৮৮৯), মিহির (১৮৯২), হুফেজ (১৮৯২), মিহির ও সুধাকর প্রভৃতি। মীর মোশাররফ হোসেন সম্পাদনা করেন 'হিতকরী' (১৮৯০), রহমান আলির 'কোম্বিনার' (১৮৯৮), 'এসলাম প্রচারক', এমদাদ আলির 'নবমুর' (১৯০৩), 'আল এসলাম' (১৯১৫) প্রভৃতি অল্প পত্রপত্রিকা সমাজ মানসের আলোড়নকে প্রতিবিম্বিত করেছিল। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তাঁর 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন সাময়িক পত্রে ব্যক্ত মুসলমান সমাজের

জাগরণের ব্যাকুলতার ছবি।

সুজ্ঞানশীল সাহিত্যজগতের দিক থেকে মীর মোশাররফ হোসেনই মুসলিম সমাজের প্রথম আধুনিক সাহিত্যপ্রতিভা। গদ্যকে নবজাগরণের প্রধান ভাষা মাধ্যম (media) বলা হয়। মোশাররফ ছিলেন গদ্যশিল্পী। তাঁর 'বিবাদদিক্ত' (১৮৭৫, ১৮৯১), 'কামদার দর্পণ' (১৮৭৩), 'গোজীক' (১৮৮৯) উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কবি কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' (১৯০৪), ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনলপ্রবাহ', 'বায়নন্দিনী' (১৯১৫), নারী মুক্তির অগ্রদূতী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'পুলতানার পদ্ম' (১৯০৫) প্রভৃতি পাশাপাশি তত্ত্ব ও তথ্যমূলক রচনারও জোয়ার আসে। শেখ আব্দুর রহিমকে এ জাতীয় রচনার পথিকৃৎ বলা যায়। তাঁর 'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭), ইসলামী ইতিবৃত্ত (২ খণ্ড), 'বায়নন্দিনী' আহমদের 'অধিকৃত ও সমাজসংস্কারক' (১৮৮৬), মর্নিজ্জামান ইসলামাবাদীর 'ভারতে মুসলমান সভা', এমকুব আলি চৌধুরীর 'মানবমুক্তি' (১৯২২), রেজাউল্লিহ আহমদের 'গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ' (১৮৯৯ - ১৯০৮), মোহাম্মদ নইমুদ্দিনের বঙ্গাবুদিত 'কোরান শরীফ' প্রভৃতি রচনাদির মধ্যে নবযুগের অনুসন্ধিৎসা মূর্ত হয়েছিল। পুঁথি বিশারদ আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সভা সমিতি, পত্রপত্রিকা, সাহিত্যচর্চা প্রভৃতির মতো মুসলমান সমাজ শিক্ষাদীক্ষার এমপ্রসার, সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ প্রভৃতি দিক দিকেও দেখানো যায় মুসলমান সমাজের অচলারতন প্রবলভাবে নাড়া খেয়েছিল।

### জাগরণের দ্বিমুখী ধারা

বাংলার প্রথম বেনেসীসটির মতোই এই মুসলিম বেনেসীসেরও একটা ওয়ালেফটিকাল চেয়ারা ছিল এবং সে টানাপোড়েন আরো তীব্র। মুসলিম বেনেসীসের দু'মুখে দু'টি ঘোড়া জোড়া হয়েছিল। একটি ঘোড়ার নাম ঐগ্নামিক ঐতিহ্যবাদ অপর ঘোড়াটির নাম আধুনিকতা। মুসলিম সমাজের প্রকৃত উন্নতি ঘনিষ্ঠ হলে ঐগ্নামিক ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ অবগাহন করতে হবে এই মতাদর্শের পাশাপাশি, যুক্তিবাদ ও মানবিকতাবোধের সম্যক অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই, ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে হবে যুক্তি ও উপযোগিতার কলিপাথরে কবে এই চিত্তাধারার তীব্র দ্বাত-প্রতিদ্বাত মুসলিম জাগরণের অন্তর্কর্ষে ঘটে চলেছে। তাদের

সভা-সমিতি, পত্রপত্রিকা, সাহিত্যচর্চার ইতিহাস অনুধাবন করলে এই আন্দোলনটি স্পষ্ট দেখা যায়। মীর মশারফ হোসেন 'গোষ্ঠীবন' লিখলে বা বাকী আব্দুল ওদুদ মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন শুরু করলে অঙ্গকারের শক্তি বিপুলভাবে তাদের প্রত্যাঘাত করেছিল। প্রথম বেনারসের প্রাণপুরুষ রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর-এর বিরুদ্ধে যে আঘাতপ্রবণ সামাজিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল এদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার দেখা যায়। একই ব্যাপার বলা ভাল। রক্ষণশীল ঐতিহ্যবাদের শক্তি এক্ষেত্রে ছিল অনেক বেশি। সেই কারণে বলা হয়েছে মুসলিম জাগরণের ইতিহাস একদিক থেকে তাদের পুনর্জাগরণেরই ইতিহাস (revivalism)।<sup>১৭</sup> তথাপি এই সত্যটি স্বীকার্য যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর মুসলমান সমাজের কোন শিবিরই নিষ্কর্দীপ নিম্নায় নিমগ্ন ছিল না। এই ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে সেই সমাজের বিপুল প্রাণশক্তি ও জাগরণের সত্যটিই প্রমাণিত হয়েছিল।

#### বিভ্রমনার মধ্যে দিয়ে জাগরণ

ঐক্যমিক ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন ও আধুনিকতার পথে অগ্রগমন দুই বিপরীত মতাদর্শের টানাপোড়নে জড়ায় মুসলিম জাগরণকে পথ চলতে হয়েছিল নানা বিভ্রমনার মধ্যে দিয়ে। তার মধ্যে দুটি সংকটশূন্যল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংকট-সূত্রগুলি অনুধাবন করতে না পারলে মুসলিম জাগরণের মৌল চরিত্রটি ভেদ করা সম্ভব নয়।

#### ক. হিন্দু জাগরণ ও পুনর্জাগরণের চ্যালেঞ্জ

মুসলিম সমাজ বহন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাগরণের বৃহৎ প্রবেশানুগ তখন হিন্দু সমাজের জাগরণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা হিন্দু পুনর্জাগরণের পথে। উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধের একটি উল্লেখ্য নাটক এসময় দেখা গেল। প্রথমার্ধে ব্রিটিশদের সঙ্গে হিন্দুদের গলাগলি সম্পর্ক, মুসলিমরা তখন বিকল্প দূরত্বে আবার দ্বিতীয়ার্ধে জাগৃত জাতীয়তাবাদের কারণে হিন্দুরা ক্রমশ ব্রিটিশবিরোধী, মুসলিমরা তখন ব্রিটিশদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে নিবিষ্ট। Jayanti Maitra তাঁর 'Muslim politics in Bengal 1855-1906' গ্রন্থে বুঝ সুন্দর বলেছেন, 'As the Anglo-Muslim gulf was bridged, the Hindu-Muslim gulf widened.'<sup>১৮</sup> হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা পুনর্জাগৃত হিন্দু সংস্কৃতির ক্রমোচ্চ

চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে মুসলিম জাগরণ তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে মুসলিম দাতব্যতালভমে পরিলভ হয়। তার সভা-সমিতি, পত্রপত্রিকা এমনকি সাহিত্যচর্চার এলাকাটি অনুধাবন করলে এই নির্মম সত্যটি প্রতিভাত হয় যে তা যতখানি জাগরণের ক্রিয়াজাত কি ততখানিই হিন্দু পুনর্জাগরণের প্রতিক্রিয়াজাত।<sup>১৯</sup> পাঠ্যেও দেখা যায় বঙ্কিমের উপর রূপটাই বেশি। ইসমাইল হোসেন সিরাজী শাকিশালী লেখক। কিন্তু তার অদ্ব্যত চারখানি উপন্যাস প্রতিক্রিয়াজাত। 'রামানন্দনা' উপন্যাসের উপক্রমণিকায় তিনি পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন হিন্দু লেখকদের প্রতিবাদে তাঁর লেখনী ধারণা। এই প্রতিক্রিয়া যে কোনো শক্তিশালী লেখককে বিকারের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তার উদাহরণ সৈয়দ আবুল হোসেন। তাঁর গুপ্তচালন নাম এই রকম—'দুর্গেশনন্দিনী বা হিজারজ', 'কপালকুণ্ডলা বা মথুরা সতী', 'ইক্ষুর নাম বিববৃক্ষ', 'আনন্দমঠ বা নন্দের কন্দী', 'সীতারাম বা কাগজবাগ'।<sup>২০</sup> মনে রাখতে হবে প্রথমার্ধের হিন্দু সমাজের জাগরণের সামনে অন্যকম কোনো বিপরীত চ্যালেঞ্জ ছিল না।

#### খ. মুসলমান বনাম বাঙালি মুসলমান

বাঙালি মুসলমানের আনুপূর্বিক ইতিহাস একটি পরিচয় সংকটের ইতিহাস। তার শুরু পরিচয় কি? তা নিয়ে দুটি অভিমত আছে, খোন্দকার ফয়জল রাবি তাঁর 'The Origin of the Musalmans of Bengal' (1895) গ্রন্থে দেখাচ্ছে তৎকালে বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই খাস আরব, পারস্য, তুরস্ক থেকে আগত। দ্বিতীয় মতটি সকলেরই জানা। বাঙালি মুসলমান আসলে এদেশের ঐতিহাসিক অদিক কোম সমাজের মানুষ।<sup>২১</sup> সেই অনার্য মানবগোষ্ঠী মাত্র তালুক দ্বারা বিজিত হয়ে বর্ণাশ্রমভিত্তিক বিন্যাসে শূদ্র পর্যায়ে স্থান পেয়েছিল। সামাজিক সুবিচারের আশায় তারা একসময় বৌদ্ধ হন। বৌদ্ধধর্মকে মুখে দেওয়া হলে তারা আসেন ইসলাম ধর্মের আশ্রয়ে। বাঙালি মুসলমান আসলে সেই দুর্ভাগ্য মানবগোষ্ঠী যে সামাজিক সুবিচারের আশায় বারবার ঠিকানা বদল করেছে কিন্তু লাভের লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। এমনকি মুসলমান এই পারদর্শন মগাটও তাদের উপকার তেমন লাগেনি। সামাজিক বা অর্থনৈতিক শোষণের ব্যাপারটা তুলে রেখে শুধু সাংস্কৃতিক সংকটের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে আব্দুল লতিফকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা

কি? তিনি বলেছিলেন আশরাফ শ্রেণির মুসলমানের ভাষা উর্দু আর আতরাফ শ্রেণির মুসলমানের ভাষা বাংলা।<sup>১১</sup> বিশ শতকের গোড়ায় টাইটাস তাঁর 'Indian Islam' গ্রন্থে দেখিয়েছেন বাংলাদেশে উর্দুভাষী মুসলমান ১৭,৮০,০০০ আর বাংলাভাষীরা আতরাফ পর্যায়ের। খুব ভালোভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে নিম্নবর্ণের বাঙালি মুসলমানরা উচ্চবর্ণের অবাঙালি বা উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উপনিবেশের বাসিন্দা মাত্র ছিল।

"It was a natural tendency of the Muslims of the Ulema of the North-West for leadership and religious guidance". (Jayanti Maitra : Muslim politics in Bengal)<sup>১২</sup>

উত্তর-পশ্চিমা উলেমা ও উর্দুভাষী আশরাফ শ্রেণির মুসলমানদের ধর্মীয় উপনিবেশের অঙ্গ-প্রজা হিসাবে বাংলার নিম্নবর্ণের মুসলমান মানবগোষ্ঠী শত শত বছর ধরে শোষিত হয়েছে। দ্বিতীয়বারের জাগরণ বাঙালি মুসলমান সমাজকে আর কিছু নিক না নিক অস্তুত মুসলমান পরিচয়ের অন্তরালে তারা একটি নিগূঢ় সাংস্কৃতিক সংকটের শিকার এই সচেতনতার দিকে তাদের মুখে ফিরিয়ে দিয়েছিল। জাগরণ পর্বের একটি প্রধান সংকট ছিল উর্দু না বাংলা? তাদের জাগরণের ইতিহাস এই মুক্তিই ইতিহাস।

#### রেনেসাঁসের স্বাতন্ত্র্য

সূচনা বিন্দু প্রকৃতি এবং ঠিকানার দিক থেকে মুসলমান সমাজের এই রেনেসাঁসকে বাংলার ইতিহাসে দ্বিতীয় এবং স্বতন্ত্র একটি রেনেসাঁস নামে অভিহিত করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে সৃষ্টিত হিন্দু রেনেসাঁস যে পথ দিয়ে যে পোশাক পরে এগিয়ে গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম রেনেসাঁস ঠিক সেই পথ দিয়ে একই রকম নটকের অভিনয় করতে করতে একইভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। এটা দেখানো যায় কিন্তু তা দেখাতে গেলে মুসলিম রেনেসাঁসের ব্যর্থ প্রতিচ্ছবি বলে মনে হবে। কিছুতেই ধরা যাবে না তার সত্যকার স্বরূপ ও দানটি কি? সুতরাং এই রেনেসাঁসের স্বাতন্ত্র্য ও অবদানগুলি চিহ্নিত করা যাক—

ক, হিন্দু জাগরণ মুখ্যত হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে।

১৮০ / ৩৩২৬

মুসলিম জাগরণের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি জুড়াপ্রাচীন ও আধুনিক কালের মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি বেশ শক্তিশালী cause element হিসাবে কাজ করেছিল। আরবা বিদ্যা, তুরস্কের ইতিহাস, কামাল আতাতুর্কের পরোক্ষ প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল।

খ, মুসলিম জাগরণের ফলে বাংলা ভাষায় মননশীল ও সৃষ্টিশীল রচনার যে ধারা প্রবাহিত হয় তার ঔৎকর্ষগত দিক বাদ দিলেও আবহ ও বিষয়গত দিকটি খুঁজিয়ে বিচার করলে দেখা যায় ঐক্যমিত্তিক ঐতিহ্যের একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যিক দীপ জেপে উঠেছে।<sup>১৩</sup> উৎস বা উপজীব্য বাহ্যিক লিখিত বা উদ্ভূত সাহিত্য সত্যতই সাধারণের সম্পদ। বাংলা সাহিত্যের এটা একটা বড় প্রাপ্তি।

গ, ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের হিন্দু জাগরণের একটি বড় অঙ্গবান হচ্ছে তা এককভাবে কলকাতা কেন্দ্রিক। মফস্বলের সঙ্গে তার যোগ একান্তই ক্ষীণ। মুসলিম জাগরণের ব্যাপারটি যদি খুঁটিয়ে কেউ দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন পত্রপত্রিকার প্রকাশ স্থান, সভা-সমিতির স্থান, কল, পত্র, সাহিত্যিক ও সংস্কারকদের স্থান ও কর্মভূমি শুধু কলকাতা বা ঢাকা নয়, পূর্ব বাংলার বহু প্রত্যন্ত মফস্বল শহরে বিস্তীর্ণ।<sup>১৪</sup>

ঘ, কলকাতার রেনেসাঁসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক দিক হচ্ছে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের ভাগ্যকে তা ছুঁতে পারেনি। তারা যে ভিমিরে সেই ভিমিরে থেকে গিয়েছে। মুসলিম সমাজের রেনেসাঁস যে সেমিক থেকে সর্বধারণের জন্য কোনো স্বর্ণ রচনা করেছিল তা নয় তবে বুকাল ধরে চলে আসা একটি সাংস্কৃতিক সংকট থেকে বাঙালি মুসলমানদের তা উদ্ধার করেছিল। উর্দু বাংলা ভাষা বিতর্কের পথ ধরে নিম্নবর্ণের বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত করেছে তার সাংস্কৃতিক মর্যাদা। আপন ভাগ্যকে জয় করার জন্য সন্তানব্রতের যুদ্ধে যেতেও পিছপা হয়নি। একটি বিভ্রমভাঙিত দুর্বলতার রেনেসাঁসের কাছ থেকে এসব পাওনা কম কিছু নয়। যদি

১৮১ / ৩৩২৬

কেউ মনে করেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সৃষ্টিত কলকাতা কেন্দ্রিক রেনেসাঁসের ভিতর থেকেই এসব ঘটনার জন্ম—একটি রেনেসাঁস মানলেই মুসলিম সমাজের জাগরণ ও বিকাশের বাপারগুলিকেও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, আমরা তাদের সঙ্গে একমত নই। অবশ্য যদি কেউ বলেন বাংলায় কোনো রেনেসাঁসই হয়নি তার সঙ্গে স্বতন্ত্র একটি বিতর্কে বা আলোচনার নামা যেতে পারে—এখানে সে প্রসঙ্গ আনা হয়নি আগেই বলা হয়েছে।

### রেনেসাঁসের ক্রাইমেন্স

১৮৬৩ বা ১৮৭০ সালে যে রেনেসাঁসের সূচনা, নানা বিড়ম্বনা বা সংকট শৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে যার পথ চলা তার ক্রাইমেন্স বা চরমোৎকর্ষ ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ এরকম বলা যায়। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এই দশ বছরে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনে রেনেসাঁসের যদি কোনো সর্বোচ্চ চূড়া থাকে তবে তার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম' নামক গবেষণা গ্রন্থে এই দশ বছরের মুসলিম চিন্তা-চেতনার বৌদ্ধিক ঔৎকর্ষ ও কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেছেন। কাজী আব্দুল ওদুদ, আনোয়ারুল কাবীর, আবুল হোসেন, মোতাজ্জর হোসেন, আবুল ফজল, আব্দুল কাদির প্রমুখ মূলত 'শিখা' পত্রিকাকে আশ্রয় করে ইয়ং বেসলের অনুদান বোড়ো 'ইয়ং মুসলিম' আন্দোলন শুরু করে। পত্রপত্রিকা, সভাসমিতি, সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে এরা মুসলমান সমাজের অচল্যতম বৈভবে আঘাত করেছিলেন তার তুলনা নেই। বুদ্ধিবদ্ধ ও মানবতাবাদের অঠগোড়ায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গগুলিকে দাঁড় করানো হয়েছিল। এরা বলেছিলেন বর্তমান যুগ বুদ্ধির যুগ, বাংলাই আমাদের মাতৃভাষা, সাহিত্যচর্চা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারেনি, প্যান ইসলাম ও বিলাফত আন্দোলন অন্তঃস্বল্প, ললিতকলার চর্চা যদি শাস্ত্র নিষিদ্ধ হয় তবে শাস্ত্র জ্ঞানর চেয়ে সম্মত ও চিত্রকলার চর্চা প্রেয়, হজরত মহম্মদকে দেখতে হবে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে। তার সব ব্যাপারে justify করার প্রয়োজন নেই, আরবী ভাষার খোঁজবা পাঠ অর্থহীন কেননা আরবী আমাদের মাতৃভাষা নয়, বুদ্ধির মুক্তি সব চাইতে বড় জিনিস, হিন্দু মুসলমানদের সমস্যা আল্লাদ নয়, এক—ইত্যাাদি ইত্যাাদি।" একদিক

১৮২ ২০২৬

দিয়ে খাদুনা ওদুদ অন্যদিক দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম এই বুদ্ধির মুক্তি বা মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক সংকট মুক্তির আলোকিত বলয়ে এসে দাঁড়াবেন।" মুসলিম সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে যদি কাউকে আধুনিকতার প্রথম কাণ দিমা। চিহ্নিত করতে হয় তিনি নজরুলই। বাঙালি মুসলমান সমাজের মংকশৃঙ্খলগুলি ছিন্ন করে তিনি বীরের মতো এসে দাঁড়িয়েছেন মানুষের পাখীরা। মীর মোশাররফ হোসেনকেও শেখজীবনে ধর্মীর গোড়ামীর পারে কদম-গুণ করতে হয়েছিল, নজরুল ছিলেন চির বিদ্রোহী—"বল বীর চির উন্নত মম শব্দ।" এই মুসলিম সাহিত্য সমাজ রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে সাহিত্যিক সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন তার কোনো সমতুল্য সম্বর্ধনা কলকাতাতেও তিনি পাননি। রক্ত গোলাপ দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সেই সম্বর্ধনা সভার পথ ও মঞ্চ। এক রেনেসাঁস যেন আরেক রেনেসাঁসের সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষকে বরণ করন আপন। একে। স্বতঃস্ফূর্তকো সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শব্দচন্দ্র ওদুদ, আবুল ফজল এরা যে মানস পরিমণ্ডলের ঐকিক বৃত্তে সে সময় সংস্কারের ভাঙে একথা অনায়াসেই বলা যায় দুই রেনেসাঁস এই কিন্দুটিতে এক জয়সঙ্গম মিলেছিল।

### মুসলিম সমাজের পথ ধরে পূর্ব পাকিস্তানে

মুসলিম সমাজ জাগরণের সূচনা থেকেই দুটি উন্টা চলন দেখা গিয়েছিল। একটি ঐচ্ছিক ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের দিকে। মুসলিম জাগরণ যে একাধে পুনর্জাগরণে পরিণত হয়েছিল এ সত্য অনস্বীকার্য। স্বতন্ত্রাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী যে সামাজিক চিন্তাটি লালিত হচ্ছিল পুনর্জাগরণ বাসের মধ্যে তার সভ্যসমিতি, পত্রপত্রিকা ও সাহিত্যচর্চায় তা অনুকূল পরিষ্কৃতি অনুযায়ী রাজনৈতিক সংস্কারের মধ্যে স্পষ্ট মুক্তি পায়। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ সেই বঙ্গভঙ্গবাদী রাজনৈতিক সংস্কারে যা 'Pro-British and anti-Hindu' যুক্তি ও মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রেনেসাঁসের 'secular' গররটি। সঙ্গে একটি লড়াই গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এ মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সেই আধুনিকতার ধারাটি বিকিরিত করে তার শক্তি ও শৌর্য। কিন্তু এই আন্দোলনের পারকণাধকরা মূলত ছিলেন সংস্কৃতি ও সাহিত্যসেবী। রাজনীতির প্রতি তাদের

১৮৩ ২০২৬

অনীত ছিল। এই সমাজের নেতৃবৃন্দ একসময় মনে করেন তাদের যা বলার ছিল তা বলা হয়ে গেছে। তাদের কাজও সঙ্গ। ঠিক তার পরের বছর ১৯৩৭ সালে মুসলমান সমাজের পাকিতে কাঁধ দেয় মুসলিম লীগ। কেননা ভারতের ইতিহাস এখন যে জাগরণ এসে পৌঁছেছে তাতে রাজনৈতিক সংগঠন সংশ্লিষ্ট নেতৃত্ব ছাড়া আর কারো কিছু করার ছিল না। এবং সকলেই জানেন তার পরের ইতিহাস কি? বাংলার মুসলমান সমাজকে তার পুনর্জাগরণবাদী ধারা পৌঁছে দেয় কুহিম আরবে—পূর্ব পাকিস্তানে। A. F. Salahuddin তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ইরাজী শিক্ষায় হিন্দু সমাজের এগিয়ে যাওয়া ও মুসলমান সমাজের পেছিয়ে পড়ার ব্যাপারটি 'profoundly affected the two communities.' দুটি সমাজের অসম সাংস্কৃতিক বিকাশ পূর্ণ উদ্যমে তাদের স্বতন্ত্র লক্ষ্যের দিকে নিয়ে গেছে। আরো স্পষ্ট কথায় বলা যায় দেশভাগের নিছনে যে কট্টর সম্প্রদায়বুদ্ধি বা স্বাতন্ত্র্যবাদ ক্রিয়াশীল ছিল তার কারণ কেউ খুঁজেছেন ধর্মের মধ্যে, কেউ খুঁজেছেন রাজনীতির মধ্যে। তার সঙ্গে আমরা একটা নতুন কারণ-সূত্র যোগ করতে পারি। দুটি সমাজের জাগরণ যদি একটি রেনেসাঁসের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসত তাহলে পরিণতিটা এইরকম না হতে পারত। দুই রেনেসাঁস থেকে দুই এসের জন্ম।

#### রেনেসাঁসের জয় বাংলাদেশের মুক্তিতে

ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের পাশাপাশি রেনেসাঁসের যে সন্দর্ভ ধারায় তাঁরা স্বাভাবিকভাবে মতো দিয়ে সভ্যসমিতি, পত্রপত্রিকা, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, জননশীল সৃজনশীল সাহিত্য সাফল্যের মধ্যে দিয়ে পথ চলেছিল, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬-৩৬)-এর বৌদ্ধিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যার সাংস্কৃতিক ক্রাইমেজ লক্ষ্যগোচর হয়, উর্দু বাংলা ভাষা বিতর্কের মধ্যে বাঙালি মুসলমানের যে সাংস্কৃতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা চাইছিল ১৯৫২-র পর ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে তা একদিন সত্যিকারের যুদ্ধ পেরিয়ে একটি ইস্ট রাজনৈতিক ভূমিতে পৌঁছায়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় রেনেসাঁসের সেই অন্তর্লীন শক্তি ও সত্যই জয়যুক্ত হয়েছে বলা যায় (১৯৭১)। বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস পরিচয় সংকটের ইতিহাস। রেনেসাঁস তাকে আর কিছু দিক আর না দিক অন্তত তাকে একটি মর্যাদাপূর্ণ পরিচয়পত্র দিয়েছে এবং কলাবাহুল্য সে রেনেসাঁস কলকাতা কেন্দ্রিক

ক- অরোচ্য রেনেসাঁস নয়। বাংলার মুসলমান সমাজের জাগরণ, সংগ্রাম ও ক্ষমতায় পায় শতবর্ষব্যাপী একটি ইতিহাস তার পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল। ১৮৭০ সাল গাঁদ মুসলমান সমাজের জাগরণের সূচনাবর্ষ হয় তবে ঠিক শতবর্ষ পরে এটা ইতোপাঠক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই জাগরণ তাদের স্বাধীনতাচর্চামূলক স্ফিকনার পৌঁছে দিয়েছে। প্রথম থেকেই এই জাগরণের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল পুনর্জাগরণবাদী ধারা ও আধুনিকতাবাদী ধারা। ১৯৪৭-এ রেনেসাঁসের পুনর্জাগরণবাদী ধারার জয় হয়েছিল ১৯৭১-এ জয় হয় রেনেসাঁসের পরাজয়শীল ধারার। বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর দুর্ভাগ্যবীড়িত ইতিহাস একটি গোটা থেকে অনুধাবন করলেও তার সঙ্গে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সৃচিত জাগরণ-এ ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করলে একথা বলাতে পারা যায় এই রেনেসাঁসের অঙ্গিধিত মটো (motto) ছিল 'আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা'। এটা এটা পাল্যকে সেই কারণে রেনেসাঁসের জয়সূচক ঘটনা হিসাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

পরবর্তী ঘটনা বিবৃত করা নিম্নয়োজন। কেননা রেনেসাঁসের মধ্যে উদ্ভূত দুটি পরস্পর স্বতন্ত্র ধারার টানাপোড়েন দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস গঠিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি রাজনৈতিক ঘটনামাত্র নয়—ক্রমজাগ্রত বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর শতবর্ষব্যাপী সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ফল। সে ফলের মালিকানা গাঁদ জন। কেউ অধিকার করে বসে তবে হতাশার কিছু নেই। বাংলাদেশের সংগ্রামশীল সাংস্কৃতিক সচেতনতা ঘুমিয়ে পড়েনি।

#### উপসংহার

নিম্নোক্ত উপসংহারে দু-একটি দিকে আমরা সূর্যী সমাজের দুটি আকর্ষণ করছি :

প্রথমত, মুসলমান সমাজের জাগরণ প্রসঙ্গটি নিয়ে যারা আলোচনাগ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের নাম ও রচনাস্থানের দিকে তাকালে মনে হয় বাংলার বুদ্ধিবীরা একাডেমিক স্তরে আজো প্রকোষ্ঠমুক্ত হতে পারেনি। এই অবস্থাটা কতদিন চলবে?

দ্বিতীয়ত, মুসলমান সমাজের ও তাদের সাহিত্য সাধনার কোনো সর্বস্বীন ইতিহাস লেখা না হলেও ইতিহাস বিক্ষিপ্ত বা সময়বদ্ধ যে সব গবেষণা কর্মগুলি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে সেগুলি চর্চায় ইতিহাস যেভাবে এসেছে এপার বাংলায় রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেভাবে আসেনি। এমন সাহিত্যের ইতিহাস হাতের কাছেই পাওয়া যাবে জসিমুদ্দিন বা মীর মোশারফ হোসেনের নামটাও খুঁজে পাওয়া যেখানে দুধর বাংলা সাহিত্যের কই প্রচলিত ইতিহাসে আখ্যান কাব্যের আলোচনা রত্নাল থেকে নবীনচন্দ্র সেন শেষ হচ্ছে অথচ আব্দুল মজান্নের গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে বাংলাতে আখ্যান-কাব্য রচনার একটি শক্তিশালী ধারা বিংশ শতাব্দীতেও চলছিল। মুসলিম সমাজমানসের বিড়ম্বনা জটিল আগরণের ইতিহাস জানা না থাকলে নজরুল প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইয়ং বেসলের আলোচনা যে গুরুত্ব পেয়েছে বিশ শতকের তিরিশের দশকে মুসলিম সাহিত্য সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গ তার অর্ধেকের অর্ধেক গুরুত্বও পায়নি। অথচ একটি সমাজের এগিয়ে চলার ইতিহাসে এরকম আন্দোলন খুব বেশিবার আসেনি। বাংলাদেশে কই বিক্রির নবসৃষ্ট বাজারের কথা ভেবে মুসলিম সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কিত একটি জোগাড়াতালি সেওয়া নিবদ্ধ নয় বাংলা ও বাঙালি জাতির আধুনিকতার সামাজিক ও সামগ্রিক ইতিহাসের যথার্থ ভিত্তি রচনা করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার জরুরি কাজটি আর কতদিন উপেক্ষা করা হবে?

#### সূত্র নির্দেশ

1. David Kopf : British Orientalism and Bengal Renaissance, University of California, 1969, p. 31; "Most important, perhaps the Hastings inspired amateur scholars brought into being a new concept of the Hindu Golden Age as a legacy for the rising India intelligentsia."
2. R. C. Mazumdar : Glimpses of Bengal in the nineteenth century, Calcutta, 1969, p. 14; "There was a long deterioration in the Hindu society". 'Long

১৮৬

subjection to foreign rule' ইত্যাদি উক্তির মধ্যে মুসলিম শাসন ও মুসলিম সমাজ সম্পর্কে বিবিস্ট মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

S. C. Sarkar : On the Bengal Renaissance, Calcutta, 1979 Edition. 'If did not move on the axis of the upper stratum alone of the society, the bhadraloks, it could not draw in the Muslim community and the masses of the backward Hindus.' Article : Conflict within the Bengal Renaissance, p. 69

H. K. Sharp : Selection from educational records, part-I Calcutta, 1970. p. 111

বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলকাতা, ১৯৬৮ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬৮

এ, তদেব পৃঃ ১৬৮-১৬৯

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ : ইতিহাস গবেষণা, কলকাতা, প্রবন্ধ : বাংলা মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইতিহাসের প্রথম পর্যায়

ওজাকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮০, পৃঃ ৩২

আহমদ ছফা : বাঙালি মুসলমানের মন, ঢাকা, ১৯৮১, পৃঃ ২২; দিনের পর দিন হয়েছে, নতুন ভাবদর্শ এসেছে তরঙ্গ তুলেছে, নতুন রাজশক্তি এসেছে নতুন শাসন পদ্ধতি চালু করেছে, কিন্তু তারা (বাঙালি মুসলমান) মনের দিক দিয়ে অন্ধকূরাকৃতি হ্রদের মতোই বারবার বিচ্ছিন্ন থেকে গিয়েছেন।

A. C. Gupta (ed) : Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpur, 1957, p. 475.

Vera Anstey : The Economic Development of India, London, 1929, p. 279-280

M. N. Roy : India in Transition, Bombay edition 1971, p. 51

১৮৭

১৩. ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার যাত্রা, ২য় খণ্ড, ১৯৮৩, পৃঃ ১০৬; ১৯৩৭ সালে করসী ভাঙ্গা রহিত করে ইংরাজী ও মাতৃভাষায় আদালত ও অফিসের কাজ চলবে বলে ঘোষণা করা হয়। ১৮৪৪ সালে থেকে ভারতীয়দের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বাবস্থা চালু হয়।
১৪. আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৩
১৫. আহমদ ছফা : তদেব, পৃঃ ২৪; 'মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত প্রায় সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ড এই ধর্মীয় পুনর্জাগরণভিত্তিক'
১৬. Jayanti Maitra : Muslim Politics in Bengal 1855-1906, Calcutta, 1984, p. 6
১৭. ওয়াকিল আহমদ : তদেব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩; আনিসুজ্জামান পৃঃ ৩৮৭, 'হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ আর মুসলিম পুনর্জাগরণবাদ স্বতন্ত্র স্রোতার পথে ছুটে গেল।'
১৮. রশীদ আল ফারুকী : মুসলিম মানস : সংস্কার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ১৯৮১, পৃঃ ৪৬-৪৮
১৯. আহমদ ছফা : পূর্ববৎ, পৃঃ ১৯; নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : বঙ্কিমাবী জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ৩০
২০. রশীদ আল ফারুকী : তদেব, পৃঃ ৩৩
২১. Murray T. Titus : Indian Islam, Oxford, 1930 থেকে কাজী আব্দুল মাহমুদ : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১৯৬৯, পৃঃ ৮৪
২২. Jayanti Maitra, Ibid
২৩. কাজী আব্দুল মাহমুদ : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৯৬৯
২৪. ওয়াকিল আহমদ : তদেব; মনতাজীর মামুন : উনিশ শতকে বাংলাদেশে সংবাদ সাময়িকপত্র, ঢাকা, ১৯৮৫
২৫. খোন্দকার সিরাজুল হক : কাজী আব্দুল ওবুদ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ২৫; ১৯২৭ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর এক অনুষ্ঠানের শেষে নজরুল বলেছিলেন—'আজ আমি এক মজলিসে আমার আনন্দবাহী ঘোষণা

করা। বঙ্কিম পর কালরাতে আমার ঘুম হয়েছে। আজ আমি সেখান থেকে মুসলমানের নতুন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই ভারী দায়িত্বে ঘোষণা করে বেড়াবো।'

১৯২৭ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর বার্ষিক সভায় পঠিত প্রবন্ধের তালিকা নিম্নোক্ত: আমদের 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' বা 'বীটন পোস্টার'ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়—

(১) বাঙালি মুসলমান সাহিত্যের সমস্যা কাজী আব্দুল ওবুদ, (২) বাংলার লোকসঙ্গীত : আব্দুল কাদির, (৩) বাঙালি মুসলমানের সমস্যা : রশীদউল আমিন, (৪) বাঙালি মুসলমানের সামাজিক গলন : কাজী আনোয়ারুল কাদির, (৫) হুজুরত মোহাম্মদের প্রতিভা : শামসুল ওলা, (৬) সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান : কাজী মোহাম্মদ হোসেন, (৭) শিক্ষা সমস্যা : মনতাজউদ্দীন আহমদ, (৮) আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত : আব্দুল ওবুদ, (৯) নাট্যচিন্তন ও মুসলমান সমাজ : আব্দুল সালাম হা, (১০) বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা : আব্দুল হোসেন, (১১) মুসলমানের আর্থিক সমস্যা : আনোয়ার হোসেন

Joyanti Maitra : Ibid

A. F. Salahuddin : Social Ideas and Social changes in Bengal (1818-35), Calcutta, 1976, p. 19

শিবনারায়ণ রায় : রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র ও নজরুল সংকেত, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ১৯২; প্রবন্ধ : 'হে কব জাগতে তব

অরুণাশঙ্কর রায় : বাংলায় রেনেসাঁস, কলকাতা, ১৯৭৪, দুইখণ্ড

# পরিচয়ের সংকট পরিচয়ের রাজনীতি

অর্কপ্রভ সন্ধ্যা

সেন্ট পলস কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্ররা তখন সদা সহপাঠীদের সাথে পরিচিত হতে চাইছে :—

- ১. এই তোদের নাম বলতো।
- ২. পরমা
- ৩. সূর্য
- ৪. কৌশিক
- ৫. সুখা
- ৬. গোপাল
- ৭. সিরাজুল
- ৮. অ্যাং (সমবেত কণ্ঠস্বর)
- ৯. আমি সিরাজুল। সিরাজুল ইসলাম
- ১০. ওঃ (সমবেত স্বর)

৩: উচ্চারণে শীতলতা এবং সহপাঠীদের শরীরী ভাষা সিরাজুলকে কেমন যেন বিকল করে তোলে তারপর :—

- ১. তোকে দেখেতো মুসলমান মনে হচ্ছে না
- ২. তুইতো ভালোই বাংলা বলিস।

৩: তাতে 'মেস' কিংগে গ্রামের বাড়িতে বাবাকে সিরাজুলের টেলিকোন—

- ১. আব্বা! এ কোথায় আমাকে পড়তে পাঠালে? এর থেকে কৃষ্ণনগর বা বহরমপুরে পড়তে গেলে ভালো হতো।

১৯০ ✍️ সিরাজুল

অর্কপ্রভ সন্ধ্যা

১: ওদিকে শ্যামল গ্রামের পোড় খাওয়া মানুষ সিরাজুল-এর বাবা (গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেন) ছেলেকে আশ্বস্ত করেন—

- ২. মন দিয়ে পড়াশোনা কর। কারোসাথে খারাপ ব্যবহার করবি না। ৩০ বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে আমারও তোর মতোই দশা হয়েছিল। সময় কেটেছে তবুও আমরা বদলাইনি।

\* \* \* \* \*

৩: রাই গণ্ডা মেল বিজয়ওয়ান ছেড়ে চলাছে। ট্রেন-এ একজন টিকিট নথীক্ষক পেরে পেরে একজন লোক ঘুরছে। বোকাই যায় 'লাগেজ' বওয়া নথীক্ষক একটি বসে শোওয়ার জায়গা চান। টিকিট পরীক্ষক-এর প্রশ্ন :— হোয়াটস ইয়োর নাম? আপন নাম কেয়া হায়?

৪: শাহী গাইর উত্তর : ১৭

- ৫. আরে ভাই আপন নাম বলিয়ে।

৬. ১৭, মতলব্ মামুদ হাসান।

৭. W.L. কাস, বার্ষ মিল জায়গা, ৪০০ রুপিয়া দিজিয়ে।

৮: এ সময়ে আমরা বাস করছি যেখানে মামুদ হাসানকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর এককবচী নাটক-এর খনিমজুরদের মতো শুধুমাত্র একটি সংখ্যায় পরিচিত হোতে হয়।

\* \* \* \* \*

৯: অ্যান্ট খরানায় কবি গোলাম কুদ্দুস কলেজ শিক্ষিকা হেনা রায়চৌধুরী সাথে। পবিত্র সূত্রে আকর্ষ হোলেন। ওরা চাইছিলেন গোলাম কুদ্দুসের বেকবগানের আশাব্যবহার। জেরা ছেড়ে তুলনামূলকভাবে একটি ভালো বাড়িতে স্থানান্তরিত হেন। গোলাম কুদ্দুসের বিবাহত কবিতার অংশে যে মহিলার বীরগাথা লেখা হয়েছিল (মত ৩৯। মিত্র (ইলা মিত্র রাজশাহী জেলে...) রাজ্য সরকারের মন্ত্রী থাকাকালীন ৩৯। ১৯৬৬ চলতি কথায় হিন্দু মহাদায় কুদ্দুসের জন্য একটি ভাড়া বাড়ির ব্যবস্থা করতে পারেননি। কাজী নজরুলের একই ধরনের দুর্দশা হয়েছিল। এই জেনেই গোলাম কুদ্দুস - হেনাদেবী আমৃত্যু বেকবগানের আশা অন্ধকার বাড়িতে দিন কাটিয়েছিলেন।

১৯১ ✍️ সিরাজুল

বর্মসন-এর জামালপুর থেকে এক বছর ফের এসে। এর বোন রবীন্দ্র-ভারতীতে পড়ে। পরের সপ্তাহে মঙ্গলবার বোন-এর জন্মদিন। দমদম স্টেশনের লাগোয়া প্রাইভেট হোস্টেলের বাসিন্দা এর বোন শব্দমকে একটা বড় কেক কিনে দৌড়ে দেওয়ার অনুরোধ। হোস্টেলের ঠিকানা জানিয়ে বন্ধু আকতার-এর সতর্কবাণী—‘হোস্টেলে কিন্তু আমার বোনের নাম মলিনা পসে জানানো আছে।’

কুবা থেকে লিখি হয়ে একটি দুব সম্মেলন সেরে ফিরছি। দিল্লি বিমান বন্দরে তরাসি পর্ব চলছে। লাইনে দাঁড়ানো আমার আগের যাত্রীকে ছড়তে সময় নিচ্ছে নিরাপত্তা কর্মীরা। বিরক্ত যাত্রীটির স্বপ্নভাঙি কানে এল—‘গেনে ডাপলে বেইজুত ফি। নিরাপত্তা বলয় পার হয়েছে এই যাত্রীর দিকে ভালোভাবে তাকালাম—দাড়ি চুপি পরা দৃশ্যত একজন মুসলমান যুবক।

পরিচয়-এর সংকটের যে নমুনাগুলি হাজির করা হোল এটি থেকে জন্ম নেয় পরিচয়-এর রাজনীতি বা পরিচয়-এর সংস্কৃতি। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির গতিপথ বিভিন্নমুখী হয়।

কৌম (সম্প্রদায়)-এর জন্য আলাপ চর্চা যতদিন আগে থেকে বৈধিক জগতে আসুক না কেন ইংরেজীতে ১৮৪০ সালের আগে কৌম শব্দটির উৎস পুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৮৪০ সালে ইংরেজ ও ফরাসি সমাজবাদীদের লেখার ‘কমিউনিষ্টেরিয়ান’ (ইংরেজী) ও ‘কমিউনিস্টার’ (ফরাসি), যার অর্থ কৌম শব্দটির সমার্থক, শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হোতে শুরু করল (তথ্যসূত্র : রিচার্ড জগার)। প্রমো ও ক্যাব শব্দ কৌম শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে ওডউইন বারমার নামে একজনের কথা বলা আছে যিনি ১৮৪১ সালে ‘ইউনিটারিয়ান কমিউনিষ্টেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ‘দ প্রিমিয়ার অফ কমিউনিষ্টেরিয়ান অ্যাসোসন’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। প্রথম পর্যায়ে কমিউনিষ্টেরিয়ান শব্দটি সোসালিস্ট বা কমিউনিস্ট শব্দ দুটির সমার্থক বোঝানো

হোনা পরবর্তকালে ভিন্ন ভাবনা জানায় যে কৌমবাদী (পরিচয়-এর রাজনীতি) বড় দলীয় বাঙালি, বর্ম, গোষ্ঠী, পরিবার নিয়ে চর্চা চালায় বিশ্ব দুনিয়া অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে বা সমস্যা সমাধানের তুলনামূলক আধুনিক প্রচেষ্টার প্রতি অনীহা থাকে। উদাহরণস্বরূপ কৌমবাদ বিতর্ক (আকতার ভারতু (মাকইন টায়ার)। লিটিস মাক জাস্টিস (মাইকেল স্যাভেল), ফিলজফিকাল পেপারস (চার্লস টেলার), দিবার অফ জাস্টিস (রলস), আমার কি (রবীন্দ্র মোজিক)। ১৮৪০ থেকে আজ পর্যন্ত চলছে।

উদাহরণস্বরূপ-এর তত্ত্বকে যারা প্রয়োগ-এর স্তরে নিয়েছেন তাঁদেরও বিভিন্ন মতানুযায়ী আছে। এরা সমাজবাদ-এর পক্ষে কাজ করেছেন বা সামন্তবাদ-এর উচ্ছেদ চেষ্টা। শ্রমবর্গ-এর দ্বারা পুঁজিবাদ-এর প্রতিষ্ঠা চান বা এমনকি এসবের মধ্যবর্তী স্থানে আধ্যাত্মিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে ওকালতি করেন। পরিচয়-এর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এদের বক্তব্য সুস্পষ্ট :— সম্প্রদায়-এর রাজনীতি প্রাক-আধুনিক এবং বিপজ্জনক।

এক অগ্রজ-এর দুটি অভিজ্ঞতার কথা জানা যাক :

: “ফুটবলার প্রশান্ত বানার্জীর বাড়িতে ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সার্ক ফুটবল ফাইনালের ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ-এর ভিডিও দেখছি। ভারত ১-০ গোলে জিতেছে। ম্যাচের শেষে ভারতের পতাকা নিয়ে সুদীপ চ্যাটার্জী, প্রশান্ত বানার্জী মাঠের চারপাশে দৌড়াচ্ছে। স্টেডিয়াম-এর এক প্রান্তে ভারতের পতাকা হাতে আনন্দোচ্ছল একদল দর্শককে দেখলাম। প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করলাম : ওরা এতজন ভারত থেকে ঢাকা গেছে খেলা দেখতে? প্রশান্তর চলতি ভুল উত্তর : ওরা বাঙালী।” তারপর ভুল শুধরে প্রশান্তর উত্তর - ওরা বাংলাদেশের হিন্দু কিন্তু ইন্ডিয়ান সাপোর্টার। ভারতের জয়ে ওদের অদম্ব।

২য় অভিজ্ঞতা : বাল্যকালে লর্ডস-এর মাঠে ইংল্যান্ড (তখন এম.সি.সি) ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট ম্যাচ দেখছি। এক ডাক্তারবুকে ক্যারাবিয়ান ছাত্র বোলার-এর বলে কেন ব্যারিংটন মাথায়

আঘাত পেলেন। লঙ্ঘিত ক্যারাবিয়ান খেলোয়াড়রা কেন্ কে ঘিরে ধরলো। মাঠে চিকিৎসক এলেন। দর্শকসনে কয়েকজন কৃষ্ণঙ্গ যুবককে দেখলাম পরমানন্দে 'সিটি' রাজ্যে আর নাচতে। ওরা কি ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে এসেছে? আমার এই প্রশ্নে পাশে বসে থাকা লন্ডনবাসী আশ্চর্যের উত্তর : "ওরা বৃটিশ, ব্লাক বৃটিশ। শেতাঙ্গ আঘাত পেলে ওদের অনন্দ।" (চেতনা লহর - প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ৬৯)।

খেলার মাঠের দুটি ঘটনা থেকে কিছুটা বোঝা যায় যে কৌমাবাদী রাজনীতি (অস্মিতা পরিমা বা আইডেনটিটি পলিটিস বলা যায়) উন্নততর সমাজ গঠন প্রক্রিয়ায় কী ভূমিকা নিতে পারে।

বাংলাদেশের হিন্দুরা প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি মাত্রায় হিন্দু। ভারতবর্ষের মুসলমানরা একটু বেশি মাত্রায় মুসলমান। শ্বেতাঙ্গ প্রধান দেশে কালো মানুষরা একটু বেশি মাত্রায় শ্বেতাঙ্গ বিরোধী। এই ধরনের Ghetto Complex (সঠিক বাংলায় এর অনুবাদ না জনার দুঃখিত : লেখক) কাটিবার উপায় সমাজ বিজ্ঞানের ছত্রদের জ্ঞান দরকার। উদারনীতিবাদের শিবিরে যারা শ্রেণী সংগ্রাম-এর জয়ধ্বনি ছাড়া দিন কাটান না তাঁরা কোন কারণে মহিলা, ছাত্র, যুবদের জন্য পাঁচ মিশেলি (বিশেষ শ্রেণীর নয়) গণ সংগঠন গড়েন তার ব্যাখ্যা করেন না। শ্রেণী সংগ্রামের দর্শনকে বেদ, কোরান, বাইবেল-এর মতো মান্যতা না দিয়ে যদি 'বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ' এবং 'কর্মসূচীর দিশা' হিসেবে গৃহীত হয় তবে পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে মহিলা সমিতি, শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে হয়। একই কারণে জাত ভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দলিত, আদিবাসী, অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর সংগঠন গড়ে ওঠে—এতে অস্বস্তির কারণ কেন? সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি বর্ণ হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সমবেত হয় তাতে অংশগ্রহণ করে সবধরনের পীড়িত গোষ্ঠীর কৌম রাজনীতির অবধারিত অধ্যাপনকে গণতান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের সঠিক অভিমুখ আনা যায়। তাতে অসুবিধা কোথায়? জাতিসত্তার বিকাশ প্রসঙ্গে জাতিবাদের রচনা বা কৃষ্ণঙ্গ আন্দোলনের গণতান্ত্রিক মর্মবাক্ত নিয়ে মাও-সে-তুং-এর রচনা কি বিকলে গেল?

সমাজবাদী নেতা রাম মনোহর লোহিয়া বলেছিলেন, 'ভারতের রাজনীতির ক্ষমতা অঙ্গিনে দীর্ঘ জীবন কাটাতে হলে নিম্নোক্ত শর্তগুলির অন্তত দুটি পালন কপণেই চলে। (১) বর্ণ হিন্দু পরিবারে জন্ম হতে হবে, (২) অর্থবান হতে হবে, (৩) ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার ফলভোগী হতে হবে।'

লোহিয়াজী বঁচে থাকলে সম্ভবত আর একটি অবশ্য পালনীয় শর্তের কথা বলতেন। যাদের ইচ্ছা : উন্নয়নের নামে, ধর্মের নামে, জাতির নামে, লিঙ্গ বিভেদের নামে ভারতের ৮৫ শতাংশ মানুষকে প্রান্তবাসী করে দেশকে একটি স্থায়ী প্রায় গামগতান্ত্রিক অথচ বিদেশি পুঞ্জির মুগড়া ক্ষেত্র করে তুলতে হবে।

ভারতে বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বৈচিত্র্যকে মান্যতা দিয়েই একটি প্রাথমিক স্তরের গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ার লড়াইটা চালানো দরকার—তা আমাদের দেশের দলিত বা অদলিত রাষ্ট্র নেতাদের কাজকর্মে বোঝা যাচ্ছে না। **৪৭৩ গণতান্ত্রিক কাঠামো** নেই বণ।

# চুনী কোটাল যদি বেঁচে থাকতো

সোমনাথ ভট্টাচার্য

সে খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। চুনী কোটাল নামে এক আদিবাসী মেয়ে আত্মহত্যা করে ঘিরে উজ্জল হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ। সালটা ছিল ১৯৯২। এ রাজ্যে লোখা শবর উপজাতির প্রথম স্নাতক ছিল চুনী। ব্রিটিশ আমলে লোখা শবরেরা নোটিফায়েড ট্রাইব বা অপরাধপ্রবণ উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর খাতার কলমে তারা ডিনোটিফায়েড বা বিমুক্ত হয়, কিন্তু বাস্তবে অবস্থা বদলায়নি। পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সমাজের সব স্তরের মানুষের হাতে অকারণ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন চলতেই থাকে। এসবের মাঝেই বেড়ে ওঠে চুনী কোটাল, মেদিনীপুর শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে গোয়ালডিহি গ্রামে সাত ভাইবোনের পরিবারে। বি.এ. ডিগ্রিটা পাবার পর বিন্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত একটি মেয়েদের হস্টেলে সুপারের পদে চাকরি পায় সে। এর পাশাপাশি নৃতত্ত্ব বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হয়। চুনী ছিল পরিশ্রমী, মেধাবী ও অধিকার সচেতন—লোখাদের সম্পর্কে সমাজ চালু ধারণায় মূর্তিময়ী আঘাত। সেটা মেনে নিতে পারেনি হস্টেলের অন্যান্য কর্মী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণবাদী আমলা ও এমনকি শিক্ষকদের কেউ কেউ। তুচ্ছ ছুতানাতায় হেনস্থা অপমান চলতেই থাকে। দুই বিভাগীয় শিক্ষকের অন্তর্দ্বন্দ্বেরও শিকার হয় সে। এবং অবশেষে একদিন, স্বাধীনতা দিবসের পরের দিন, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে চুনী কোটাল।

চুনী কোটালের মতো মাধবী ভক্তল ও ডিনোটিফায়েড শবর সম্প্রদায়ের। এবং নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছে। মিলটা এখানেই শেষ। মাধবীর জন্ম ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায় একটি খেড়িয়া শবর পরিবারে। ইন্ডুল ও কলেজের পড়া শেষ করে জেলার আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরে সমাজকর্মীর কাজ পায় সে। এরপর মাধবীর গল্পটা চলে আসে ভুবনেশ্বরে। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব নিয়ে এম.এ. পাশ করে কিছুকাল আশাদীপ নামে একটি সংস্থায় কাজ করে। সেসময়ে একজন ফরাসি গবেষকের সঙ্গে বিয়েও হয়। এরপর তফশিলি জাতি ও উপজাতি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চাকরিটা পায়।

১৯৬৮

ডোমারিয়া কল্লদের সম্পর্কে আমার কৌতূহল উদ্বেগ দিয়ে অ্যাকশন এন্ট্রি এর সঞ্জয় বলেছিল।

মিয়মগিরিতে যাবার আগে তুমি অবশ্যই ট্রাইবাল মিউজিয়ামটা দেখে আসবে। ওখানে মাধবী আছে। ওই তোমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবে।

আমার যাবার কথা মাধবীকে টেলিফোন করে জানিয়ে রেখেছিল সঞ্জয়। আশাদীপে একসঙ্গে কাজ করেছে ওরা, তখন থেকেই পরিচয়। সঞ্জয়ের বর্তমান সাংস্কার কাজকর্মেও কিছু কিছু সাহায্য করে থাকে। এই ধরনের কাজে মাধবীর মতো মেয়ে যেমন দুর্লভ তেমনই অপরিহার্য।

ভুবনেশ্বরে আদিবাসী শিক্ষকতা নিয়ে যে একটা আলাদা মিউজিয়াম রয়েছে সেটা জানা ছিল না। একদিন দুপুরবেলায় পৌঁছে যাই সিআরপি স্কয়ারের পাশেই মিউজিয়ামের সুদৃশ্য বাড়িটার সামনে। প্রশস্ত বাগানের মাঝখানে শৌখিন টালির জল নিয়ে আধুনিক একতলা বাড়ি, দেওয়াল আদিবাসী নকশায় চিত্রিত। বাগানে ঢালিমোড়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসে গাড়িবারান্দা পেরিয়ে কাচের দরজার সামনে দাঁড়াতেই চিচিং ফাঁকের মতো স্বয়ংক্রিয় কাচের পাল্লা দু'পাশে সরে যায়। ভেতরে ৮৩৬০ লবি, সোফাসেট। কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতে এটা যে সরকারি প্রতিষ্ঠান সে ব্যাপারে আশঙ্ক হই। একটি খবরের কাগজ সামনে খোলা রেখে এক ট্রীড কবী তক্তায় চুলছেন। আমাকে দেখে আঙুল তুলে পাশের একটি ঘরের দিকে দেখান। সেখানে একলাদা পার্সেলের মাঝে বসে কম্পিউটারে কাজ করছে জিন আর কমলা কুঁড়ি পরা একটি মেয়ে। আমি গিয়ে মাধবী ভক্তলর খোঁজ করতেই উঠে দাঁড়িয়ে হেসে মাথা নোয়ায়।

সপ্তম। আপনার কথা সঞ্জয় ফোনে বলেছে আমার।

এক যুক্তির জন্য ধন্য পড়ে বাই আমি। চুনী কোটালকে কেমন দেখতে ছিল জানি না, কিন্তু মাধবী সম্পর্কে মাথার মধ্যে যে ছবিটা নিয়ে এসেছিলাম তার সঙ্গে এই মেয়েটির কোনো মিলই যে নেই। মাধবী কি চুনীর কথা জানে? জানার কথা নয়। চুনী কোটাল যখন মারা যায় তখন মাধবী নিশ্চয়ই স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি।

গ্রীজ বসুন। এক মিনিট।

পার্সেলগুলো আলমারিতে তুলে রেখে কম্পিউটার বন্ধ করতে উদ্যোগী হয় মাধবী। আমি ওকে ভালো করে দেখি। সামান্য উঁচু হনু আর পুরু ঠোঁট ছাড়া ওর

১৯৭৮

চেলারায় সেভাবে কোনো উপজাতি লক্ষণ নেই। চঙড়া গড়ন, উজ্জ্বল শুভের মতো চামড়ার রং, চুলের গোছ টানটান পনিটেল করে বাঁধা। কজিতে একটি লমি ঘড়ি। এমনতে নিরাভরণ, তবে কানে একাধিক ফুটো রয়েছে। এই সাবলীল মেয়েটি কোনো আর্ট গ্যালারিতে কিংবা শপিং মলের এসকলেটারে হঠাৎ সেভাবে নজর কাড়বে না, কিন্তু ময়ূরভঞ্জন শব্দ পরিতে? মনে হতেই দরজার ওপর নামফলকে চোখ চলে যায় আমার : মাখবী ভক্তা ক্রমেল—আসিসট্যান্ট কিউরেটর।

—আপনি নিয়মগিরি যাচ্ছেন কবে? মাখবী জিজ্ঞেস করে।

—সেটা নির্ভর করছে আমার পথপ্রদর্শকের ওপর। বর্তমানে তিনি বিবিসির এক সাংবাদিককে নিয়ে সম্বলপুরে বেপান্তা।

মাথাটা ওপর দিকে তুলে খিলখিল করে হেসে ওঠে মাখবী।

—তুমি কখনো নিয়মগিরি গিয়েছ নাকি? জিজ্ঞেস করি আমি।

—একবার, ফাইনাল ইয়ারের এককারণানে। তবে যেদিকটার এখন গণ্ডগোল হচ্ছে সেদিকে নয়। উঠেছিলাম বিসমকটকের দিক থেকে। খুব সুন্দর জায়গা। আর ওখানকার মনুষ্যও খুব ইউনিক। চলুন, আপনাকে দেখাব সব।

ঘর থেকে বেরিয়ে লবিতে ফিরে আসি আমরা। সোফার পেছনে দোহালজোড়া ওড়িশার মনচিত্রে অঙ্কল অনুযায়ী বিভিন্ন উপজাতিদের ছবি। কাউন্টারে কর্মীটি নেই। পিছনের খোপে চিঠিপত্রের গোছায় চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে আমার দিকে ফিরে মাখবী বলে :

—আমাদের ডিরেক্টর সাহেব দিল্লি গিয়েছেন, না হলে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম। উনি এই অঞ্চলে অনেক বছর কাজ করেছেন। আপনি কি কেবল ডোক্সরিয়া কঙ্কদের নিয়ে সংগ্রহ দেখতেই আগ্রহী?

এখানে এসেছি যখন পুরো মিউজিয়ামটাই ঘুরে দেখতে চাই। বাইরে থেকে বাড়িটাকে দেখে বিশাল বড়ো কিছু বলে মনে হয়নি। তালুড়া আর কোনো দর্শনার্থীও চোখে পড়ছে না। জায়গাটা কি ভুবনেশ্বরে পর্যটনের তালিকায় নেই?

আমার কথায় সায় দিয়ে মাখবী বলে—ভারতীয়দের থেকে বিদেশিরাই বেশি আসে। মাঝে মাঝে স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীদেরও নিয়ে আসা হয়। ওরা এলে খুব ভালো লাগে, পুরো বাড়িটা পাখির বাঁচার মতো সরগরম হয়ে ওঠে।

এখন অবশ্য একেবারে নিরুপম, ফুরোসেন্ট বাতানুকূলে রাস্তায় গাড়ির শব্দ চুইয়ে আসে স্কীপ, গ্যালারিতে উর্দি-অঁটা রকী নিম্পলক চেয়ে থাকে বিভিন্ন উপজাতির প্রমাণ সইজের কাঠের মূর্তির দিকে। মোট পাঁচটি গ্যালারি, একটি খোলা উঠোন ঘিরে চৌকোনা বাগানদায় পর পর সংগ্রহের বিষয়ক্রম অনুযায়ী সাজানো। বোস্তা থেকে শুরু করে লাক্ষিয়া সাওরা, জুয়াং থেকে পাওড়ি ভুইয়া, কোয়া, পরজা, মানকিড়িয়া ও বিভিন্ন কঙ্কদের নানা ধরনের ধাতু ও হাড়ের গহনা আর হাতে-বোনা বর্ণময় বস্ত্রখণ্ড থেকে শুরু করে দৈনন্দিনের ব্যবহার্য নানা ধরনের কাঠের ও মাটির পাত্র, ডোকরা শিল্প, বাঁশি মাদল শিল্প ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র, পাতা আর বেতের বোনা টুপি, ঝোলা ও কাঁপি, অসংখ্য আকারের ও কাজের ছুরি কুঠার, তিরধনুক, গুলতি, মাছধরার জাল ও খাঁচা নানা আকৃতির, পাখি ধরার ফাঁদ, গবাদি পশুর গলার ফন্টা, ধুমপানের পাইপ কলকে, চুলের কাঁকই, শিলনোড়া, শিশুর দোলনা, লাঙলের ফলা, জোয়াল, মদ তৈরির পাতনযন্ত্র...

ওড়িশায় ৬২টি উপজাতি আছে, এদের মধ্যে ১৩টি আদিম গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত। ভারতবর্ষের ১১ শতাব্দের ওপর উপজাতির মানুষ রয়েছে আমাদের রাজ্যে। ২২টি আলাদা আলাদা ভাষা ও উপভাষা আছে। প্রায় ৪৫ শতাব্দে এলাকা পঞ্চম তক্ষশিলাভুক্ত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। তার মধ্যে বেশিরভাগটাই জঙ্গল এলাকা। চার-চারটে জেলা—সুন্দরগড় কোরাপুট রায়গাড়া আর ময়ূরভঞ্জ, যেটা আমার জেলা—পাঁচটা গোটা মহকুমা, দুটো তহশিল আর অনেকগুলো ব্লক—যেমন নীলগিরি, কাশীপুর, গুয়ামুল আর লাক্ষিগড়, যেখানে আপনি যাবেন—এই তক্ষশিলের আওতায়। রাজ্যে এখন সরকারিভাবে ২১টি ইন্টিগ্রেটেড আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পেই চলেছে, প্রতিটি প্রকল্পের চরিত্র চ্যালেঞ্জ আলাদা, পরিবেশ আলাদা, মানুষের সমস্যা আলাদা, বেঁচে থাকার যত্ন আলাদা...

মাখবীর অভ্যন্তরীণ ধারাবিবরণীর ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে এসে পৌঁছেই ডোক্সরিয়া কঙ্ক পুরুষ ও নারীর কাঠের মূর্তির সামনে। নারীটির পরনে দুটি ও পুরুষটির একটি ল্যাঙ্গটের মতো বস্ত্রখণ্ড, তার ওপর গলায় বাঁধা অ্যাপ্রনের মতো করকর্কর্মময় চাদর। ইঠাৎ দেখলে পুরুষ ও নারী আলাদাভাবে চেনার উপায় নেই—দু'জনেরই মাথায় লম্বা চুলে অসংখ্য ট্রিপ, নাকে তিনটি করে নথ আর গলায় কানে লোহা পিতল কড়ি আর পুঁতির একরাশ গয়না। মেয়েটির চুলে একটি ছোট্ট বাঁকানো ছুরিও রয়েছে। আশ্চর্যের জন্যই কি?

—কাটির, মাথবী বলে। গয়নার মতোই, তবে কাজেও লাগে। কাপড়ের ওপর তিনকোনা নকশাগুলো দেখেছেন? এটা পাখাড়ের মোটিক। এই একই মোটিক এদের ঘরের দেয়ালে আর দেবতার থানেও দেখতে পাবেন। এই দেখুন...

রক্তিন ডিজিটাল প্রিন্টে কাঁধে কাঁধ রেখে সারি বেঁধে নাচতে ডোঙ্গরিয়া মেয়েরা, পেছনে ধরনি-পৈনুর থানে ত্রিকোণাকার মোটিক। এছাড়া মেরিয়া উৎসবে মহিষবলির ছবিও রয়েছে। কাচের শোকেসের ভেতর সাজানো আছে চণ্ডা টান্দি, খাঁড়া, সুরি (ছুরি), গুন্ডাটি (পাখির বাসা), গুঁচ (গুঁড়তি), মান্নু দুকা (দড়ির বোনা ধরগোশের ফাঁদ), মদ কলু (কুমড়োর খোলার মদপাত্র), সিঁদুল দুনা (পাখি ধরার আঠা-কাঠি), ডাপা (চ্যাপ্টা মাদল), আনন্দু (পেতলের পায়জোর).... নির্বিড় বহমান জীবনের জড়িয়ে থাকা সামগ্রী, নামগোত্রের ফলক সমেত আলোকিত শোকেসের ভেতর জ্যামিতিক শৃঙ্খলায় সাজানো। এগুলো কি কোনোকালে ব্যবহার হয়েছিল, নাকি প্রদর্শনালার জন্যই বিশেষভাবে বানানো? সামনে ঝুঁকে আমি হাতের জুপ, কাজের দাগ খুঁজতে চেষ্টা করি। কোনোকালে যদিও বা ছিল, এখন তা হারিয়ে গিয়েছে পুর বার্নিশের নীচে। শোকেস ভেদ করে কীভাবে মিহি ধুলো এসে জমেছে তার ওপর, কড়া আলোর নীচে বিবর্ণ হয়ে এসেছে পাতা আর পশমী বুননের রং, গলার আর কোমরের ভারি পেতলের গয়নাগুলো ঠাণ্ডা, মাদলের শুকনো চামড়ার মরে গিয়েছে স্থানি, কাচের ভেতর গুমরে আছে সময়। ঘূর্ণপোকার মতো তার একটা শব্দ কিটকিটকিটকিট করে নৈশেদ স্থাপির কানে আসে। ঘূর্ণপোকাটা কি কঙ্ক পুঞ্জের কাঠের মূর্তির ভেতরে বাসা করে আছে? মুখের ওপর আঁকা চণ্ডা স্থানিটায় কেমন যেন যন্ত্রণার রেশ। বাতাসে স্থলকা ন্যাপথলিনের গন্ধে জড়িয়ে আছে একটা অন্যরকম বিগুচ্ছ দমচাপা গন্ধ। আমার মাথা ক্রিমক্রিম করতে থাকে। হঠাৎ মাথবীকে দেখতে পাই শোকেসের ভেতর, পাখির খাঁচা আর তিরখনুকের ঠিক পেছনে আলোর করনার নীচে, ঠোট নেড়ে কী যেন বলছে আমাকে, কিন্তু পুর কাচ ভেদ করে ওর ডাক এসে পৌঁছচ্ছে না।

পরক্ষণেই বিস্ময়টা টের পাই। শোকেসের ওপাশে দেয়ালটিও কাচের, তার ওধারে খোলা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে মাথবী। ওর চারপাশে ছড়ানো নানা আকারের কাঠখোদাই টোটেম। বাইরে বেরিয়ে এসে খোলা বাতাসে গভীর শ্বাস নিতে ঘোরলাগা ভাবটা কেটে যায়।

—আপনি এত মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন যে আর ডিসটার্ব না করে বাইরে

এলাম। এই দেখুন, এখানে কিছু কিছু উপজাতির দেবদেবীর মূর্তি টোটেম রয়েছে।

বেশিরভাগই কাঠের স্তম্ভে খোদাই করা বিমূর্ত চিত্র, কয়েকটিতে মানুষের মুখের আদল—অনেকটা জগন্নাথের মূর্তির মতো। এছাড়া আছে বিভিন্ন আকারের পাথর আর পোড়ামাটির আকার। সবকটি আলাদা আলাদা বেদীর ওপর, কঙ্ককে লেখা উপজাতির নাম। টমের এরিক্স পাম, সাইকাস ও অন্যান্য শৌখিন গাছে সাজানো। দেবতাদের কিছারপাটেন অথবা বুদ্ধাশ্রম: তেরাঙ্গ রোদ মাথবীর কূর্তির ওপর পড়ে কমলা আলোয় উজ্জ্বলিত হয় অন্ধ চোখ আর আকর্ষণ বোবা ঠোঁটের বিস্ময়।

—এখানে তোমাদের দেবতা আছে নাকি? জিজ্ঞেস করি আমি।

—ওড়িশার বাঘট্রাটি উপজাতির দেবতা এনে রাখতে গেলে একটা ফুটবল মাঠেও কুলোবে না, মাথবী হেসে বলে। আমাদের দেবতা দেখতে গেলে আপনাকে আমাদের গ্রামে যেতে হবে। এখন একটা অন্য জিনিস দেখার, এদিকে আসুন।

ওকে অনুসরণ করে টোটেমের অলিগলি দিয়ে এসে পৌঁছেছি প্রায় দশফুট উঁচু একটা মোটা কাঠের স্তম্ভের সামনে। খুব প্রাচীন কাঠ, স্থানে স্থানে বাঁজ কেটে কঙ্ককর্য কৌদা, ওপর দিয়ে শঙ্কুর আকার। অনেকটা হিন্দুদের আন্তোষ্ঠির স্থানে শৌভ্য বৃষকাষ্ঠের মতো।

খোলা ঠোঁটের মতো কাঠের কাটলে অতুল কুলিয়ে অনমনে রাখা নাড়ে মাথবী ভক্তা ক্রুদেল।

চুম্বী কোটালকে মাথবীর মধ্যে বৃজে পেলাম।

# বাংলা ভাষার শত্রু-মিত্র

সমুদ্র বিশ্বাস

বৃহৎ বাংলার মানুষের গড়া সমাজের ধর্ম, দর্শন, বিশ্বাস, সংস্কার নানা বিষয়ে ভেদ আছে। শাসন-শোষণও ফারাক আছে, কিন্তু মাতৃভাষা বাংলার ক্ষেত্রে ভেদ রেখা রচিত হয়নি। আমাদের স্বকীয়তা ও জাতীয়তার মূলে আছে ভাষা-চেতনা ও ভাষাপ্রীতি। বোহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রজা বা সাধারণ মানুষ রাজা বানায়নি, সেই কারণে রাজার বদল হলে প্রজা বা সাধারণ মানুষ বিচলিত হয়নি। বরং বাংলার শাসক-শোষকদের ভয় ও ভাবকে বুড়ো অমূল দেখিয়ে বাংলার কৃষিজীবী-শ্রমজীবী সমাজ তাদের মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে অটুট বন্ধনে বেধে রেখেছে। রূপকথা, কবিগান, ভাড়া যাত্রা, কথকথা, তর্জা প্রভৃতি সংলাপধর্মী হওয়ার বাংলা ভাষাকে বিকৃত ও তুর্যমিত করা সহজ হয়। প্রকৃত অর্থে ভাষার মধ্যেই মানুষের আত্মপরিচয় নিহিত থাকে। এনতা গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ জানে বলেই তারা মাতৃভাষার প্রতি আক্রমণ কোনও শাসনকালেই মেনে নেয়নি। প্রয়োজনে শাসক ও শোষকের ভাষা অল্প বিস্তার গ্রহণের মধ্য দিয়ে উদারতার পরিচয় দিয়েছে। শ্রমজীবী-উৎপাদক বাঙালি জানে, একটি মানুষের অন্তর্লৌক সম্পন্নিত হয় তার মাতৃভাষার সুরে।

শিশুর সঙ্গে ভাব আদান-প্রদানের জন্য মায়ের ব্যবহৃত ভাষা অথবা মায়ের অবর্তমানে গৃহ পরিবেশে ব্যবহৃত ভাবহীন শিশুর মাতৃভাষা। কিন্তু শিশু যদি কোন কারণে অন্যদাত্ত্রী মায়ের কোড়চাত হয়ে অন্যত্র অন্য ভাষা পরিবেশে পালিত হয়, তাহলে এই পরিস্থিতিতে সেই পালিকা মায়ের ভাষা বা গৃহ পরিবেশের ভাষাই হবে তার মাতৃভাষা। যদিও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষ অশুনিহিত ভাষা ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিশুর যে কোন ভাষা অধিগত করার সহজাত ক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে।

সংস্কৃতির সোতক ভাষা। একটি স্রষ্টি পড়েন দাদা একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। মানুষ মেলবন্ধনের সেরা ভাষা। ভাষা আমাদের আত্মপরিচয়। কোন মানুষ জন্মেই বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর হয় না। তাতে ভাষার মাধ্যমে হয়ে উঠতে হয়।

২০২ / ৩০২

সমুদ্র বিশ্বাস

১৮শ শতকের প্রথমদিকে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়তে চেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় রাজি ছিল, কিন্তু আপত্তি করলেন একজন সংস্কৃত পাণ্ডিত, যিনি বেদ-উপনিষদ পড়াতেন। কোনও প্রেচ্ছকে তিনি বেদ-উপনিষদ পড়াতেন না। কিছুতেই না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহর সংস্কৃত পড়া হয়নি। 'দি বেস্টলি' পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি অবশ্য এতে রেগে তাঁর পত্রিকায় প্রস্তাব করেছিলেন যে, ওই পাণ্ডিতকে গঙ্গার 'পবিত্র' জলে নিক্ষেপ করা হোক। তাতে কাজ হয়নি, উপাচার্য আন্তরিক মুখার্জির চেষ্টাতেও কাজ হয়নি। শহীদুল্লাহ সংস্কৃত পড়েছিলেন ঠিকই, তবে সেটা বাংলার সম্ভব হয়নি। জওহরলাল নেহরু তাঁর 'দি ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' বইতে খরশ করেছেন যে, স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪), পরে যিনি ভারতবর্ষ হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন এবং সংস্কৃত শেখার ব্যাপারে প্রথমে সুবিধা করতে পারেননি। বিচিত্র কঠোর শর্তে এক পাণ্ডিতের কাছে জোন্স সংস্কৃত শিখা করেছিলেন। উল্লেখ্য, এই জোন্সের উদ্যোগেই কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ১৭৮৪ সালে।

শূদ্রের জন্য অর্থাৎ বাংলার কায়স্থ (খোদা, বোস, গুহ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি যারা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মে 'শূদ্র' বলে পরিচিত। ১৯৩২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট কায়স্থদের 'General Cast' হিসাবে স্বীকৃতি দেন। মেজিমাটি মুখল যুগ থেকে আজকে যারা বাংলার কেন্দ্রীয় তালিকা অনুযায়ী হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভাবতে ওঠে করে। যার প্রস্তাব এস.সি. এবং এস.টি.-দের ওপর পড়ে।) ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোনও ব্রাহ্মণ্য দাস (বন্দি-কায়েস্ত বা আজকের ও.বি.সি) মানুষদের জন্য সংস্কৃত শেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। শিবলে, ওনলে বা কলে কানে তরল সীসা ঢেলে দেখায়া, মুখের ভিতর লোহার তপ্ত শিক ঢুকিয়ে দেওয়া, জিত কেটে দেওয়া প্রভৃতি যেসব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তা রোমন্থক, অবিশ্বাস্য, অমানবিক। মুসলিম মূলতন্ত্রদের পৃষ্ঠপোষকভাবেই কৃষ্ণবাস ওয়া রামায়ণের ও কাশীরাম দাস মণ্ডভারতের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল - 'কৃষ্ণবাসে, কাশীরামে আর বামন খেঁবে, এই তিন সর্বনেশে।' কিন্তু সংস্কৃত পাণ্ডিতদের এই রক্ষণশীলতা কেন? কিছুটা অবশ্যই নাক্ষত্রবংশত। কিন্তু আসল কারণ সংস্কার নয়, স্বার্থ। একই কারণে মুসলিম উর্দু-ঐক্যদারেরা বাংলা ভাষা শিক্ষাকেও এক সময়ে 'হরাম' বলে কঠোর্য দিয়েছিল।

২০৩ / ৩০৩

বাংলা ভাষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান উল্লেখযোগ্য। কেননা, অগ্রগণ্য তো নয়ই, এমনকী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও সংস্কৃত সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে অনুমোদন পাননি। বাংলার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নয়া উপনিবেশে তখন বাণিজ্যের পাশাপাশি চলছে ইংরেজদের অবাধ লুণ্ঠন, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা, রাজনৈতিক চক্রান্ত ও শোষণ। তাই কোনও খ্রিস্টান মিশনারি এখানে এসে তাদের কামেলায় ফেলুক তা কোম্পানি চাইত না। কেননা, কোম্পানির চোখ ছিল শুধুমাত্র অর্থ শোষণ ও লুণ্ঠন। ফলে ইংল্যান্ডের কোনও জাহাজ কোম্পানিই কেরীর মতো 'ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি'র (বিএমএস) একজন মিশনারিকে কলকাতায় পৌঁছে নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরূপভাৱন হতে চাইল না। ফলে 'জন প্রিন্সেস মারিয়া' নামে এক দিনেমার জাহাজে চেপে প্রথমে চুব্বরবনের মোহনায় পরে সেখান থেকে নৌকায় চেপে ১৭৯৩ সালের ১৩ জুন কেরী তাঁর স্ত্রী, তিনটি পুত্রসন্তান, এক শ্যালিকা ও বাংলায় একবার ঘুরে যাওয়া টমাস নামের এক নবীন ব্যাপটিস্ট মিশনারি ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার ফেয়ারলি ঘাটে পদার্পণ করলেন। জেটিঘাটেই দেখা হল, টমাসের পূর্বতন মুন্সি রামরাম বসুর সঙ্গে। রামরামের অমারিক ব্যবহার, বাংলা ফারসি, সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পার্ণিতা ও বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় মুগ্ধ কেরী তাঁকে হাসিক কুড়ি টাকা বেতনে নিজের বাংলা ভাষার শিক্ষক ও মুন্সির পদে নিযুক্ত করলেন। রামরাম বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে কেরীর অনেক অবদানই যে অসম্পূর্ণ থাকত তা কেরী স্বয়ং স্বীকার করেছেন। চাকরির সম্পর্ক জুড়িয়ে তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত হৃদয়তা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়েছিল।

স্বামথেরালি ও উডনচণ্ডী ডাক্তার টমাস বিএমএস-এর দেওয়া এক বছরের অর্থ দু'মাসেই উড়িয়ে দিলেন। ফলে অর্থাভাবে দুর্দশাগ্রস্ত কেরী চাকরির খোঁজে ক্যান্ডেল থেকে নবদ্বীপ হয়ে কলকাতার মানিকতলায় নীলমণি দত্তের কাগানবাড়িতে চক্কর খেতে লাগলেন। এই সময় একটুর জন্য শিবপুরের বোটনিক্যাল গার্ডেনের চাকরি কেরীর হাতছাড়া হয়ে যায়। স্ত্রী ও সন্তানরা সস্তা খাবার খেতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কলকাতার ক্ষেতাস সমাজও দৃষ্টি কেরীর পাশে দাঁড়াল না। কিন্তু এত অসহ্য কষ্টের মাঝেও রামরাম বসুর কাছে তাঁর বাংলা ভাষা শিক্ষার কাজ কেরী একদিনের জন্যও বন্ধ করেননি। এরপর রামরাম বসুর

সহায়তায় দেড়শো টাকা ধার করে প্রথমে সুন্দরবন তারপর মালদা জেলার মদনবর্তীতে কেরী নীলকুঠির ম্যানেজারি করলেন অল্প কিছুদিনের জন্য।

মদনবর্তীতে এসে কেরী আদিবাসী, দরিদ্র, অবহেলিত, শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, পরিহা, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা দেখে বিস্মিত হলেন। এমন বিচিত্র ভাষা-উপভাষা, সংস্কৃতি, গাছপালা, পশুপাখি, আচার-বিচার, ধর্মচর্চা, উৎসব অনুষ্ঠানের কথা কোনও বইতেই তিনি খুঁজে পাননি। বাংলার গোমল-সজল-শ্যামল রূপটি দেখেও তার দু'চোখ জড়িয়ে গেল। পরবর্তীকালে এই বরিন্দ এলাকার কথাভাষাকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত 'কথোপকথন' গ্রন্থে ব্যবহার করেছিলেন।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক মেহরাব আলি তাঁর 'দিনাজপুরে কেরী' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, '...মহামতি খ্রিস্টের পরম ভক্ত কেরী খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও পরিহিতরত কাজকেই মনে করতেন জীবনের সার্থকতা।... নীল চাষিদের দপন অগাচরী হওয়া, শোষণ করা, চাবুক মারা... প্রভৃতি অমানবিক কাজগুলি মিশনারি আদর্শ-বিরোধী বলে কেরীর পক্ষে গরিব, স্বাস্থ্যহীন, অসহিষ্ণু কৃষক শ্রমিকদের প্রতি কখনও কঠোর হওয়া সম্ভব হয়নি। ... তাঁর এই মমত্ববোধই নীলকুঠির আর্থিক ক্ষতির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।' মদনবর্তীতে কেরী পাঁচ বছর ছিলেন। মাঝে শুধু একবার ১৭৯৭ সালে ভুটানে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেছিলেন। ইতিমধ্যে কেরী বাংলা ভাষা মেটিমুটি কলতে ও লিখতেও শিখে গেছেন এবং রামরাম বসু ও মোহনচাঁদ প্রসাদের কাছে সংস্কৃত ও উর্দু লিখতে শুরু করেছেন। যদিও এই শিক্ষা গ্রহণ সহজ ও সরলভাবে হয়নি। একদিকে বাঙালি গ্রাম্য পণ্ডিত সমাজ অন্যদিকে গোঁড়া ধনী ব্রহ্মণশীল সমাজ কেরী সাহেবকে এই সংস্কৃত শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এমনকি সেসময়ে কেরীর বিরুদ্ধে পণ্ডিত সমাজ সভা করেন।

১৭৯৯ সালে বিএমএস-এর উদ্যোগে ইংল্যান্ড থেকে কেরীকে সাহায্য করতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এলাকার বইয়ে দিনেমার কলেমি জীরামপুর শহরে এসে উঠলেন শিক্ষাবিদ জোশুয়া মার্শম্যান ও কেরীর পূর্বে পরিচিত মুদ্রাকর ও পণ্ডিত উইলিয়াম ওয়ার্ড। তাঁদের আমন্ত্রণে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি কেরী শীরামপুরে এসে পৌঁছলেন। ওইদিনই কেরী তৈরি করলেন 'শীরামপুর মিশন'।

কোনও মহাপুরুষ বা সংস্থার নামে নয়—একটি অঞ্চলের নামে কোনও ধর্মীয় মিশনের নামকরণ বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম। খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কেবী ভারতবর্ষে এসেও যেন-তেন-প্রকারেণ ভারতীয় খ্রিস্টানদের সংখ্যা বাড়ানোর চেয়ে খ্রিস্টীয় চেতনা, দর্শন ও শিক্ষার প্রসারেই তিনি বেশি জোর দিয়েছিলেন। এই হল বড় মানুষের বড় মনের পরিচয়।

রক্ষণশীল সমাজের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কেবী শ্রীরামপুর মিশনের তিনটি অঞ্চলের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করলেন—প্রথমত, স্থানীয় ভাষায় সুসমাচার প্রচার। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ও উপভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ও মুদ্রণ। তৃতীয়ত, দেশীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্থানীয় ভাষাতেই শিক্ষাবিস্তার। শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্নর কর্নেল বী মিশনের কাজে যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা করলেন। এর ফলে, স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি এবং তুলনামূলক উন্নত শিক্ষার প্রতি যৌক বেড়ে যাবে এই ভাবে ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজ কোম্পানির কাছে বারে বারে অভিযোগ জানাল। ফলে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ ইংরেজরা কেবীর কাজকর্মে সন্দেহ প্রকাশ করতে ও মিশনের কাজে নানানভাবে বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করতে লাগলেন। পরে তথাকথিত উচ্চবর্ণের একটা বড় অংশের স্বাভাবিক মেলামেশা শুরু হতেই গরিব সাধারণ মানুষদের এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বড়লট লর্ড ওয়েলেসলি শ্রীরামপুর মিশনকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তবে কেবীর পড়িয়ে নাপরিক বাবু সমাজের মধ্যে বাংলা চর্চা বেড়ে গেল।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত বাঙ্গালি হরফশিল্পী ও মুদ্রাকর পঙ্কজন কর্মকার এবং রামরাম বসু কেবীর আহ্বানে শ্রীরামপুরে এসে মিশনের কাজে যোগ দিলেন। কেবী ১৭৯৯ সালের মধ্যে বাইবেলের নিউ-টেস্টামেন্ট অংশের বাংলা অনুবাদ শেষ করেছিলেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল (মতান্তরে ৫ মার্চ) নতুন নিয়মের 'মখি' লিখিত মঙ্গলসমাচার পুরোটাই ছাপা হল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের এটিই প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। মাত্র উচ্চশিক্ষিত বছর বয়সেই কেবী দেশ-বিদেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের কাছে এক ভাসাধারণ সংগঠক, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, ধর্মপ্রচারক, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এক বিশিষ্ট মিশনারির স্বীকৃতি পেলেন। কেবী ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা ভাষার প্রচুর পরিমাণে

সংস্কৃত শব্দ ঢুকে পড়ে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত প্রেমী পণ্ডিতেরা প্রচার করতে থাকেন সংস্কৃত ভাষার জননী। যদিও কেবীকে এই অপচেষ্টার মূল কাণ্ডারী বলা যাবে না। পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছিল। কেননা, বাঙালির কথা ভাষায় পুস্তক রচনা তাঁর একান্ত উদ্দেশ্য ছিল।

১৮০১ সালে কেবী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষা পড়ানো ছাত্রাণ্ড অনুবাদকের চাকরিতে পান। এখানকার ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ১৮০১ সালে কেবী রচনা করেন দ্বিভাষিক 'কথোপকথন' গ্রন্থ। যদিও এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তিনি তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। 'কথোপকথন'-ই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ এবং প্রাচীন বাংলা কথ্যভাষায় রচিত গ্রন্থ। পরের বছর কেবী ছাপলেন ইংরেজিতে অনূদিত গ্রন্থ কাশীরাম দাসের মহাভারত। ১৮০৫ সালে রামায়ণও অনুবাদ করলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এর কয়েকটা খণ্ড ইংল্যান্ডে পাঠাবার সময় জাহাজডুবিতে এবং বাকি অংশটুকু পরে মিশনের অগ্নিকান্ডে ওষ্মীভূত হয়। নখিপত্র ধ্বংস করাই ছিল এই অগ্নিকান্ড ঘটানোর মূল কারণ। ১৮০৭ সালে কেবীর প্রথম স্ত্রী ভরোথী বীর্ঘকাল মানসিক রোগে ভোগার পর প্রয়াত হন। পরের বছর কেবী শার্লোটি কুমার নামী এক শিক্ষিতা, মার্জিত রুচির জার্মান মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮২৫ সালে কেবী প্রকাশ করলেন তাঁর ১৫ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল, 'অখণ্ড বাঙলা অভিধান'। তার আগে ১৮০১ সালে প্রকাশ করেছিলেন 'Grammar of the Bengalee Language'। পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দুটি বিপুলাকার গ্রন্থ শিক্ষাবিদ কেবীর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও কেবী পথিকৃৎ। তাঁর পরিকল্পনায় ও মার্শম্যানের সুযোগ্য পত্নী হানা মার্শম্যানের সাহায্যে শ্রীরামপুর মিশন কত দূর অঞ্চলে প্রায় ৪৫টি ব্যাপটিস্ট মিশনারি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। প্রায় ২০০০ ছাত্রী এইসব বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত।

কেবী ১৮৩৮ সালে সাংবাদ্যর্শনের কিছু অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। কিন্তু 'কথোপকথন' শব্দকোষের মতো কোনও অজানা কারণে এটিও কেবী ছাপাননি। এরপর তিনি 'হিতোপদেশ' ও 'ইতিহাসমালা' প্রকাশ করলেন। এছাড়া অন্যান্য দেশীয় পণ্ডিত ও মুন্সিদেরও উৎসাহ দিয়ে কত গ্রন্থ রচনা করিয়ে প্রকাশ করলেন। কেবীর অধিকাংশ বাংলা রচনাই অনুবাদ ও সংকলন। সম্পূর্ণ মৌলিক বাংলা

কল্যাণ নামমাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা গদ্য ও ব্যাকরণের বিশিষ্ট গবেষকরা ১৮০০ থেকে ১৮১৫-র সময়খণ্ডকে 'কেরীযুগ' বলে সম্মান জনিয়েছেন। কেরীর এই ঐতিহাসিক অবদান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন, 'Carey was the pioneer of the revived interest in the vernaculars'। ইউরোপের সাত-আটটি ভাষা ছাড়াও ভারত সহ এই উপমহাদেশের ৩৫টি ভাষা কেরী জানতেন। এইসব ভাষার বাইবেলের অনুবাদ ও চূড়ান্ত সম্পাদনা তিনিই করেছিলেন।

৩১ নং বছরজার স্ট্রিটে কেরী ও তাঁর সহযোগী মিশনারিরা একবণ্ড জমি কিনে সেখানে অস্থায়ী এক বাঁশের চালায় ধর্মপ্রচার বা উপাসনার কাজ চালাতেন। পরে চাঁদ তুলে এই জমিতেই কেরী ও অন্যারা ১৮০৯ সালে তৈরি করেন কলকাতার প্রথম ব্যাপটিস্ট চার্চ—'লালবাজার ব্যাপটিস্ট চ্যাপেল'। কেরীই ছিলেন এই মণ্ডলীর প্রথম ভারপ্রাপ্ত যাজক। এই লালবাজার চার্চকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর কেন্দ্রিক ব্যাপটিস্ট চার্চের মিশনারি কর্মকাণ্ড কলকাতা শহরে প্রসারিত হয়। ১৯০৯ সালে এই চার্চের শতবার্ষিকী উৎসবের সময় কেরীর স্মৃতিতে চার্চের নতুন নামকরণ করা হয়—'কেরী ব্যাপটিস্ট চার্চ'।

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরের এক বাড়িতে ও জন ছাত্র নিয়ে শ্রীরামপুর কলেজের ক্লাস শুরু এবং ১৮২১-২২ সালে দিনেমার স্থপতি মেজর উইকেডির নকশায় মিশনের সকলের সঙ্কিত অর্থে ব্যারো বিদ্যালয়ের ওপর ১,৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে তৈরি হয় 'শ্রীরামপুর কলেজ'র পাকা বাড়ি। অর্থের অভাবে নকশা অনুযায়ী কলেজটি কেরী সম্পূর্ণ করতে পারেননি। প্রাচ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতি-নর্ন এবং পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচিন্তার সম্মিলনে তৈরি হওয়া এই কলেজে অধ্যাপনার ব্যয়িত গ্রন্থে করলেন কেরী (প্রিন্সিপাল), মার্শম্যান, ওয়ার্ড, জন মাক, ফেলিক্স কেরী ও দেশীয় কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। এই শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন নিয়েই কেরীর সঙ্গে বিলেতের বিএমএস হোম কমিটির বদ-বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়। ফলে কয়েকজন ক্ষুব্ধ মিশনারি শ্রীরামপুর ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে আলাদা ব্যাপটিস্ট মিশন তৈরি করেন। ১৮২২ সালে বিএমএস শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেরী এই মর্মান্তিক ঘটনায় বিগ্নিত, কণ্ঠিত, হলেও অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াইলেন না। বিএমএস-এর সাহায্য ছাড়াই শ্রীরামপুর মিশন বহুল তরিয়েতে চলতে লাগল। এই সময়ে দেশীয় কিছু ধনী ব্যক্তি

মিশনকে আর্থিক সহযোগিতা করতেন।

কেরী ১৮২১ সালে শিবপুরের বিশ্ববিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেনের অস্থায়ী কিউরেটর নিযুক্ত হন। রক্তবাজারে 'Hortus Bengalensis' এক অসমাপ্ত 'Flora Indica' নামে দুটি ব. নাথানিয়েল ওয়ালিচ (কলকাতার যাদুঘরের পরিচরক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা)-এর সহযোগিতায় দুটি বণ্ডে ১৮২০ ও ১৮২৪ সালে কেরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ভেবজ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের পটভূমি, গবেষণায় এই দুটি দৃষ্টান্ত গ্রন্থ আজও প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। ১৮২০ সালে লেডি হেস্টিংসের উৎসাহে ১ নং আলিপুরে কেরী গড়ে তোলেন 'এন্টি-ওরটিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'। ১৮২১ সালে কেরীর দ্বিতীয় পত্নী শালোটি ও ১৮২২ সালে জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স মারা যান। ১৮২৩ সালে ৬২ বছর বয়সে কেরী তৃতীয় ও শেষবারের মতো ৪৫ বছর বয়সি বিধবা গ্রেস হিউজেসকে বিবাহ করেন।

১৮১৮ সালে (১২২৫ বঙ্গাব্দে) শ্রীরামপুর মিশন থেকে কেরীর উদ্যোগে ও মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'দিশমর্শন'। এই পত্রিকার সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হল একখানা ক্রোড়পত্র—যাতে কিছু দমসাহসিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল (একদল ঐতিহাসিকের মতে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ১৮১৮-র ১৫ মে তারিখে প্রকাশিত 'বঙ্গলা গেজেট'-ই বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র)। এই বছরেই শ্রীরামপুর মিশন থেকে মার্শম্যানের সম্পাদনায় ছেপে বের হল 'সমাচার দর্পণ'। সমাচার দর্পণ পরে ইংরেজি-বাংলা দ্বিজাতিক পত্রিকায় পরিণত হয়ে মোট সাতটি তেইশ বছর বেঁচে গেল। 'সংবাদ-কৌমুদী' ও 'সংবাদ-প্রভাকর' ছাড়া এতখানি স্থায়িত্ব সেকালের কোনও সংবাদপত্র পায়নি। এরপর মিশন ইংরেজি 'Friend of India' পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৮৭৫-এ এই পত্রিকায় ৩০,০০০ টাকায় কিনে নেন রবার্ট নাইট। অনেক পরে এটি গুরুজন ইংরেজি দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সঙ্গে মিশে যায়। ভারতবর্ষের প্রথম গুরু দৈনিক 'আখবরি শ্রীরামপুর' ও শ্রীরামপুর মিশন থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল।

গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়ার নিষ্ঠুর হিন্দু প্রথা বন্ধ করার জন্য কেরী গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলিকে অনুরোধ জানান। কেরীর উদ্যোগে ১৮০২ সালে আইন করে এই কুপ্রথা এদেশে বন্ধ করা হয়।

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে নওরাসহায়ের কাছে কেরী যন্ত্রে সতীদাহের একটি ঘটনাদেশে অত্যন্ত বিচলিত হন। পরে কয়েকজন দেশি-বিদেশি সহকর্মীদের সাহায্যে একটি সমীক্ষা চালিয়ে কেরী দেখলেন কলকাতার নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে মাত্র একবছরে ৪৩৮টি সতীদাহের ঘটনা ঘটেছে। মুতাজ্জয় বিনালাংকার প্রাচীন হিন্দু পুঁথিপত্র—বিশেষ করে স্মৃতিশাস্ত্র ঘেঁটে—কেরীকে জানালেন, সতীদাহ প্রথা আদৌ হিন্দু শাস্ত্রসম্মত নয়। অসহায়। নিরক্ষর হিন্দু বিধবাদের সমপত্তি দখল করার লালসাই ধর্মের ঘেরাটোপে সতীদাহ নামক কুপ্রথাকে টিকিয়ে রেখেছে। সতীদাহ প্রথাকে রদ করার জন্য কেরীর উদ্যোগে ক্ষেপে উঠল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণবাদী হিন্দুসমাজ। কেরী তবুও দমলেন না। 'সমাজের নরপ' ও 'শ্রেষ্ঠ অব ইতিয়া'-র পাতায় তিনি ও মর্শম্যান চ্যাংজেলা ভাষায় সতীদাহ প্রথার নিন্দা করলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের এই যৌথ আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ৫ ডিসেম্বর বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিবারক আইনে স্বাক্ষর করে তা দ্রুত অনুবাদ করে বিলি করার জন্য তাঁর বিশেষ নৃত মারফৎ শ্রীরামপুরে কেরীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এই বঙ্গানুবাদও কেরীর ঐতিহাসিক রচনার অন্তর্ভুক্ত।

কৃষ্ণরোগীদের তখন লোকে খুব ঘেঁষা করত। জনপদের বাইরে এইসব অসুস্থ্য অসহায় মনুষ্যগুলোকে হয় জ্বালত কবর দেওয়া হত, নতুবা পুড়িয়ে মারা হত। এইরকম এক দৃশ্য ১৮১২ সালে কাটোরাতে কেরী প্রত্যক্ষ করে শিউরে ওঠেন। এই কুপ্রথা এবং গঙ্গার ঘাটগুলোতে দেশীয় দাসদাসী কেনাবেচার বিরুদ্ধে কেরীর বিরামহীন প্রচারণার জন্য বিরত কোম্পানি ১৮৩০ সালে আইন করে কলকাতার জগজগৎ ঘাটগুলোতে ক্রীতদাস কেনাবেচার বাজার বন্ধ করে দেয়।

১৮১১ সালের ১১ মার্চ শ্রীরামপুর মিশনের ছপাখানায় অক্ষর সংগ্রহে আশ্রয় পেয়ে কং দ্ব্যাবদ গ্রন্থ, নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি, ছপার মেশিন পুড়ে যায়। কেরীর ২০ বছরের পরিশ্রম ও সাধনার ফসল, ভারতের প্রথম ১৩টি ভাষায় Universal Dictionary-র বিশাল পাণ্ডুলিপির অর্ধেকটাই ছাই হয়ে যায়। কলাই কল্যাণ, ৫১ বছরের কেরী এই বইটি আর কোনওদিনই সম্পূর্ণ করতে পারেননি। অগ্নিদগ্ধ এই পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ শ্রীরামপুরে 'কেরী আর্কাইভে' সযত্নে রাখা আছে।

১৮২৭-তে শ্রীরামপুরে সিম ইঞ্জিন চালিত এক কাগজ-কল তৈরি করে কেরী

প্রমাণ করে দেন, ভারতীয় কারিগরদের প্রতিভা ইউরোপীয়ান কারিগরদের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়।

এইভাবে ভারতবর্ষে একচল্লিশ বছরের কর্মজীবন কাটাবার পর ১৮৩৪-এর ৯ জুন শ্রীরামপুরের বাসভবনে, ৭৩ বছর বয়সে, মিশনের কোয়ার্টারে উইলিয়াম কেরী মারা যান হন। তাঁর ইচ্ছানুসারে শ্রীরামপুরে তাঁর সমাধি-ফলকে লেখা হল, "A wretched, poor and helpless worm, on Thy kind arms I fall" বাস। ঐকুই। আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রাণায় বিমুখ কেরী বারংবার বলেছিলেন তাঁর কোনও মূর্তি বা স্মৃতিস্তম্ভ যেন স্থাপন না করা হয়।

খ্রিস্টধর্ম প্রচারক, যাজক, ভাষাবিদ, সম্পাদক, সমাজসংস্কারক, লেখক, কবি-অনুবাদক, মুদ্রক, শিক্ষারতী ও অসাধারণ সংগঠনিকই শুধু নয়, সেই সঙ্গে খ্রিস্টানিত মননপ্রমিত উইলিয়াম কেরী বাংলায় এক ক্ষুদ্র সময়খণ্ডের নবজাগরণে প্রতীকও। ত্রিংশতাব্দের সঙ্গে দেশীয় কিছু ব্যক্তিবর্গ চাষার মুখের ভাষার এই ভ্রমভঙ্গি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তারা সবই সাহসহীন এর তীব্র বিরোধিতা করতে লাগলেন। ভাটপাড়ার রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজ এ কাগজে অগ্রগণ্য ছিল। ভাটপাড়ার পণ্ডিতসমাজ সম্পর্কে প্রবাদ আছে এরা মৌনব্রতকে কিংবদন্তি। অগ্রাঙ্গণের জ্বা মাড়ালেও গঙ্গাশ্রান করেন। এই রক্ষণশীলতা মোক্ষ/মুক্তি শতাব্দী থেকে শুরু করে বিশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্ন বছরের যাবায় মিথ হয়ে উঠেছিল। গঙ্গার পূর্বকূলে এক বিশালব্রতব্রতও কম জরগায় গড়ে ওঠে ভাটপাড়া। ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা বঙ্গের রক্ষণশীল সংস্কৃতির শিরোমণি হয়ে উঠেছিলেন। বৈকল আন্দোলনের পতনবর্তী সময়ে নবদ্বীপে গুরু ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিকে পিছু হঠতে হয়েছিল। সেই পর্বেই ভাটপাড়ার পণ্ডিতসমাজের উত্থান এবং ভাটপাড়া নামের সঙ্গে পরিচয় সমস্ত বাংলাদেশে। এখানেই কেরীসহ ভাটপাড়ার ব্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে অষ্টাদশ শতকের গুরু মোক্ষ। বিশ্বাস পণ্ডিত বীরেশ্বর নায়ালদ্বারের দাপটেই ভাটপাড়া গুরু কল রক্ষণশীল ভ্রমভঙ্গি। কথিত আছে, অষ্টাদশ শতকের জয়ের দশকে মঙ্গলক কলকল বাংলা বিশ্বর ওড়িয়ার এবং অবশ্যই নবদ্বীপের পণ্ডিতদের নিয়ে এক বিচারসভার আয়োজন করেন। ওই বিচারসভায় বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় পাঁচশো পণ্ডিত ছড়ান হন। সভার কিয়তক ছিলেন কাশী নরেশের সভাপতিও। ওই

বিচারসভায় যোগ দিয়েছিলেন পণ্ডিত বীরেশ্বর নায়ালস্বর। অশীতিপর এই  
নৈয়ায়িকের সঙ্গে ছিলেন তাঁর পরিবারের বহুশতাব্দীর একটি দল। তিনদিনব্যাপী  
শাস্ত্রীয় আলোচনায়, নবনীপের পণ্ডিতদের মত বিচার বিষয়ের মধ্যে আটটিতে  
পরাস্ত করে বীরেশ্বর নায়ালস্বর হের্ষের শিরোপা পান। সেদিন এই বিচারসভার  
বিচারক কানী নরেশের সভাপতিত্ব বীরেশ্বর নায়ালস্বরকে 'বিদ্যাবজ্রের বৃহস্পতি  
অবতার' বলে প্রণাম করেন। বিচারসভায় উপস্থিত পণ্ডিতেরা সেদিন ভটিপাড়াকে  
'নব-নবনীপ' বলে মেনে নেয়। ওর হয় নব-নবনীপ, ভটিপাড়ার ব্রাহ্মণ  
রক্ষণশীল পৌরবের পদব্যা।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে শাস্ত্র ও সাহিত্য বিচারে ভটিপাড়ার খ্যাতি ক্রম  
ধ্বনিয়ে পড়তে থাকে। এই খ্যাতিরসূচক হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের গোড়াতেই।  
গঙ্গার পূর্বদিকে ভটিপাড়ার অস্তিত্বের কথা জানা যায় বিগ্রহদাস পিপলাইয়ের  
'মনসাবিজয়' গ্রন্থে। 'ভাটিনে গুলি রয়ে বামে ভটিপাড়া / পশ্চিমে বাহিল বোরো  
পূর্বে কাঁকিনাড়া / মল্যাজোড়া গাড়ুলিয়া বাহিল সম্ভার।' "পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতির"  
লেখক নিম্ন যোগ জানিয়েছেন, ভটিপাড়ার সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই  
বসবাস শুরু করেন। আর লোকসমষ্টি, বৈদিক ব্রাহ্মণ নারায়ণ ঠাকুর নদীপথে  
যশোরথেকে আসতেন ভটিপাড়ায়। এই সময়ে ভটিপাড়ার জমিদার ছিলেন  
পরমেন্দ্র হালদার। নারায়ণ ঠাকুরের কাছে তিনি শ্রীক্ষা নেন। নারায়ণ ঠাকুরকে  
কিছু জমি দান করে তাঁকে ভটিপাড়ায় বসবাসের জন্য অনুরোধ করেন। নারায়ণ  
ঠাকুরের পৌত্র চন্দ্রশেখর বাচস্পতিই স্থায়ী ভাবে ভটিপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণদের  
বসবাসের সূচনা করেন। গড়ে উঠতে থাকে বৈদিক ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ। তবে  
বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগে এইখানে, এই ভটিপাড়া বৌদ্ধের অসিন্দাদের কত অংশই  
ছিল জালিক, স্থলিক, বাগদি, নম, মালো, কৈবর্ত শ্রোণর লোক। কিছু গোপ, কিছু  
সদগোপ ও তাঁতিয়ারাও ছিল। ছিল ভটিপাড়ার উত্তরভাগে একটি মুসলমান পাড়াও।  
ভটিপাড়ার রক্ষণশীল সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি বহু বেড়েছে, জেসে, বাগদি,  
কৈবর্ত, গোপ, সদগোপ ও মুসলমানেরা ভটিপাড়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রাচীনতম পাথুরে ঐতিহাসিক তথ্যে, ভটিপাড়ার মহারাজাধিরাজ বিজয় সেন  
পৌণ্ড্রবর্ন ভূক্তির অন্তর্গত বাড়ি বিষয়ে বাস সংযোগভুক্ত ভটিপড়া গ্রামের কথা  
আছে। বাস সংযোগ পরিণত হয় পরগনা জবেলি শহরে। ভটিপড়া বিভক্ত হয়

অনেকগুলি নৌজায়। গঙ্গাতীরের ভটিপাড়ার পাছকল মৌদিত নামের  
ভটিপাড়া। কেউ কেউ বলেছেন, নদীজীবী জালিক কৈবর্তরা এখন এসেছিল  
যশোর থেকে। সম্ভবত ভটিপাড়া নামটি যশোর থেকেই বহন করে এসেছিল  
ওরা। পূর্ব বাংলার ভটিপাড়া, ভটিগ্রাম, ভটিয়াপাড়া আছে বিভিন্ন এলাকায়। যশোর  
ফলনায়, সেনাই নদীর পাড়ে ভটিপাড়া-কলাগাছি, আবার ভটিপাড়ার নদীর তীরেও  
একটি গ্রামের নাম ভটিপাড়া। অনেকের ধারণা, ভটিচারণদের এলাকায় থেকেই  
ভটিপাড়া নামটি এসেছে। সংস্কৃতে তাই-ই ভটিপাড়া। কেউ কেউ বলে, ভটি  
ব্রাহ্মণদের নামানুসারেই ভটিপাড়া।

ভটিপাড়ার ক্ষেত্রে ভটিপাড়া পৌনে এক কিলোমিটার এলাকায়ই একসময়  
চতুর্দশটি বৈদিক টোল ছিল। চন্দ্রশেখর বাচস্পতি (১৬৭০-১৭৭০) চতুর্দশটি  
রাখতেন কিনা জানা যায় না। তবে তাঁর অধস্তন তৃতীয় পুরুষের দায় স্বত্ব  
১৩-১৪টি রাখার কথা আছে। ভটিপাড়ার রামমোহনই পিপলাইস্পতি, কলকাতার  
চতুর্দশটি, কৈলাশচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস নায়ার, জয়রাম  
নায়কজ্ঞান, বদ্রাম সার্বভৌম থেকে শুরু করে মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ  
জ্যোতিষী, মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন, পণ্ডিত মনোমোহন তর্কতীর্থ, শ্রীজীব  
নায়কজীবী নিজের নিজের বাড়িতে চতুর্দশটি পরিচালনা করতেন। এইসব টোলে  
অথেন, গজবর্ন, সামবেদ, অগ্ন্যবর্ন, অসুর্বেদ, গাভর্বর্ন, বাগবর্ন, শিখা, সাংখ্য,  
কেন্দ্র, উত্তিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, কাব্য, দেবভাস্য, মেঘাদিকর্ম  
ইত্যাদি শিক্ষাদেওয়া হত। চন্দ্রশেখর বাচস্পতির পরে একে একে ভটিপাড়ার  
অসিপলিতে টোল তৈরি হয়। পণ্ডিত সমাজের এই চতুর্দশটিটোলকে একসময়  
টোলের বাড়িও বলা হত। টোল বাড়িগুলিই ছিল বিনোদনের মন্দির। রক্ষণশীল  
গোড়া জামদার সূত্রপাত হত এই বাড়িগুলি থেকেই। রামমোহনের দিরাকর  
একেশ্বর আইনজীবী ব্রাহ্মণবাদের আড়ালে ব্রাহ্মণ ভটিপাড়ার পণ্ডিতদের  
ভালিয়েছিল। এই টোলগুলি থেকেই সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রবলের প্রেক্ষাপটে  
ভটিপাড়ার বৈদিকচর্চাও শুরু হয়। শুধু শিক্ষার্থীকে শাস্ত্রজ্ঞ করে তোলাই  
টোলগুলির পণ্ডিতদের কাজ ছিল না। গৃহীত মানবের জীবনব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয়  
উপদেশ, নিদান দেওয়ার জন্যও তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। এখনকার পণ্ডিতরা  
সংস্কারের নামে কুসংস্কারই প্রতিষ্ঠা করেছে। ধর্মের লোহাই দিয়ে জাতিভেদ ও

বর্ণবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে, ভাটপাড়ার বেশির ভাগ পণ্ডিত সমাজ। কেউ কেউ ব্রাহ্মণ্য সমাজের মানুষ ছাড়া অন্য কোনও সমাজের মানুষদের সামান্য সম্মান পর্যন্ত দিতেন না। এমনকি পণ্ডিতদের মধ্যেও নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। মূলত এদের প্রভাবে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবর্তে জোতিষ চর্চার মত শিক্ষা ব্যবস্থা বেড়ে গিয়েছিল। এই সময়ে বাংলা ভাষার প্রতি সংস্কৃতের বড় ধরনের আক্রমণ হয়। ভাটপাড়ার একদল পণ্ডিত বাংলা ভাষার চর্চা করলেও সেখানে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ঢুকে পড়ে।

ব্রাহ্মণরা বাংলার চর্চাকে ভালো চোখে দেখেননি। বাংলা ভাষাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছেন। তখন বাংলাকে মনে মিতে বাধা হ'লেন, বাংলা চর্চাকারীদের সামাজিক শক্তি ও সাংগঠনিক কারণে তখন এই ভাষার ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা হল। ব্যাকরণ ঠিক রইল, কিন্তু অভিধান খারাপ হল সংস্কৃত শব্দাধিক্যে। এর ইতিহাসটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদের' মোট দু'হাজার শব্দের মধ্যে প্রকৃত তৎসম শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র একশো। শতকরা হিসাবে তা ৫টি। পরবর্তীকালে 'জীবনকীর্তন' কাব্যে সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তখনো শতকরা ১২.৫-কে ছাড়িয়ে যাননি। তৎসম শব্দ বাড় টানবিশ শতকের গদ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হস্তক্ষেপে। বাড়তে বাড়তে তা শতকরা ৮০-তে এসে দাঁড়ায়। শতকরা ৮০ ভাগ সংস্কৃত শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি ইংরেজিতে লেখা বাংলা ভাষার ওপর তাঁর ব্যাকরণ বইতে। (১৮১৮-তে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে)। অথচ এই বইয়েরই ১৮০১ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে কেবী মন্তব্য করেছিলেন যে, সাধু বাংলা যদিও সংস্কৃত থেকেই উদ্ভূত, তবু 'Multitudes of words originally Persian are constantly employed in common conversation, which perhaps ought to be considered helpful rather than corrupting the language.'

১৮ শতকের শেষের দিকে বাংলা ভাষা থেকে কীভাবে আরবি-ফারসি শব্দ দূর করে সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল তাও বিবরণ দিতে গিয়ে সম্বন্ধীকৃত দাস 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস'-এ লিখেছেন, ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে জলদেউ এবং পরবর্তীকালে হেনরি পিটস ফরসাইট ও উইলিয়াম কেবী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জনমীর সম্ভবন হারিয়া আরবি পারসীর অনুবিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমতো

ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় ভাষা অল্পদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ সালে এই আরবী-পারসী-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮০৮ সালে আইনের সাহায্যে কোম্পানির সদর মফস্বল আদালত সমূহে আরবী-পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজি প্রবর্তনে এই যজ্ঞে পূর্ণাঙ্গতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, আরবী পারসীকে অগ্রস্ত হারিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যাকরণ-অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল; সাহেবরা সুবিধা পাইলেই আরবী-ফারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রধান্য দিতেন; কলে দশ পনেরো বৎসরের মধ্যে বাংলা-গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল। ... অধিষ্ঠার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভগবতগীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দসংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়া সংস্কৃত রীতিতে বাংলা শব্দকোষ সমুদ্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ঠিক একই রকমভাবে বাংলার বেশকিছু মুসলমান পণ্ডিত বাংলার পরিবর্তে ফারসী-উর্দু ভাষাকেই প্রাধান্য দিতেন। মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র হযীর প্রেরণার কারণে মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেন। সুলতানি ও নবাবি আমলে ফারসি ছিল সরকারি ভাষা, তখন মৌলবীরা সুবিধা পেয়েছেন তাঁদের ফারসি জ্ঞানের নকশ। ব্রাহ্মণরাও শিখেছিলেন সেই ভাষা। রামমোহন চমৎকার ফারসি জানতেন। মনুসূদন, নবীনচন্দ্র সেন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়—এঁদের পিতা ফারসিতে দক্ষ ছিলেন এবং এরা যে ব্যক্তিগত ছিলেন তা নয়। নিয়মের মধ্যেই পড়েন, কিন্তু ভয়ও প্রেমাগত নৈকট্যের ভেতরে সংস্কারগত দূরত্বের একটা বোধ ছিল বৈকি। সেই বোধটাই সক্রিয় হয়ে উঠল তখন ইংরেজরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় এল। ক্ষমতার নতুন আধিকারীরা যাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, সেই মুসলিম শাসকদের সংস্কারায়ের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে তুলবে এটা যান্ত্রিক ছিল না। গড়ে তুলতে ইংরেজ শাসকরা চেষ্টাও করেননি। বরং মুসলিম শাসনামলে হিন্দু মতাবলি কেমন অন্যায়ক্রান্ত ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় ছিল সেটা মনে করিয়ে দিয়ে এই প্রেক্ষিকে ইংরেজরা নিজেদের কাজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ওই শাসকদের প্রশংসে চরিতার্থতার সুযোগ পেয়ে বেশ খরীত হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে

এর প্রভাব কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে বেশ প্রকটভাবে দেখা দেয়। ভাবলে থকাক হতে হয়, ভাষায় যে সংস্কৃতায়ন ঘটেছিল তার প্রতিফলিত বাংলাদেশে কল্প নিয়েছিল এক 'অপূর্ব মুসলমানী' ভাষা। কথটা অপ্রিয় হলেও খুবই সত্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ভাষার পার্থক্য মানসিক পার্থক্যের সূচী করল কিনা সে সম্পর্কে এখানে কোনও মতামত দেওয়া সম্ভব হবে না। আসলে মতামত দেওয়া খুবই সম্ভব ছিল। সবাই মিলে তা নিলে কে জানে হয়তো ঘটনার গতি সেই সাম্প্রদায়িকতার অভিমুখে ধাবিত হত না। আর সেটা হার্নি বালই বাঙালি জাতির জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য এটা স্বীকার করেছেন যে, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ওই সংস্কৃতায়ন ভাষার শক্তি তো বৃদ্ধি করেছে বরং জাতি হিসেবে বাঙালিকে দুর্বল করে ফেলেছে। খুবই খাটি কথা। অবশ্যই দুর্বল করেছে, কেননা তা সাহায্য করেছে বাঙালিকে বিভক্ত করতে। জাতিভেদ আর ধর্মভেদ দুটোই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বার কয়েক গেটা বাংলা ভাষা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে চলেছে দক্ষা; ঘটেছে রক্তপাত।'

১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে লেখেন। 'একে তো ইংরেজি ভাষায় অভিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস, পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাব ভাষার সহিত তাঙ্কর কোনও মিল নাই। তাঙ্কর পরে আঁকর ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশি।'

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই একমাত্র দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ মিলন, কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমর্থন করেন বঙ্কিমচন্দ্র, ওরফদা বঙ্গোপাধ্যায় ও কানকামোহন বসু। এরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন। সিন্ডিকেটের (প্রধানত বাঙালি) সদস্যরা সেই প্রস্তাব গৃহীত করে দেন। রবীন্দ্রনাথ এরপর 'সাধনা' পত্রিকায় সম্পাদকীয়ভাবে লেখেন।

'... সিন্ডিকেটের সভাপতি বাঙালির শিক্ষায় বাংলার কোনও উৎসাহিতোদী প্রীতির করেন না। এবং আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট এইটাই প্রধানত অস্পৃহিত উত্থাপিত হইয়াছে।'

দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতি স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই, একথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।"

১৮৯৩ সালে 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ আবার লেখেন, "কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে, তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীকৃত, তাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিখাস প্রখ্যাস নিম্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন করিতে পারা যায়..."

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা নিয়ে ভাবনা, জীবনশায় কার্যকর তো দূর অস্ত, মৃত্যুর এত বছর এসেও কার্যকর হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রথম বাংলার ভাষণ দিয়েছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার কথা হল, প্রথমদিকে শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমানের বাংলাকে কেবলমাত্র বাঙালি হিন্দুর ভাষা বলে মনে করতেন। মাজলুমের মৌলবি-মাদানারার কট্টর সমর্থক ছিলেন উর্দু-সরাসরি। এমনকি নব্য শিক্ষিত মুসলমানরাও বাংলা ভাষাকে বাঙালি মুসলমানের ভাষা বলে স্বীকার করেননি। উদাহরণস্বরূপ আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯০), সৈয়দ আহম্মদ আলি (১৮৪৯-১৯২৮), আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৮৫২), আবদুল জব্বার খান বাহাদুর (১৮৩৭-১৯১৮), সৈয়দ শামসুল হোস (১৮৬২-১৯২২) প্রমুখের নাম করা যায়। তবে এরা উর্দু-সরাসির সঙ্গে ইংরেজি ভাষার চর্চা করেছেন। বঙ্গলি মাজলুমার রিপোর্টে আবদুল লতিফ আরবি-ফারসি শিক্ষার পক্ষে যে সব বুদ্ধি প্রদর্শন করেন তার মধ্যে সেকালের শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমানদের শিক্ষা-সম্পর্কিত মনোভাব ব্যক্ত হয়। আবদুল লতিফ বলেন, 'Unless a Mahomedan is a Persian and Arabic scholar, he cannot attain a respectable position in Mahomedan Society, i.e., he will not be regarded or respected as a scholar, and unless he has such a position, he can have no influence in the Mahomedan Community. Consequently a Mahomedan who has received an English education and has

omitted the study of the Persian or Arabic, is little able to impart the benefit of that education to the members of his community. But if he knows Persian and Arabic along with English, he acquires influence in society and is of course sure to use his influence in the interest of the Government. The Government should, therefore in my humble opinion, devise such means where-by the Mahomedans may be taught at once English and Persian and Arabic.' (Nawab Bahadur Abdul Latif : His writings and Related Documents, Page-23)

তদনীন্তন ইংরেজ রাজপুত্ররাও মুসলমানদের এই মতামতকে সমর্থন করেন। কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড ডেনিশম রস মুসলমান শিক্ষা সভার অধিবেশনে উর্দুকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন, 'বক্তব্যে উর্দু ভাষার শিক্ষা দেওয়া হইবে। কেননা বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিলে মুসলমানের জাতীয়তা অর্ধেক বিনষ্ট হইবে এবং বাংলা ভাষা মুসলমানদিগকে হীনবীর্য করিয়া ফেলিবে।' (মিহির ও সুধাকর, ১৩ আশ্বিন, ১৩০৯) শ্রমজীবী সমাজ থেকে যে সকল বাঙালি মুসলমান হয়েছে তারা ব্যতিত অন্য সকল বাঙালি মুসলিম বাংলা ভাষাকে একরকম ঘৃণাই করত। ধনী গোড়া মুসলমানেরা বাংলা ভাষার জয়জয়কার একেবারে সহ্য করতে পারত না। যেমন টোলের সংস্কৃত পণ্ডিতরা বাংলা ভাষাকে চাষা ও অজ্ঞদের ভাষা বলে অবজ্ঞা ও ঠাট্টা করত।

'মিহির' সম্পাদক সেই আবদুল রহিম তো বাংলাভাষার কোনও উৎকর্ষই স্বীকার করতে চাননি। তিনি এলেন, 'বাঙ্গাল্যকে একটা ভাষা বলিতে যাও, তাহাতেই অনেকের আপত্তি আছে। বিশেষ ও পড়ার কালেপক্ষ নবাব বাহাদুর, বী বাহাদুর, ডাক্তার, কবিরাও ও অনেক বড় বড় XYZ এর পণ্ডিত ইহাকে এখনও ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তাহা সাহিত্য এবং তাহা আবার চর্চা, এ সম্পূর্ণ ব্যতীত।' (মিহির, জানুয়ারি ১৮৮২) কেউ কেউ আবার উর্দুকে 'Lingua franca' বা যোগাযোগের ভাষা বলে মনে করতেন। ১৩২৫ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেছিলেন, 'উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে মোসলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দু দরকার।' (বঙ্গীয়

মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ, ১৩২৫)। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত 'হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা' গ্রন্থের ভূমিকায় মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ বলেছেন যে, বাংলাদেশের মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা হওয়াতে 'বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে।' এর ফলেই তারা জাতীয়তাবিহীন, নিস্তেজ, দুর্বল ও কাপুরুষ হয়ে পড়েছে। ধর্মীয় অন্ধত্ব থেকে জন্ম নিয়েছিল এই রূপ মানসিকতার। এরা গরিব মুসলমানদেরও ঘৃণা করত। হিন্দু ব্রাহ্মণ জাতপাঠের মত ধনী মুসলমানও নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আলাদা আলাদা সংগঠন ও বিন্যা শিক্ষা গড়ে ওঠে। বঙ্গীয় টোল পণ্ডিত আর ধনী গোড়া মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে ফারাক ছিল না।

পঞ্চানন তর্করত্ন ১৮৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দে নিজে একখণ্ড জমি কেনেন। ওই জমিতেই গড়ে তোলেন 'ভটিপাড়া সংস্কৃত কলেজ'। সরকারি অনুমোদনও লাভ করে। টোলের শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতেরাও শাস্ত্র ও সাহিত্যিকতা নিয়ে চর্চা করে ভটিপাড়ার বিন্যচর্চার উত্তরাধিকারকে পুষ্ট করেন।

ভটিপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের অদর্শ ছিল হিন্দুশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র নির্ভর ব্রাহ্মণ্য জীবনচর্চা। এই জীবনচর্চার সঙ্গে অসঙ্গতিভাবে জড়িত সারস্বত সাক্ষা। ভটিপাড়ার পণ্ডিতসমাজ সেন্নি অন্তত বুকেছিলেন, বিন্যচর্চার পাশাপাশি জীবন চর্চাকে স্বাভাবিক দিতে হবে। তাহলেই গড়ে ওঠে এক অলৌকিক আশ্চর্য। সেই কারণেই বর্ণাশ্রম মান্যকারী নৈতিক জীবন যাপন প্রণালী অনিবার্য হয়ে উঠেছিল মহাদাতা গুরুকুলের কাছে। এজন্যই মন্দির নির্মাণও জরুরি হয়েছিল ওই শৌনে এক কিলোমিটার লম্বা ও আশ কিলোমিটার চওড়া ভূ-খণ্ডে। ভটিপাড়া হয়ে উঠেছিল মন্দির নগরীও। যে মন্দিরে বাংলা ভাষা উচ্চারণ হত না। যে মন্দিরে ব্রাহ্মণ ও তাদের তাবৎপরি সমাজের মানুষ ছাড়া আর কারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। টোল-বিদ্যালয় ও কলেজে অন্যদের প্রবেশ কঠোরভাবে নিষেধ ছিল। ভটিপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণেরা শৈব ছিলেন। তাই ভটিপাড়া জুড়ে কেবলই শিবমন্দির। অন্তত সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে ও তারও পরে শিবের মন্দিরই তৈরি করেছে পণ্ডিত সমাজ। ওই ছোট্ট পরিসরে নয়নভুলানো সব শিবমন্দির নির্মিত হয়েছে সেই সময়ে। বীরেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার নিজের জমিতে দুটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন। ওই দুটি মন্দিরের একটিতে এখন শীতলা মন্দির। বাপেশ্বর পঞ্চানন গঙ্গ





অতঃপর অস্তিত্ব ও শিক্ষিত মুসলমানরা বাংলা ভাষার মুসলমানি চরিত্র রক্ষায় সচেষ্ট হন। হান্দের কমিশনকে প্রদত্ত উত্তরে এই নীতকের সূত্রপাত করেন আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩)। তাঁর মতে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দে মিশ্রণ ঘটালে নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের পক্ষে সহজ হবে ধর্মশিক্ষা। ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'ভার্নিনুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে সৈয়দ নওরাব আলি চৌধুরী বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থে সংস্কৃতবাক্য বাংলা শব্দের বিরোধিতা করেন।

১৯০০ সালে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'নূর-অল-ইমান' পত্রিকার সম্পাদক মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলি বাংলা ভাষায় মুসলমানি চরিত্র রক্ষার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। সম্পাদক লেখেন, 'বাক্সালা পাঠশালায় হিন্দু শিক্ষকের নিকট হিন্দু প্রণীত পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া যাঁহারা বাক্সালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা তোতাপাখির মত সংস্কৃতমূলক শাবু বাক্সালা শিখিয়াছেন। বলিবার সময়ে ও লিখিবার কালে সংস্কৃত পণ্ডিতগণের 'এস্তেমালী' সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এসলাম ধর্মের সহিত অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধবদ্ধ ওজু, গোসল, ফরজ, ওরাজেল, হালাল, হারাম, আজ্জাহ, রসুল ইত্যাদি শব্দগুলি 'হার্বনিক' বলিয়া দৃশ্য করেন এবং তৎসমুদয়ের সংস্কৃতমূলক শাবু বাংলার তর্জমা করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।' সম্পাদক অবশ্য বাংলা ভাষাকে ত্যাগ করার কথা বলেননি, 'বাক্সালা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া দৃশ্য না করিয়া আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া হউন।' (নূর-অল-ইমান, ভাদ্র, ১৩০৭)। সৈয়দ এমদাদ আলি (১৮৭৬-১৯৫৬) 'মাতৃভাষা ও বঙ্গ মুসলমান' প্রবন্ধে বঙ্গভাষারূপ নতুন দুর্গের মধ্যে নিজেদের নিরাপদ স্থান গ্রহণের কথা বলেছেন। তা না হলে 'হিন্দুভাব ও হিন্দু আদর্শপূর্ণ সাহিত্য-পাঠে মুসলমান সমাজ ক্রম ক্রমে নিজেদের বিশেষত্ব বর্জিত হইয়া এক অজুত 'মূর্তি' পরিগ্রহ করিবে।' 'ইসলাম প্রচারকের' সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) তাঁর পরিকল্পনা ১৯০৩ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় লিখলেন, 'যেদিন আমরা এই মাতৃভাষা বাক্সালা, জাতি ভাষা আরবি-ফারসি উর্দু প্রভৃতি হইতে জাতীয় বঙ্গ শব্দ, জাতীয় ভাব, জাতীয় চেতনা, জাতীয় ধর্মপ্রাণতা আনয়ন করিতে পারিব, সেদিন এই মাতৃভাষা দ্বারা আমরা যথোচিত ফল লাভ করিতে সক্ষম হইব।'।

'সওগাত' পত্রিকা হিন্দু ও মুসলমানের ভাব ও ভাষার সম্বন্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, মুসলমানদেরকে বাংলা সাহিত্যের প্রতি অধিক

আগ্রহ করার জন্য তাদের কথিত শব্দ আমাদের ভাষায় ব্যবহার করা কর্তব্য।

'সওগাত' এ সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

১. ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যের গতি / মোজাম্মেল হক
২. বাক্সালা সাহিত্যের কথা / আবদুল গফুর সিদ্দিকি
৩. বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব / নীলেশচন্দ্র সেন
৪. আমাদের ভাষা ও সাহিত্য / তসদ্দুক আহমদ
৫. বাক্সালা ভাষা ও মুসলমানি শব্দ / মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী
৬. সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা / আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
৭. বাক্সালা সাহিত্য ও বাক্সালী মুসলমান / এস ওয়াজেদ আলি
৮. সাহিত্য ও যুগধর্ম / আবুল মনসুর আতমদ
৯. বাক্সালী মুসলমানের সাহিত্যিক আগরণ / অরবুল করিম সাহিত্যবিদ্যারত্ন
১০. ভাষাজন ও চিন্তাশীলতা / আবুল ফজল

একইসাথে তাঁর চিঠিতে ভাষার নমনীয়তার গীমার কথা বলেছেন। প্রয়োজনের তর্জনে ভাষা নতুন শব্দ আমদানি করে, বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ সহজেই স্থান করে এসেছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে চলতি ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'হদেশি বিদেশি স্থানকা ভারি সব শব্দই যেইযেইবি করতে পারে তার আভিনায়।' তাঁর মতে, 'ভাষার অবিমিশ্র বৌদ্ধিমান' নিয়ে ঋতুপূর্ণ কাটা গোড়ামি; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'কিন্তু ভাষাকে দুইমুখো করে তার দুই বনী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলা উচিত।'।

একই বাংলা মুসলমান বুদ্ধিজীবী মহল বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের মধ্যে মোটামুটিভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে ধর্মীয়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত কারণে এবং সর্বোপরি ইসলামি সাহিত্য গঠনের প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় কিছু পরিমাণে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের আনয়ন প্রয়োজন। ১৯২৬ সালের ৬ আগষ্ট বাংলার মুসলমান সমাজের কৃষ্টি ও সাহিত্য চিন্তার কর্তব্যের বহীরা মুসলমান সাহিত্য সমিতি কলকাতার এম এল জুবিলি ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় অবদান রেখেছিল যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন আরবি ও ফারসি

শব্দবহুল বাংলাভাষাতে স্বীকৃতি দেয়। এই সমিতি পরবর্তীকালে ১৯৩২ সালে ২০ আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত আর একটি সভায় স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে যে বাংলার মুসলমানের ভাষা বাংলার হিন্দুর ভাষা থেকে পৃথক এবং যেসব ব্যক্তি বা মহল বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে অনিচ্ছুক তারা অবশ্যই মুসলিম বাংলাভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করছে। ১৯৩৫ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি 'সৈর অব ইতিহাস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে তৎকালীন বাংলার মুসলমান সমাজের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, আবদুল কাদির, মুজিবুর রহমান, শামসুল্লাহ, মুহাম্মদ মেদাবের, আবুল আহমদ প্রমুখ একই বক্তব্য উপস্থিত করেন এবং সার্বিক মুসলিম সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যে বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয় কিছু আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ দরকার তা তারা উল্লেখ করেন। এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আবার সুসাহিত্যিক ও সমালোচক এস ওয়াজেদ আলির মতো ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগেই সন্দেহ ছিলেন না। ইসলামি শব্দের বাংলাভাষায় সঠিক উচ্চারণের জন্য তিনি বাংলা স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ উর্দু বর্ণমালার কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপ করতেও চেয়েছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যেমন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, মোতাহার হোসেন চৌধুরি বা কাজী আনোয়ারুল কাদির (যাঁরা শিখা গোষ্ঠী নামে পরিচিত) আরবি ফারসি শব্দের কল প্রয়োগ চাননি বা স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ পরিবর্তনের পরিপন্থীও ছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল—বাংলা ভাষায় পরিবর্তন না করে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যদি প্রকৃত ইসলামি চিন্তা ও ভাব অঙ্গা হার তবেই বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য গড়ে উঠবে।

একথা ঠিক যে, কাজী নজরুলের আগে কোনও বাঙালি সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় সাক্ষ্য ও সার্বকতার সঙ্গে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের প্রয়োগ করতে সম্মত হননি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্য কিছু সীমিত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সার্বিক হোক বা অসার্বিক হোক বাঙালি মুসলমান লেখক ও সাহিত্যিকদের বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি বা উর্দু শব্দের প্রয়োগে খানিকটা অনাবশ্যক প্রচেষ্টা অবশ্যস্বরূপে সমকালীন হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রতিবাদের বড় তুলেছিল বাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা বরকার, কর্মজীবনের প্রথমে উইলিয়াম ফেরী যখন

দিনাজপুরে ছিলেন তখন স্থানীয় লোকদের ভাষা ছিল একটি নয়, দুটি। ব্রাহ্মণরা যে ভাষা ব্যবহার করে সেটি বাংলা, আর অন্যরা যে ভাষায় কথা বলে সেটি হল বাংলা, হিন্দুস্তানী, ফারসি ইত্যাদির একটি মিশ্রণ। এই দ্বিতীয় ভাষাটি মুসলমান ও পার্শ্ব হিন্দুদের। কিন্তু ওই দুই ভাষার ব্যবধান তখন সাম্প্রদায়িক চেহারা নেয়নি, সেটা নিল পরে, মুসলিম সমাজে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠল তখন। আবারও স্বরণ করা যাক যে, সাম্প্রদায়িকতা আসলে দুই দিকের দুই মধ্যবিত্তের একটি বৈষায়িক সংগ্রাম, যে সংগ্রামে তারা ধর্মকে ব্যবহার করেছে একটি সুবিধাজনক অস্ত্র হিসেবে। ফলে দুই পক্ষের মৌলবাদীরা চেঁচা করেছে শব্দের ক্ষেত্র স্বাভাবিক বজায় রেখে চলতে।

৩য়ে এটা ঠিক যে, শব্দ নিজে নিজে কিছু সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে না। কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায় কোনও শব্দকে যখন বিশেষ অর্থে বা অনুবঙ্গযুক্ত করে ব্যবহার করে, তখনই তা সাম্প্রদায়িক পরিচয় লাভ করে। শব্দের স্বরূপ, উদ্ভব, বিকাশ যেদিন থেকেই আলোচনা করা যাক, শব্দ সবসময় সম্প্রদায় নিরপেক্ষ। তাকে সম্প্রদায়ের গড়ে রঙিয়ে তোলা হয় মাত্র।

উল্লেখযোগ্য যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখেরাও তাঁদের কবিতায় সচেতনভাবে আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। নজরুল ইসলামও সেই শাণ্ডা অনুসরণ করেছেন। কিন্তু 'বাংলাভাষায় মুসলমানি চরিত্র' রক্ষার জন্য নজরুল আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেছেন—একটু সিদ্ধান্ত সর্বাঙ্গীন নয়। কারণ নজরুলের কবিতায় তত্ত্ব, অর্থতৎসম, দেশজ শব্দের পাশাপাশি তৎসম শব্দের প্রয়োগও পূর্ণ। আর এক জাতির ভাষা অন্য জাতির উপর চালিয়ে দিলে তার ফল কী ভাবনের ও বিরূপ হয় তা প্রত্যক্ষ করা যায় ১৯৭২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে। বাঙালিকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পাকিস্তান সরকারের পুলিশ মিরীহ সংগঠিতদের উত্তর গুলি করে। নজরুল রক্তপথ সেদিন রক্তাক্ত করে দিয়েও মাতৃভাষার অধিষ্ঠান রক্ষার দাবিকে নস্যাৎ করতে পারেননি। বাঙালির সাহস ও মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগ সেদিন বিফলবাহী দেখেছে। আজও আমাদের রক্তে শিরোন তোলে, আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে বাঙালি একুশে ফেব্রুয়ারি / আমি কি ভুলতে পারি' গানটি।

বাঙালির নবজন্ম তার একুশের চেতনা, যা ভাস্কর্যের মতো আর এই ভাষা

আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আসে পরপর সাক্ষাৎ। ১৯৫৪ সালের ৭ মে পাকিস্তান সরকার বাংলাভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃত দেয়। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসাবে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করে। আইয়ুব খানের সামরিক সরকার এ ছুটির ঘোষণাকে বাতিল করে। গণ-আন্দোলনের মুখে পূর্ব পাকিস্তান সরকার পুনরায় ছুটি হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৭১-এ নানান বাধ্য-বিধ্য পর হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠে। স্বাধীন বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারী ছুটি ও শহিদ দিবস হিসাবে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর রাষ্ট্র সংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশে মাতৃভাষা আন্দোলনের মর্যাদা পাওয়ার সংগ্রামের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের।

ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম কবিতা' গীতা ছুঁয়ে মাতৃভূমিকে-শত্রুশক্তির শপথ গ্রহণ হিন্দু সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল ঠিক তার বিপরীতে গীতা ছুঁয়ে শপথের পদ্ধতি মেনে পৌত্তলিকতা বিরোধী নিরাকারবাদী মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই স্বাধীনতার লড়াইয়ে একাত্ম হতে পারেনি। এছাড়াও বর্ণবাদী হিন্দুদের অহমিকা, শিখিরে রাখা সমাজের প্রতি অবজ্ঞা পোষণের ফলে বাংলাদেশী জনজীবনে বেড়েছিল দ্বন্দ্ব, অকিঞ্চিৎকর। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তার বিঘ্নিত হবার ঝুঁকি ঘটেছিল। যার পরিণতিতে আত্মপাতি সংঘর্ষ, রক্তপাত আর অশান্তি মৃত্যুর মিছিল বয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন আবু ভরলোকদের সম্পদ-সম্মান-চাকরি সোভ সোবিয়ে ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দেয়। এই আবুদের সমক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "হস্ত দুর্বল হইলেও বেতন গ্রহণে পটু, চর্ম কোমল হইলেও সাধারণের নির্মিত দ্রব্য বিশেষের প্রহার সহিষ্ণু, যাহারা বায়েম আজও, পরভাষা পারদর্শী, মাতৃভাষা বিরোধী, ভাষ্যগাই আবু। তিনি আরও কথ্যাত করেছেন 'ইংরেজ স্কোত্র'-তে--"হে ইংরেজ, আমি তোমার প্রণাম করি। আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব। তোমার পিছু পিছু বেড়াইব। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমাকে চাকর দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।"

ভারতে তথা পৃথিবীর কোন দেশে প্রথাগত ভাবে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষাও নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্যে শুধু চাকরি পাওয়া একথাও কেউ বলেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলনে ভাষণে ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের সন্তানদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রেখেছিলেন-- "... তাদের লক্ষ্য কি কেরানিগিরি, ডেপুটিগিরি? তিনি আরও বলেন, "ইংরেজি ভাষা অতিমাত্রায় বিজ্ঞাতীয় ভাষা। ... পাঠ্য গ্রন্থের পূর্বেই মুখস্ত আরম্ভ করিতে হয়। ... হস্তভাষা শিশুদের কোনো নির্দেশ কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।" 'পঞ্চতন্ত্র'-তে তিনি আরও স্পষ্ট করে বললেন, 'ইংরেজের কামান আছে, বন্দুক আছে কিন্তু ছবিশটি অক্ষরই কি কম।' ভাষাভেদের পক্ষে বর্গের উপদ্রব থেকে ইংরেজি জ্ঞান অক্ষর আরও বেশি ভয়ানক। অনেক জল খোলার পর ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতীতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভারতের সর্বধারণের ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৩৭ সালে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ খাঁ বঙ্গীয় পরিষদে বাংলাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ইতিমধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইন্দ্রকুমার বিন্দ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, বৈষ্ণবনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলামের মত নিকপাল কবি সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের আঙ্গিনায় মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর সেরা নোবেল পুরস্কার এনেছেন বাংলাভাষায় লিখে। তথাপি ১৯৩৭ সালের ২৯ জুলাই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চাপান-উতোর শুরু হয়। এই সময়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত টুকরো হয়। অবশ্যই ৯০ ভাগ সাধারণ মানুষের মতামত না নিয়ে। সাম্প্রদায়িক বিষয়ে কয়েক লক্ষ মানুষ হত্যা হয়। গৃহহীন উদ্ভাস, শরণার্থী হয় কয়েক কোটি সাধারণ পরিব্রজন। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে কোনপ্রকার ঘোষণা ছাড়াই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা-রূপে ব্যবহার শুরু করে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় প্রতিবাদ সভা। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সংসদপরে, দৈনন্দিন কাজকর্মে, সরকারি প্রচার যন্ত্রে বাংলা ভাষার মাঝে উদ্দেশ্যমূলক আরবি, উর্দু, ফারসি শব্দ বসিয়ে বাংলাভাষাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও

অসহনীয় করে তোলার প্রচেষ্টা চলে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তখনও বেশ ভাগের করুন কল্পার দগদগে বা শুকায়নি। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানী গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই বিরোধী দলনেতা স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য দাবি তোলেন। দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'So, Sir, I know I am voicing the sentiment of the Millions of our state and therefore Bengali should not be treated as a provincial language. It should be treated as the language of the state.' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন পূর্ব পাকিস্তানের আর এক সদস্য প্রেমহরি বর্মা। প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিছুক্ষণের জন্য গোটা পরিবেশে স্তব্ধতা নেমে এল, তারপর গুজ হল তাঁর বিরোধিতা। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি তার তাঁর বিরোধিতা করেন। পূর্ববঙ্গের রাজা নাজিমুদ্দীন কঠোর ও আপত্তিকর ভাষায় বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ভৎসনা করেন। শুধু তাই নয় চিৎকার করে ঘোষণা করেন— 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' সেদিন বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারলেন, ইসলামী আতঙ্কবোধের চোরা ঘোড়ার অন্তরালে লুকিয়ে রাখা আতঙ্কচাপ অশ্লীল সংকেত। তাঁরা ধরে ফেলেন পাকিস্তানী চক্রান্তের ফন্দি। পাকিস্তানী চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য হল—ধর্মীয় সংঘাত নয়, সম্প্রদায়গত বিভেদ নয়, ছোঁয়াছুয়ির ব্যামো নয়—একটা জাতিকে ধীরে ধীরে তার শিক্ষার, তার চিন্তনের সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে শেকড় গুছ উপড়ে ফেলা। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের, সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী থেকে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ সভা করেন। শহর থেকে গ্রামে এই প্রতিবাদ সভা ছড়িয়ে পড়ল। ফলে, বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার বলিষ্ঠ দাবি গ্রামের সাধারণ মানুষের, সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের দাবি হয়ে উঠল। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ উর্দুভাষী মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গে র বাংলাভাষী মুসলমানদের মনেপ্রাণে এক ধর্মের, একই মুসলমান বলে মেনে নিজে না। তারা বিশ্বাস করতো বাংলার মুসলমান আসলে বাঙালি হিন্দুদের দোসর। এদের অচর-অচরণে, পোষাক-আশাকে, চিন্তনে-সংস্কৃতিতে মিশ্র এবং অকশ্যই অমুসলিম সংস্কৃতির ঘেরাটোপে বন্দি। এদের উর্দুভাষি পশ্চিম পাকিস্তানীদের 'দাস' বানাতে গেলে প্রথমে দরকার মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়া। ফলে, রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী প্রশাসন ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা সংগ্রাম

কমিটির সদস্য সামসুল হক (তদানীন্তন মুসলিম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক), ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান (পরবর্তীকালে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পরে রাষ্ট্রপতি) ও অলি আহাদ সাহেবকে পাকিস্তান নিরপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে।

সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে আরও দ্রুত। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর মাতৃভাষা গুজরাটি ভাষায় বলেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' উপস্থিত ছাত্ররা এই ঘোষণার তাঁর প্রতিবাদ করে। ১৯৪৮ সালের ২৮ মার্চ রেডিও পাকিস্তানের বেতার ভাষণে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভাষা আন্দোলনকারীদের কঠোর হস্তে দমনের কথা বলেন। এতদিনে বাঙালি মুসলিম-অমুসলিম উভয় সমাজের মনুদ মাতৃভাষার মর্যাদা আদায়ে একবাক্য শক্তিশালী সংগঠনে রূপ নিয়েছে। ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার সাহিত্য সম্মেলনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারা এক ভাষায় বাঙালিদের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে মালা-তিলক-টুপি-লুঙ্গি-শাড়িতে তা ঢাকবার জো নেই।'

১৯৪৯ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টনের জনসভায় গভর্নর জেনারেল রাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করে একমাত্র 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' ২৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে All Party Committee of Action গঠিত হয়। ওরা ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাঙালির ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত গরিষ্ঠতাকে অসম্মান ও পদদলিত করার প্রতিবাদে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের সভা হয়। আবুল হালিমের প্রস্তাবানুসারে পূর্ববঙ্গ সরকারের আসন্ন বাজেট অধিবেশন চলাকালীন অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ধর্মঘট রোখ করার জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ২১ ফেব্রুয়ারি সকালেই গাজিউল হকের সভাপতিত্বে আমতলার সভায় ভাষা সৈনিক আবদুল মতিনের প্রস্তাব অনুসারে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মিছিল শুরু করে। পুলিশ লাঠি চার্জ

করে, কাঁদুনে গ্যাসের সেল ছোঁড়ে। মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এলাকায় গুলিগোল ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়।

পাকিস্তান সরকারের অমানবিক পুলিশের গুলিতে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহাকুমার বাবলা গ্রামের ছেলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ পরীক্ষার্থী আবুল বকরত (১৯২৭-১৯৫২) মারা যায়। ময়মন সিংহ জেলার আব্দুল জব্বার (১৯১৯-১৯৫২) মারা যায়। মানিক গঞ্জ জেলার পারিল গ্রামের সন্তান রফিকউদ্দীন আহমদ (১৯২৬-১৯৫২) মৃত্যুবরণ করে। নোয়াখালির লক্ষীপুর গ্রামের আব্দুস সালাম (১৯২৫-১৯৫২) গুলিবিক্ত হয়ে ৭ এপ্রিলে মৃত্যু হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি শোক মিছিল বের হলে পুলিশ সেখানেও গুলি করে। শফিউর রহমান, হাবিবুর রহমান পুলিশের গুলিতে মারা যায়। আর আব্দুল আওয়াল ও এক অজ্ঞাত বালককে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট করে মেরে ফেলে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে দ্বিভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে বাঙালিকে শোষণ করার নতুন অপচেষ্টা ভেঙে দেয় বাঙালি ছাত্রসমাজ। মহম্মদ আলি জিন্নাহ নিজে উর্দু লিখতে, পড়তে জনতেন না। এমনকি উর্দু ভাষায় ভালোভাবে কথাও বলতে পারতেন না। সে সময়ে প্রোগ্রাম ছিল—‘বাংলা উর্দু ভাই ভাই, উর্দুর পাশে বাংলা চাই।’ জিন্নাহ সাহেব যদি এই প্রস্তাব মেনে নিতেন, তাহলে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হত কিনা—একটা বড় জিজ্ঞাসা থেকে যায়। বাংলা ভাষাই একমাত্র ভাষা, যে ভাষায় তিনটি দেশের (ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা) জাতীয় সঙ্গীত রচিত। রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ তাদের সমস্ত দেশীয় কাজকর্ম তাদের মাতৃভাষায় করে থাকে। জাপান যে আজ বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের এক উচ্চ আসনে সম্যকসীন তার প্রধান কারণ তারা একটি ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাধনকে উন্নত করেছে। দেশের স্বল্প শিক্ষিত মানুষকেও বিজ্ঞানের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গেছি অজান্তেই দিয়ে কাঁপিয়ে পড়েছে বিশ্ব বাজার দখলে। যুদ্ধ করে নয়। যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়েও মানব সম্পদের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারে তারা জয়ী হয়েছে। ভাষাগত দিক থেকে পৃথিবীর অষ্টম স্থানে থেকে জাপান যদি তা পারে পর্যায়শি কোটি আপামর বাঙালির বাংলা চতুর্থ ভাষা স্থানে থেকে তা নিশ্চয়ই পারবে। শুধু জেগে ওঠার অপেক্ষায়।

২০২ ৫৩৩৬

## আদিবাসী রমণী তুমি

প্রতিভা মণ্ডল

### প্রাককথন-১

একদা আমাদের চেনে আমি ওকে চেনার অনেক আগে থেকে। আমার মতোই ৬-৬ নৃতত্ত্বের ছাত্র; আমার চেয়ে বয়সে দশ বছরের এবং নৃতত্ত্বে চার বছরের জুনিয়র। এলিগঞ্জ সার্বশিক্ষণ কলেজে তখন যখন স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষ ‘পাস’ করে বেরিয়ে যাওয়া আমার না-কি কার্যকরার দেখেছি বিভ্রমবি এবং অন্যান্য আরও দু'এক জন অধ্যাপকের ঘরে। এছড়া, তাঁদের কাছে তো বসেই, ওর এক বছর পদবীর ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখেও ‘ভালো ছাত্রী’ হিসাবে আমার প্রশংসা আসত।

### প্রাককথন-২

একদা কথা আমি প্রথম শুনি বিতানের মুখে। এমন থেকে সত্যতো-আঠেয়ে বসে আগে। সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চল শাখায় বিতানের মুখোমুখি বসে। কটি গ্রীষ্মের মোকবিলার মাথার উপর তখন সিলিং ফ্যানের গুন-গুন। তারও মাত্র দশ কুড়ি আগে বিতানের সঙ্গে দূরভাবে পরিচয়। উপলক্ষ, অকশ্যচল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত এক সারসংক্ষেপ। সোপানসংকতি সংকলিত। সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চল শাখার সঙ্গে যৌথ-উদ্যোগে।

অন্যদিকে গবেষণাপত্র পড়ার আমন্ত্রণ জনিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়টির ‘ইউকাল সার্বভৌম বিভাগ। অঞ্জলিদিবকেও। অঞ্জলিদি জিহ্মন ‘ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সার্বেক্ষণ’-এর উচ্চপদের আধিকারিক। আর আমি এশিয়াটিক সোসাইটির দ্বিতীয় দফার ‘জুনিয়র পণ্ডিত’। দু’জনেরই দাবতীয় বরজ আয়োজন করা দেবে জনিয়েছিল। অঞ্জলিদি আর আমি পরস্পরকে পছন্দ করতাম বলে দু’জনে ঠিক করেছিলাম একসাথে যাব। সেইবতো একটি প্রকল্পের সারমর্ম পাঠিয়ে দিয়ে লেখটা তৈরি করছিলাম। কিন্তু, কিছুদিন পর কী কারণে যেন অঞ্জলিদি যাবেন না বললেন। এবং তাই দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, তাহলে আমিও না। ‘ইন্টার লাইন’ প্যারমিটি’ জোগাড়, অচেনা দীর্ঘ পথ একা পাড়ি—স্নাতকোত্তরের উপর এই সব চাপ পোষাতে চাইলাম না।

২০৩ ৫৩৩৬

যদি কোনসেই জাতিতে বিদ্যমান বিশেষ কারণে... দেখাওঁ এতটুকু, মতপক্ষে...

অপেক্ষাকৃত স্তিমিত আবেগে দুপুর ব্যারোমিটারের মতো, এশিয়াটিক সোসাইটির পাঠঘরে কিছু লেখাপড়া বসে, সহ-প্রোগ্রামার তাঁর আনন্দ থেকে মোটে বলাজেন, 'মহীয়া, তোমার ফোন আছে, সাহিত্য একাদেমি থেকে।' শেষে খসড়াটা শুধু আমাকেই নয়, পাঠঘরের আর সব নারীপুরুষকেও— যাদের নবম শতাংশ এশিয়াটিক সোসাইটিরই গবেষক এবং আমার সহকর্মী— চমকিত করেছিল। আমার চমকিত হওয়ার কারণ ছিল। অরুণাচল ইউনিভার্সিটি যখন আমার চামড়া পাঠায়, তখন ওদের চিহ্নিত সাহিত্য একাদেমির 'কোলাবরেশন'-এর উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং, 'সাহিত্য একাদেমি থেকে? আমাকে? কেন?' এই প্রশ্নবাহী ও বিহ্বলকর প্রশ্নটির ভার মাথায় নিয়ে ত্রয়ার ছেঁচে উঠেছিলাম। সহ-প্রোগ্রামারের কী-পাশের কিছু টেবিলটার নামিয়ে রাখা বিশিষ্টাটি তুলে নিয়েছিলাম এক দূর হাতে— 'হ্যাঁলা?'। সারা পত্রিকার জন্ম ছিল বাতাস। ব্যারোমিটারের কৌতুকপূর্ণ কী ব্যাপার তোমার সোজাসুজি আমার দিকে।

ও প্রান্তে পুরুষ স্বর। কল, — 'মহীয়া মাতাম বলছেন?

বিহ্বলতা এবং ভালো-লাগার রসে জ্বরিত আমি পরিচয়ের নিশ্চয়তাপ্রদায়ী স্বরে কৌতুকল ভলে সাজা মিই, "হ্যাঁ, মহীয়া মণ্ডল বলছি—"

ও প্রান্তে কিস্তী, "অরুণাচল মাতাম, আমি বিতান তট্টাচার্য। আচ্ছা, আপনার কি ইউনিভার্সিটির বাণ্ডার টিকিট হয়ে গেছে?"

আমার বিহ্বলতা কাড়ে, চট করে মনে আসে না অরুণাচল ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অবস্থিত। তার ওপর ভ্রমলোকের নাম বিতান শুনে একটি ভালো-লাগা জেরি হয়, কারণ আমার একমাত্র স্নেহের নাম বিতান। নামটি আমিই জেগেছিলাম। একদা অবশ্য, কেবল আমার ব্যক্তিগতের মুহুরেবেই কিনা বলতে পারব না, কোলপাড়ার স্কীলনে আমার কোনো স্থান নেই। অন্য সময় এ কথাটা মনে এলে, হস্ত বা একটি মীথবাস পড়ত। কিন্তু সেই মুহুর্তে তা মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ পেয়ে না। কোণার ইউনিভার্সিটি, কেন ইউনিভার্সিটির গোকার চেঁচায় বলি, "ইউনিভার্সিটি?"

— "হ্যাঁ, আট তারিখে সেমিনার আছে না। অরুণাচল ইউনিভার্সিটিতে? আপনার তো পেপার আছে।"

এবার পাতক হয়। অরুণাচল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণের কথা মনে পড়ে। বলি, "হ্যাঁ, হ্যাঁ! আপনি যাচ্ছেন বুঝি? পেপার পড়বেন? না, আমি যাচ্ছি না।"

"সে কী! আপনি যাচ্ছেন না? না, আমি পেপার পড়ব না। আমি যাচ্ছি সাহিত্য একাদেমির তরফ থেকে টোকপয়সা নিয়ে। সেমিনারটার আমন্ত্রণ, মানে সাহিত্য একাদেমি, কোলাবরেশন করছি। কিন্তু, আপনি যাবেন না কেন? চলুন না মাতাম, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

আমি থাকা বাই। কী অকস্মিক ভাবে 'একসঙ্গে যাওয়া যাবে।' কত কয়স হবে ভ্রমলোকের? স্বরে তো সবসময় বোঝা যায় না— বিশেষ করে পঁচিশ থেকে পদবশ। যদি আমার কাজকাজি ব্যস্তের হয়, তবে তো ভ্রমলোককে মেয়েদের গায়ে পড়া বলতে হবে। এরকম লোকদের সম্পর্কে আমার অ্যালার্জি প্রবল। আমার টপটামিকে একইরকম হীরতায় খারাপ লাগে যখন বেশি কিছু পুরুষ, কোনো কারণে হঠাৎ চিঠি বা দুরতবে আলাপ হয়েছে— তারপর নেহাৎ কমোপলক্ষেই দেখা হওয়ার প্রয়োজন— দেখার পর আমার 'দেখতে খারাপ' প্রবৃত্তি কারণে দৃশ্যতই হতাশ হয়। বোঝা যায়, আমাকে এতটুকু দেখতে খারাপ তারা ভাবতে পারেনি।

আমি বিতানকে বলি— "এ মা, একদা আর কী করে হবে! মাত্র তিন দিন বাকি। ট্রেনের টিকিটও কাটা নেই। এজ্ঞতা, যাবো না বলে পেপারটিকে যে লিখেছিলাম।"

"ট্রেনের টিকিটের জন্য ভাবতে হবে না। ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গিয়ে আপনার। আপনাকে শুধু 'ইনার লাইন পারমিট'-টা করে আনতে হবে। যাবেন?"

"ট্রেন-এর কথা শুনে আমার একটা লোভ হয়। বিজ্ঞান-ব্যবসায় সময় এবং গুরুত্বপূর্ণ দুটোই কম। তার উপর সেই কত বছর আগে শেষ চড়েছি বিজ্ঞানে। এই সুযোগ ছেড়ে দিলে হয়ত আর কখনই চড়া হবে না।

"ট্রেনে আমি কী করে যাবো? অরুণাচল ইউনিভার্সিটি তো আমার ট্রেন-ফেয়ার এসি-টু দেবে বলেছে।"

— "আপনি ট্রেনেই যেতে পারেন। সাহিত্য একাদেমি আপনার ট্রেন-ফেয়ার

দিয়ে দেবে। যাবেন?"

এবার আমি লোভ সামলে বাস্তববাদী হই, "না, এখানেও পারব না, কারণ কিছুটা লেখা থাকলেও পেপারটা আমি তিন দিনে শেষ করতে পারব না। এছাড়া লেখার জন্য তিন দিন সময়ও তো হাতে থাকছে না।" ইনার লাইন পারমিট জেগাড্ড এবং ট্রাভেলের অন্যান্য প্রিপারেশনেই তো চলে যাবে দু'দিন। না, সিটনিবাবু, হবে না।"

— "মাজাম, আপনি গেলে আমার ভালো লাগত। আসলে, আমাদের অফিস থেকে আমি একলা যাচ্ছি তো। একটু ভয় লাগছে, নানা গণ্ডগোল তো লেগেই থাকে নর্থ-স্টেটে। একটু ভেবে দেখুন না? কালকে সকালের মধ্যে ভিসিটন মিলেও হবে। আমি কাল সকাল সোওয়া দশটা নাগাদ ফোন করব। এই নাথারুই পাওয়া যাবে তো আপনাকে?"

কিমানের এতগুলো কথা শেষের পর আমি মেটিমুটি নিশ্চিত হই বিতান আসলে খুবই তরুণ, এবং আমাকে যাত্রাপথের সঙ্গী হিসাবে পেতে চাইছে অনেকটা দীর্ঘির মতো করেই। আমি ওকে বাড়ির ল্যান্ডফোনের নম্বর বলি, জেজা মেবাইল বা চলভাষের চল তখনও হয়নি।

আমার সিদ্ধান্ত পরমনিঃস্বল্প নয়। বিতান একটু হতাশ হয়। কিন্তু জানায়, আমার জন্য সেমিনারের 'বুক অফ অ্যাবস্ট্রাক্টস' এবং উপস্থাপিত প্রবন্ধ-নিবন্ধাদির না প্রতিলিপি পাওয়া যাবে, অন্যবে ও। আমি তিন দিন দশ-বারো পরে সাহিত্য অধ্যয়নমিটে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি।

'বুক অফ অ্যাবস্ট্রাক্টস'-টির লোভে বিতান অক্লান্ত থেকে মেজাজে আরেকদিন পড়ে সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চল কার্যালয়ে যাই। আমার চেহারা এবং লিঙ্গী পোশাককে ও জেজবভাবে নেবে সে সম্পর্কে কিছুটা আশঙ্কা নিয়েই। কেননা, ওই পুরাতনের কয়েকটা কথায় তো একটা মানুষের এতদসংক্রান্ত ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। আশঙ্কটি বুর হয়েছিল ওর টেবিলের সামনে দিগে পড়তে। ওর মুখে খুশি ফুটে উঠেছিল। পরিচয় প্রায় দিতেই মাগেনি যেহেতু কৃৎজনে আপনই জানিয়ে দিয়েছিলাম যাওয়ার কথা এবং সময়।

কেননা, বিতান আমার চেয়ে প্রায় বছর চোদ্দ-পনেরোর জ্যেষ্ঠ। দিগি মুখটার একটা অগাপবিক্ত ভাব। খুব উচ্চ অগায়ে আমার বসতে বলে একজন মেজাজকে

নিদেশ দিয়েছিল চা আনার। ওর গরম, ওর উচ্চ হাসি-মুখ আমার হৃদয় দেওয়ায় চা এ সম্ভ্রতি দিয়ে আমি ওর সঙ্গে আধ ঘণ্টা গল্প করেছিলাম। তখনই অপজপত্রগুলো দেওয়া এবং সেমিনারের কিছু গল্পের সূত্রে বিতান তরুণের কথা বলে। তরুণ না কি আমার খুব প্রশংসা করেছে নৃত্যের এক 'জিগার্ট' জুজী হিসাবে। বলা বাচ্চ্য, শুনে আমি বেশ উৎসুক বোধ করেছিলাম।

### কথন-১: পরিচয়

উক্ত ঘটনার প্রায় দশ বছর পর তরুণের সঙ্গে আলাপ হয়। আর এক সেমিনার উপলক্ষেই। পৌজ্জিটি বিশ্ববিদ্যালয় তরুণের উদ্যোগে ন্যাশনাল ফোকলোর এসোসিয়েশন, সংক্ষেপে, এনএফএ-র ২১তম বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন করে। সংগঠনটির তৎকালীন অন্যতম কর্তাব্যক্তি অধ্যাপক চৌধুরীর যোগাযোগে অধিবেশনটিতে অংশগ্রহণ করি। অধিবেশনের উদ্বোধনী সভায়, উদ্বোধনের আগে, অধ্যাপক চৌধুরী তরুণের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে গেলে তরুণ, তখন বছর তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ, উজ্জলিত হয়, 'মণীবাদিকে আমি চিনি স্যার।' তারপর আমার লিকে দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞাস করে, 'কেনন আছেন মণীবাদি?' প্রত্যুত্তরে আমার হাসিমুখে 'হ্যাঁ, ভালো।' বলা শেষ হতে না-হতেই তরুণকে ঘিরে দাক্তা নানা বয়সের ছ-সাত জন নারী-পুরুষ ওর লিকে নানা জিজ্ঞাসা ছুঁতে দেয়। কোন্না বয়, তাদের কেউ কেউ ওর ছাত্র-ছাত্রী, আবার কেউ কেউ আমার মতো অন্য রাজ্য থেকে আসা সারস্বত-চাক্রে অংশগ্রহী। তরুণ আর কী করে! আমার লিকে তাকিয়ে 'আচ্ছ, মণীবাদি! থাকছেন তো, পরে কথা হবে' বলে সেই দললের জিজ্ঞাসার উত্তর-প্রত্যুত্তরে ভুব-সাঁতার দিগে এগিয়ে যায় সত্বর লিকে।

ওরপক্ষে দেখার পর আমি বুঝতে পারি, আমি ওকে আগে কখনও খোঁজ করিনি। পাঁচ ফুট চারের মতো লম্বা। চাঁপাখুল-হক, শরীর ইকৎ পৃথুল। মাথার চোঁড় চুল অ-ঘন। ডিম্বাকর মুখাবরণে খাঁই কক-চোঁড়-চিবুক-কপাল এবং কৃৎকৃৎ কালো ঘন গোঁফ-দাড়ি। অধ্যাপক চৌধুরীর কাছে জানলাম তরুণ 'ইজার' পদে আছে, এবং আপাতত বিভাগীয় প্রধান। এছেন তরুণ বিতানের কাছে আমার প্রশংসা করেছিল শ্রবণ করে, এবং ওর উচ্চ ব্যবহার দেখে আমার সচরাক্তর ভাবপ্রবণ-পাক মনটা হাল্কা লাগছিল। অবশ্য, ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ-সামনি পরিচয়ের আগে আমার চেহারা নিয়ে ওর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে আমার কোনও শঙ্কা

ছিল না। কারণ, আমার আগেই তো আমি জানতাম যে, আমি ওকে না টিনলেও, ও আমাকে চেনে—ওধু ওনেই নয়, দেখেও।

সেমিনারের তিনদিন কেটেছিল বেশ ভারহীন মনে। তবে অধিবেশনটির প্রাণীয় সম্পাদক হিসাবে তরুণ সবসময়েই এতো ব্যস্ত ছিল যে ওর সঙ্গে কখনই দু-এক মিনিটের বেশি কথা বল্য যায়নি। হয়ত যেতো, যদি প্রাক-নৈশাহার মন্দির আড্ডায়— যা পুরুষ-প্রাণিত— যোগ দিতাম।

অধিবেশনটি চলাকালীন আমি এনএফএ-র সভ্য হয়ে গিয়েছিলাম। সভাপদের আরেকদশপাঠে প্রস্তাবকের স্থানে স্বাক্ষর করেছিলেন অধ্যাপক চৌধুরী, আর তরুণ করেছিল সমর্থকের স্থানে। এরপর প্রাথমিকভাবেই তরুণের সঙ্গে দু-এক বছর অন্তর— যেহেতু নানা কারণে সকল অধিবেশনেই যোগ দিতে পারিনি— সামান্যসামান্য সাফাফ প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়ে, এবং আমার গরজে আমার দিক থেকে একাধিকবার দুর্যোগপাও চলতে থাকে।

#### কথন-২: বন্ধুত্ব-১

পরিচয়-পরবর্তী চার বছরের মাঝায় তরুণের সঙ্গে আমার কিছুটা বন্ধুত্ব হতে শুরু করল। আসামের ডিমাসা জনজাতির ওপর আমি একটা প্রকল্প-অনুদান পাওয়ার পর। দীর্ঘ কয়েক বছর সম্পূর্ণ রোজগারহীন দুর্বিপাকের শেষে অনুদানটা পেয়েছিলাম এক সহস্র মানুকের সহায়তায়। ডিমাসা-এলাকায় ক্ষেত্রকর্মের জন্য ব্যতায়িত করেছিলাম ট্রেনে, গৌহাটি ছুঁয়ে।

তো প্রথমবার ক্ষেত্রকর্ম করে ফেরার সময় গৌহাটিতে যেহেতু একদিন থাকব, মনে হল, তরুণকে দেখা করতে গিয়ে তখন হয়ত অবশ্যই সংশর একটা ছিল যে, তারই বেকার-বাকল মণীষানিত্য আজ কি এতোটা পাত্র দেবে ও? বিশেষত, পরবর্তী চার বছরে পদোন্নতি হয়ে ও যেহেতু এখন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এসোসিয়েট প্রফেসর'। কিন্তু হফলড থেকে আমার ফোন পেয়ে এবং অনেকদিন পর একটা অনুদান পেয়েছি শুনে ও খুশি হয়ে জনাল কাকের শেষে সংস্কার আমার স্ট্রেটেলে আসবে। গৌহাটিতে পৌছে আমি ফেন স্ট্রেটেলের নাম এবং ঘর নম্বরটা জানিয়ে দিই।

স্ট্রেটেলে এসে, একথা-সেকথার পর তরুণ আমার খবর দিয়েছিল যে, মাস

তিনেক পরে 'নেশ'-র অর্থাৎ নর্থ-ইস্ট ছিল ইউনিভার্সিটির লোকসংস্কৃতি বিভাগে লোকসংস্কৃতির নামী আন্তর্জাতিক সংগঠন 'অসিলাস-এফএনআর'-এর ইন্টার-কংগ্রেস হবে। পরামর্শ দিয়েছিল প্রয়োজনে আমি ফেন নিজের খরচেই এই ইন্টার-কংগ্রেস-এ যোগ দিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করি। বলেছিল, 'মণীষানি, তুমি এতো ব্রিলিয়ান্ট, এতো সিনসিয়ার। দেখো, একদিন না একদিন ঠিক স্বীকৃতি পাবে।' আমি চমকিত হই আমার মরচে-পড়া অতীত খ্যাতিগুলিকে তরুণ এখনও অতোটা মূল্য দেয় দেখে।

#### কথন-৩: বন্ধুত্ব-২

এক বছর কাটে। এর মধ্যে আরও দুবার ফিল্ড থেকে ফেরার সময় গৌহাটির কোনো না কোনো হোটেলের ট্রেস্ট্রেণ্টে ককিসহ তরুণের সঙ্গে ঘণ্টা খানেক করে গল্প হয়। দ্বিতীয় আড্ডাতে ওর সদা প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই-এর একটা কপি উপহার দেওয়ার জন্যে পারি তরুণ কবিতা লেখে। অসমিয়া ভাষায়। আর, সেই সঙ্গে জানি ও 'আডিউট', সুরায়। নেশা ছাড়তে মেডিক্যাল লীড নিয়ে লৌড়তে হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের এক নেশা-দুর্নীতিকরণ কেন্দ্রে— মাস ছয়েক আগে। তারপর মাস দু-তিনের মতো এককম শ্রোয়নি। কিন্তু আবার গত দু-মাস ...

ওর বইটা থেকে কয়েকটা কবিতা পড়ে গুলিয়েছিল তরুণ। যেহেতু অসমিয়া ভাষায় লেখা, তাই কয়েক ছর করে পড়ার পর ও বাংলায় আমার অনুবাদ করে পুঁকিয়ে দিয়েছিল। কবিতা সম্পর্কে আমার অতি কম-চর্চিত জ্ঞানে সেগুলিকে আমার মন্দ মনে হয়নি।

#### কথন-৪: বন্ধুত্ব - ৩

৩' সাত মাস বাদে আমি গুৱাহাটী, সরকারি অতিথিশালায়। কয়েকটা ডিমাসা গ্রামে আমার চতুর্থ নম্বর ক্ষেত্রকর্মের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার মুখে। আর তিন-চার দিনে এই শহরের কৃত্যগুণের সেরা গৌহাটি নিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরব। রাত পৌনে-নটা নাগদ তরুণকে অধিবেশনিকায় সে-কথা। উত্তরে তরুণ জনাল আমার গৌহাটি পৌছনার দ্বি ও থাকবে না— একটা পিএইচডি'র 'ভাইবা' নিতে মল্লিপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ও 'প্রফেসর' পদে উন্নীত।

তরুণের সঙ্গে কথা শেষ হলে হাত দিয়েছিলাম বিদ্যনাটা শরনযোগ্য করায়।

সারাদিনে তার ওপর জড়ো হয়েছিল রাজ্যের জিনিস— বাইরে বেত্রানোর পোশাক, ক্যামেরা, কণ্ঠস্বরের ফাইল, নতুন-কেম বা ফিল্মে সদা-পরিচিত ক্যারের খোঁজ ধর করে আনা কই, পেন-পেন্সিলের আধার, মোবাইল চার্জার, ই— কি যে নয়! একে একে সেগুলো টেবিলে, স্টুটকেসে বা ওয়ারড্রোবে তুলেছিলাম। মিনিট পরেও কেটেছিল তরুণের সঙ্গে আলাপ শেষ করার পর, এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠল। দেখলাম 'তরুণ'। সাড়া দিলাম, 'হ্যাঁ তরুণ, বলো।'

তরুণ বলল, "মণীষাদি, তোমায় নিয়ে এই মাত্র একটা কবিতা লিখলাম।" আমি যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত। বললাম, "কবিতা? আমার নিয়ে!"

তরুণ আমার বিস্মিত-খুশি টের-পাওয়া করে বলল, "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তোমার নিয়ে। অসমিয়া ভাষায়। আমি পড়ছি, শোনো। দু-একটা শব্দ ছাড়া বুকতে অসমিয়ে হবে না।"

তরুণ পড়ল। আমি শুনলাম। জেটো গদ্য কবিতা। বায়ো-চোল লাইনের। সবটা যে ঠিক মতো শুনতে পেলাম এমনটা নয়। আবার, যেটুকুও শুনতে পেলাম তা-ও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি বেশ কয়েকটা অসমিয়া শব্দের অর্থ একেবারেই বুঝতে না পারায়। তরুণ অবশ্য মানে বলে দিচ্ছিল একটা-দেড়টা করে ছত্র পড়ার পর। কিন্তু, তাতে কী আর কবিতার কবিতার বুঝে ওঠা যায়। অন্যদিকে, পুনরাবৃত্তি করতে করতেও সংকোচ হলো যেহেতু কবিতাটা আমাকে নিয়ে। সারমর্মটা অবশ্য বোকাই পেল। কোনো ইঙ্গিতধর্মিতা নেই তার মধ্যে। একেবারে 'পষ্ট উচ্চারণে আমার সংগ্রামের কঠোর জীবনের প্রতি এক সজ্জাযুক্ত স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। এ-তো-টাই শ্রদ্ধা যে আমাকে মহাশ্বেতাদেবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে! ভাবা যায়। যে মহাশ্বেতাদেবী, একসময় দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন আমার অন্যতম এক ব্যক্তি-আদর্শ— একাধারে সমাজ-কর্মী এবং লেখিকা। সত্তর দশকে করতে লাগত্যা বিপ্লব-প্রচেষ্টায় নিজের বাস্তবিত্তি বুঝে কান্দি দেওয়ার পর বখন 'অরণ্যের অধিকার', 'জঙ্গল চুরাশির মা' এবং 'মৈকর্মে মেঘ' পড়ছিলাম, তখনই মহাশ্বেতাদেবীকে আমার জীবনাদর্শে বসিয়েছিলাম। তারপর অবশ্য কেটে গেছে প্রায় পঁচত্রিশটা বছর। 'বিপ্লব' ও অন্যান্য অ-সাংসারিক প্রচেষ্টায় বেশ কিছু বছর ব্যয় করে একটু বেশি বছরসেই এম.এ-টা পাশ করেছিলাম। এবং এরপর, অজিল সু-দীর্ঘ বেকার জীবনের বয়সও হতে চলল সাতাশ-আঠাশ। অতীত বিপ্লব-প্রচেষ্টার করুণ

পার্থক্য মতেই অতীতের সব স্বপ্নের নিষ্ঠুর জলজালি ঘটিছে। অতএব, ...

অতএব, অরুণ ফলম, তরুণ কী করে জানল আমার এই প্রতীত অবস্থার কথা? তরুণের সঙ্গে তো আমার ছবি-বাওয়া স্বপ্নের ব্যাপারে কখনও কোনো কথা হয়নি। তবু, এত সুনিশ্চয়ভাবে তরুণ জানে আমার। এবং মনে রাখো! তাহাি কৃতজ্ঞতার আশ্রিত হই। আর অনুভব করি, এর পর আর বরফার নেই কবিতার প্রতিটি শব্দ শুনতে পাওয়ার বা প্রতিটা শব্দের অর্থ জানার।

আমি তরুণকে হৃদয়ের গভীরতম তল থেকে মনে মনে কন্যাবাদ জানাই, এবং তার প্রতি আমার শ্রেয়বোধ এক দমকে অনেকটা বেড়ে যায়। অতঃপর, হাফল্ডের মেম্বশপের শীতেও আধার মধ্যে বাক্যের শিউলি করা সঙ্গীত নিয়ে দুপুরে সবার ঠাক দুটা পুজ কখনের নীচে।

#### কখন-ও: আশার ছলন

এ ঘটনার কয়েক মাস পর পঞ্চম-সপ্তমর ক্ষেত্রকমে আমি 'নয়া কাছাড় ফিল্ম ডিস্ট্রিক্ট'-এ যাই। বাইশ বা তেইশ দিনের মাথায়, হাফল্ড শহর থেকে সাতগো-আঠারো কিলোমিটার দূরের এক গ্রামে কাজ করছিলাম। দিনটা ছিল শুক্রবার। পরের সোমবারই হাফল্ডে ফেরার কথা। সেখানে আরও দ্বি তিনেক থেকে পৌছাটি হয়ে ঘরে ফেরার ট্রেন ধরব। তরুণের সঙ্গে দেখা হবে না এবার, তরুণকে এমন করে জেনেছিলাম দু-তিন দিন আগে। ও সেই সময় রাঁচি হয়ে মুম্বই যাবে।

বিক্রম তখন চারটে/সাতটে চারটে। আমি এক স্থানীয় লোকস্বীকে সঙ্গে নিয়ে কথা সাংগ্রহ করছিলাম এক ডিমাসা পরিবারের উত্তোনে বসে। হঠাৎ-ই তরুণের অপ্রত্যাশিত দূর-ডাক বেজে এবং ভেসে ওঠে আমার মোবাইলে। আমি গুলি হয়ে পাড়া দিতে ও আমাকে মুম্বই-স্থিত নাম করা এক ইনস্টিটিউটের একটা ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে বলে। মিনিয়র ফেলোশিপ। বয়স-সীমা নেই। আবেদনের শেষ দিন পরের সোমবার। অর্থাৎ, রবিবার ধরে হাতে মাত্র ষাড়্টি দিন। বলাগ, আমি যেম সেদিনই বা পরের দিন কোনো সন্ধ্যার কাফেতে গিয়ে ইনস্টিটিউটের ভ্যাবেসাইটি থেকে আবেদন-পত্রটা ডাউনলোড করে নিই, এবং পরের দিন বা, খুব দেরি হলে, সোমবারের মধ্যে একটা 'প্রজেক্ট প্রপোজাল' সহ আবেদনটি ই-মেলে পাঠিয়ে দিই। ও ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকবে।

আমি সন্দেহ হতে পারি না এমন প্রস্তাবে। তরুণকে জানাই আমার অধ্যবসায়

একাধিক কারণে যেমন, এমনি এই এক দুদিনের মধ্যে প্রচেষ্টা ভেঙে পেলো। নিজে কেন্দ্রে পারি না আমি। তার উপর সিংহভারের মধ্যে বোঝা নষ্ট। আমি আরও বলতে বাচ্চিলাম যে, তাতে সিংহভারটি মার খায়, এবং সাহসি প্রকল্পটির প্রতিও হানিকার করা হয়। তাতে শেষ বিধানে আমার নিজস্বই ক্ষতি করা হয় কারণ আগের কাজ ভালো না হলে, নতুন প্রকল্প-অনুদান পাওয়া কঠিনতর।

কিন্তু, তরুণ আমায় দুঃখপাতি দেয় না এতোটা বলার। কুমির স্বপ্নে বলে, “তুমি গ্রামে পড়ে থেকে এমন যা টাকা পাচ্ছ এটিতে তার বিক্রয় পাবে। আর, এটা অব্যাহত করতেই কুমি-আমি মিলে এমন একটা প্রজেক্ট করব যে, কুমি পুতলাক হয়ে যাবে।”

তরুণের শেষ উচ্চারণ আমায় ব্যাশরায়ী করে। আমি সোহী হই। বাঙালী-  
বেড়াল-প্রগলের লাথি আর কখনও যেতে যেতে টিপে চলা প্রিয় জীবন থেকে  
মুক্তি পাওয়ার এই সুযোগ হার-জড়া করতে ইচ্ছে করে না। কেই না ছাড়ব।  
ভালো অনুমানের প্রচেষ্টা পেলো, অন্য 'বেড়ালের' হয়ে গেলো, এই আড়াই-দশক  
ধরে আট্টে-পুটে বোধে কথা অর্থ-দুশ্চিন্তা থেকে তো মুক্তি পাব। আর, অর্থ-  
দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেলো নতুন কাজ, অসমাপ্ত পুরনো কাজ সবই ভালোভাবে,  
মনোমোহোভাবে করতে পারব। তবে, দিই না কেন বর্তমান কাজে কিচ্ছিন্ন ছিলো।

ওকে বলি, "কিন্তু, প্রাণোন্মত্তা মুদ্রিন তাঁড়ালে লিখব: আমি যে "

এবারও তরুণ আমার কথা শেষ করতে পার না বলে, "তুমি কর্মী! তুমি ফিল্ম-আপ কলর রাই। আমি সোমবার জেনে তোমার প্রপোজারের ডিসক্লেমার নিয়ে দাবো। দুপুর বাতরাই নগাদ ফোন কোরো। আমি তখন খাঁচী কটকটিকিগিতে একটা মিষ্টি-এ পাখর। খণ্ডী দুপুরের মিষ্টি। হাঙ্গর ওখন থেকে বেরিয়ে আমি দুখহিলের ফোন করো।"

আমি বিশ্বস্ত প্রকাশ না করে পানি না "ভূমি" ফোনে একটি প্রত্যক্ষ  
প্রপোজানের ডিস্ক্রিমিনেটর নেবন মিটিং-এর মাধ্যমে।

তরল বলে, "গ্যা! কতক্ষণ ছাত্র লাগবে? মিনিটি দশেক।"

তরুণের এমন আত্মবিশ্বাসের স্বরেও আমি কিছু দাশত্ব হতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, “কী বিষয়ের উপর প্রয়োজন নেই যেহেতু পারে বলে তোমার মনে হয়?”

(ભાથિ, આમિ યદ્દાગિ ખાલિ યદિદુદ્દા રાણિ.)

অক্লান্ত দু-একটা বিষয়ের ইচ্ছিত দেয়।

অতঃপর, বৈদিনি দল্লোটা তরুণের ইঙ্গিতমতো একটি প্রকল্প ভাবতে এবং লিখতে শুরু করি। ক্ষেত্রকাক খামিয়ে। মাক রাতে ঘুমের মধ্যে লোভশেড়ি হয়, এবং পরের দিন বিবেল পর্যন্ত গড়ায়। খবর পাই, হাফল্ড শহুরেও একই গোপার - যে তিন-চারটি সাইবার কাকের ঠেক আমি জানতাম, সবই বন্ধ। আর এবিএর, গন্ধেরের অস্তাবে সেগুলির ত্রেন পরক থাকে না খোলার। অতএব, সোমবারের আগে আবলেনপত্র ডাউনলোড করার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

নিকপায় আমি শনিবার-রবিবার 'বড়লেখক' হওয়ার গুম পায়ে-মাথায টাই-টুথুর মধ্যে প্রায় আঠার মতো লেগে থাকি নেটপ্যাডে প্রকল্পটা লেখার, এবং শেষমেশ দু'পাতার মধ্যে একটি মনোমত ছেঁকরা সিঁহি। মনটা বেশ ক্লান্তির লাগে এই প্রথম মতো। কুম নমসে এবং এতো ছোটো আচড়ানে লিখে উঠতে পারায়।

সোমবার গ্রামটির পাট চুকিয়ে হালপাড়ে ফিরি। অতিথি-নিবাসে বাস্তব-পাঁচটা নামিয়েই দেড়ে যাই এক সাইবার কক্ষেতে। শুভলের দরজা দিয়ে তরুণের বলা ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইটে চুকি। 'রিকুটমেন্ট'-এ যাই। তরুণ-কবিতা ফেলোশিপটির দরজা 'ক্রোজড' দেখি। কয়েক মুহূর্ত মাথা জুড়ে আঁধার নামে। পরিচিত আঁধার, দেড়শকের ওপর বার সঙ্গে আমার বন্ধব্বের মোলাকাৎ। আমার বেঁচে থাকার অবস্থা হচ্ছে দিয়ে বার বারই বার সফল মোকাবেলা করি শেষমেস, এনা আলো বুজে পাই। এবারও পেলোম। প্রেমিক অনুযায়ী মুক্তি বুজে খানপাম— নিশ্চরই সেট-সার্কিং-এ ফোনে ভুল করছি। বুকের ভেতর আশা-নিবাসের বুক নিয়ে আপেক্ষা করি বাড়ির কীটা ব্যক্তিগত ছোটখাট। তরুণের নম্বরে টোকা দিই কচির কচির ব্যক্তিগত। 'রিং' হ্যা বার দুইয়ক, কিন্তু, তারপরই ভেসে আসে 'এনপেরড' শব্দ-সংকেত। বুকের ভেতর আশা-নিবাসে দুখুয়ার। পাট ফিটিং পণ্য-সংকেত নামের আবার কথা বাড়ি। উজ্জর, 'অনরিচেল'। নিরলম্বিত্ব আরও দশ নির্মিত পর, লাভ-লক্ষ্যের মাথা খেয়ে, শেষবার চেষ্টা করি। উজ্জর, 'সুইচড-অফ'। এতৎপর 'সুইচড-অফ' হর আমার সব-সংকেত। কম্পিউটারের পর্দায় চোখ-রাখা আমি কিছুই দেখতে পাই না। হাত-পা অবশ্য হয়। আমি বসে থাকি আরও এক ঘণ্টা। তরুণের মোবাইল থেকে কোনো সংকেত আসে না।

কথন-৬: টিপসটাইন-১

মাস ছাড়া কাটা। এর মধ্যে না তরুণ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, না আমি। অপাতত যষ্ঠ ও শেষদফার ক্ষেত্রকর্ম শেষ করে হফেন্স-এর একদিন পরে গৌহাটি ফিরব। স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে তরুণের কথা। দীর্ঘ বিদায় ফোনটা করেই ফেলি। তরুণ সাড়া দিয়ে জানায় ও দাঁড়িয়ে, এক টাকি করে দ্রুত বিমানবন্দর-দুখী। ওখান থেকে যিম্মলাভে যাবে একটা আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার যোগ দিতে। উপরোক্ত ঘটনার কোনো উল্লেখ করে না। আমি এখনও প্রত্যক্ষ জানিয়ে 'পরে কথা হবে' বলি।

আরও ষাট মাস পর আমি শিলং যাই। আমার তৎকালীন প্রজেক্টের প্রয়োজনেই। গমনের মতোই প্রত্যাগমনেও সেই গৌহাটি ছুঁতে হবে। কাল শিলং ছাড়ার দুদিন আগে আমি যথার্থ্যি তরুণের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কতকই হয়। সেমন সম্ভাষণ-অসম্ভাষণ আরও দু'এক জায়গায় করে যাচ্ছিলাম। যদি কোনো নতুন অনুদানের যোগাযোগ বা নিম্নপক্ষে স্বপ্ন পাওয়া যায়। কারণ এ প্রকল্পের আয় তখন আর এক মাস মাত্র। তারপর যে অনিশ্চিতের মধ্যে আবার পড়তে পারি সে কথা ভাবলেই পরিচিত কিন্তু ভীতিপ্রদ আঁধারটা গ্রাস করছিল পরো মর্ত্যে।

তরুণ ক'বুশি হয় আমার কোন পেরে। এদিক-সেদিক দু'একটা কণার পর আমি কিছুটা মজার সুরে অনুযোগটা করি, "মুখইয়ের সেক্সোশিপটা আশ্রয়ি করতে বলে পরে আর যোগাযোগই করলে না?"

অনুভূতি প্রকাশ নয়, ক'বুশি খানিক পাগল-অনুযোগের সুরে তরুণ বলে, "তুমি জানো, সেদিন আমার কী হয়েছিল? আমি অজান হয়ে গিয়েছিলাম। জানই তো আমার একটা সন্দেহ আছে। আমাকে হেনপটিনাইজড করতে হয়েছিল।"

এরপর আমার "কেন, কী হয়েছিল?" ইত্যাদি প্রশ্ন এবং এর তরক থেকে উৎসাহিত উত্তর সমাপ্ত্যন্তে ঠিক হয়, আমি গৌহাটি পৌছলে ও আমার হোটেলে যাবো। ইচ্ছা করে ওর দ্বিতীয় কবিতার হালি সেরাও আমার মস্তককে সেকা কবিতাটা আছে।

পরদিন দুপুর একটা নাগাদ আমার চলভাস বেজে উঠলে দেখি, তরুণ। বলে, পরের দিন গৌহাটি পৌছে দুপুর একটা নাগাদ আমি কেন জানাঘর সেটা 'রেডি' থাকি। ওর গাড়ি-চালক এসে আমার ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে

আদিবাসী রমণী তুমি

তরুণ আমাকে নিয়ে যাবে এক কার্ভি মানুষের ভেজ-বাগান দেখতে। শহর থেকে পনেরো কিলো মিটার দূরে।

পরদিন তরুণের অসমিয়া গাড়িচালক আমার হোটলে এসে আমাকে তরুণের ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যায়। এবং যতটা সাপমটিভাবে বইনি পাওয়ার কথা ছিল— অর্থাৎ গৌহাটিতে আমার হোটেলের রেস্টুরেন্টে তরুণের সঙ্গে এক-দু পেয়ালা কফি খেতে খেতে পাওয়া— তার চেয়ে কিছুটা উজ্জ্বল আয়োজনে পাই। ডিপার্টমেন্টের সামনের লানে কয়েকটা চেয়ার পাতি হয় গোল করে। তরুণ আর আমি ছাড়াও সেইসব চেয়ারে বসে ওর এক সিনিয়র সহকর্মী, তিনজন ছাত্রী— সবাই অসমিয়া, এবং দু'জন ছাত্র— একজন অসমিয়া, একজন নাগা। একজন বেয়ারা, এবং গাড়ি-চালকটি— দু'জনেই অসমিয়া— দাঁড়িয়ে থাকে, চেয়ারের অভাবের দরুন না কি শ্রেণী-বিভাজনপত দূরত্বের কারণে তাঁ বসতে পারি না। বস্তুত, এরকম কথা সেই মনোরম মুহুর্তে মনেও আসেনি আমার।

প্রথম বসন্তের বিকেল। সামনের ছোটো ঘাস-জমিতে একটা জবা, একটা মুসিতা, কিছু পাতা-বাহুর। বিরবিরে হাওয়ায় তারা হেলদোলহীন, কিন্তু আমাদের কারোর-কারোর চুল কিছুটা অবিন্যস্ত।

লানে বসার আগেই তরুণ ওর সহকর্মী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ইংরিজিতে। গলে বসার পর আর একটু বিশদ করল। এবার, অসমিয়া ভাষায়। 'নকশাল-আন্দোলন' শব্দটা কানে এলো। কানে এলো 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি' শব্দটাও।

পরিচয়প্রদান পর্ব সাদৃশ্য হবার পর তরুণ কবিতাটা পড়ল। 'মহাশ্বেতাদেবী' নামটা ছাড়া এবার আর একটি শব্দ আমার কানে এলো— 'সীওতাল'। ভাবলাম, মহাশ্বেতাদেবীর কর্মপ্রসঙ্গ। পাঠ শেষে বইটা আমাকে ও উপহার দিলে উপহিত অন্যদের হাত-তালি। আমি মুগ্ধ। তরুণের প্রতি উপচে ওঠে কৃতজ্ঞতা।

আরও আধ ঘণ্টা পর দুটো গাড়িতে করে রওনা হয়ে আমরা পৌছলাম ভেজ-বাগানটিতে। কামাখ্যা-সংলগ্ন বিশাল ও বিস্তার্ত জলাভূমির গা-ছোঁয়া টিলার উপর। এক নয়নমোহন দৃশ্য। বাগান দেখে বাগান-মালিকের বাড়িতে অতঃপর ওদের সকলের মন্দির এবং আমার চা পান।

রাত সাড়ে নটার তরুণ আমার হোটলে নামিয়ে দেয়। আমি স্নান ও স্নেহসর

সেরে বিছনায় উঠি। বলিবে ঠেস, কাঁধ পর্যন্ত কঁদল মুড়ি, হতে তুলে নিই  
তরুণের দ্বিতীয় কবিতার বই। একটা শান্ত-মনোরম ভালো লাগা নিয়ে পড়তে  
থাকি আমায় নিয়ে লেখা কবিতাটা। দু-একটা শব্দ বাদে সবটাই বুঝতে পারি ধীর  
মনোযোগী পাঠে। বাংলা অনুবাদে কবিতাটা এরকম:

সংগ্রামী নারী তুমি এক

জীবন-জরুরিতা

দিন, তোমাকে মনে হয় মহাশ্বেতাদেবীর মতো।

সীওতাল রমণী তুমি, প্রভাতী যৌবনে

রাষ্ট্রদ্রোহের পথ ছেড়ে এসেছিলে ফিরে

বিদ্যাচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে, পড়েছিলে নৃতত্ত্ব

হয়েছিল প্রেম এক, পরিণয়ও

কিন্তু, কে না জানে সে বিবাহ টেকার নয়? অতএব

বিবাহ-প্রায় বিচ্ছেদ ক'বছর পর—

এখন, দু-হাজার বারোয়, হাবলায় হুদের তীরে

রয়েছে মথ ক্ষেত্রসমীক্ষায়

তুমি ভালোবাস কাজ

সীওতাল রমণী তুমি, সহজে মানো না হার

মণীষাদি, তোমাকে আমার

হাজার হাজার নমস্কার।

আমি নতুন এক চমকে চমকিত হই। বছর দেড়েক আগের মতোই, যখন ওর  
কবিতার মহাশ্বেতাদেবীর সঙ্গে আমার তুলনা প্রথম গুনি। কিন্তু আজ বিপত্তীপে—  
আমাকে ও 'সীওতাল রমণী' বলেছে দেখে। আমায় গ্রাস করে 'আমায় দেখতে  
গরাপ' সংক্রান্ত ছোটোবেলা থেকে পুঞ্জীভূত যাবতীয় অভিজ্ঞতার বিবাদ-মিথস।  
না, তরুণও? নৃতত্ত্ববিদ তরুণও আমার চেহারা দেখে আমায় সীওতাল ধরে  
নেয়েছে? একজন নৃতত্ত্ববিদ হয়েও তরুণ জানে না যে মণ্ডল পদবী কোনো  
সীওতাল মানুষের হয় না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, না জানা তো দোষের কিছু  
না। বিশেষত ওর জন্ম যোহেতু আসামে এবং মাঝখানে দু-বছর মাত্র কলকাতা  
নিখাদ্যালয়ের পড়া-বদ দিয়ে সব জীকটো আসামেই যাপন। আমিও কি মাত্র

তিনটে বা চারটে জনজাতির বাইরে অন্য কোনো জনজাতির পদবীপুঞ্জ সম্পর্কে  
সম্পূর্ণ অজ্ঞ নই? অথচ, সারা ভারতবর্ষে জনজাতি-গোষ্ঠীগুলির সংখ্যা প্রায়  
চারশো আঠেরো। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হিসাবে আমি যেমন সীওতাল, মুন্ডা,  
ওরাওদের পদবী সম্পর্কে কিছু ধারণা পোষণ করি, তেমনি আসামের আজম  
বাসিন্দা হিসাবে তরুণ হুদ্র জানে কারবি, ডিমাঙ্গা, গারো, খাসিদের পদবী।

এভাবে, তরুণের অজ্ঞতার সমর্থনে যুক্তি খুঁজে গেলেও, একটা গভীর বিবাদ  
তবু পৌঁছা তুলো হয়ে মাথা জুড়ে তেমে বেড়ায়। সারাদিনের অবিশ্রান্ত ঘোরার  
ধকলও দীর্ঘক্ষণ ব্যর্থ হয় ঘুম এনে দিতে। অবশেষে, একসময়...

কখন-ও: উদঘাটন-৫

সকালে ঘুম ভেঙেই মনে পড়ে যায় 'সীওতাল রমণী তুমি'। কিন্তু ঘুমের গুঞ্জায়  
আমি সেই শব্দবন্ধের মধ্যে আলো দেখতে পাই। প্রভাতের আলো। কোমল,  
মনোরম। পৌছে বাই সত্যো— আমিই সে। না, সংস্কৃত 'সো অহম্'— আমিই  
ঈশ্বর— রাষ্ট্রদ্রোহায় উদ্ধৃত ও লালিত এক কল্পিত সর্বশক্তিমান সত্ত্বার সঙ্গে অভেদ-  
বোধ নয়। এ বোধ তার ঠিক বিপরীত। এ বোধ মানবসমাজের বাস্তবিক দুর্কলতম  
অংশ— চতুর্ধ-দুনিয়ার নারী— দলিততর নারীর সঙ্গে অভেদ-বোধ। প্রকৃত অর্থে  
যে নারীর দুনিয়া পঞ্চম-দুনিয়া। হিন্দুসমাজের 'জলচল' অংশের দলিত নারী আমি  
চেহারা অসংকর অষ্টালয়েত 'আদিবাসী'। আজম আসাম-প্রবাসী বাঙালি  
তরুণের চোখ সেটাই দেখেছে যা অ-কৃষ্ণ, অশ্যাম উচ্চবর্ণীয় উচ্চবর্ণীয়রা সচরাচর  
দেখে। আমি সীওতাল, আমি মুন্ডা, আমি বীরহোর এক নারী। আমি পূর্ব-মধ্য-  
দক্ষিণ ভারতজোড়া আদিবাসী নারীর এক অবয়ব-প্রতিচ্ছবি।

এমতো উদঘাটনে আমার চেহারা কাছের আমি কৃতজ্ঞ হই এই প্রথমবার।  
জীবনের অনেকটা পথ 'দেখতে খারাপ'-এর যন্ত্রণা— 'পরশে প্রেম যদি দিলে,  
রূপ কেন নাহি দিলে বিধি হের স্তর পার হই। এবং, এই আলোকিত বোধে আমার  
চোখে পড়ে বইটায় কবিতার স্থান। দুটি ভাগে বিভক্ত বইটির দ্বিতীয় ভাগের  
প্রথম কবিতা সেটা। না, থাকের কোনো জায়গায় কোনোভাবেই স্থান দেওয়া নয়।  
স্থান দেওয়া দ্বিতীয় ভাগের একেবারে শুরুতে। আমি আশ্রুত হই। আমার বিবাদ  
বাস্পীভূত হয়। পরিবর্তে, তরুণের প্রতি কৃতজ্ঞতার ইলশে-ওড়ি করে মাথার  
ভিতর।

# কালোর মার গৃহ-প্রবেশ

দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস

— দাদা, কইল আমার গেরো পোরবেশ। আপনাদের কিস্তক বাইতে হইবেনে।

বই থেকে মুখ তুলে কালোর মার মুখটা চিনতে বেন সময় নেন অমল, অধ্যাপক অমলকান্তি রায় অথবা ছাত্রদের এ-কে-আর। চশমার পড়ার অংশের উপর দিয়ে দেখতে গেলেই মানিয়ে নিতে সময় লাগে তাঁর। হ্যাঁ, কালোর মা-ই তো! আজ কালোর মা একটু বেশি সাজগোজ করেছে—এটা অধ্যাপক রায়ের চোখে পড়ল। আর কালোর মাকে চেনার সূত্রে তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে এটা তার আনুষ্ঠানিক সাজ। যাদের যাদের বাড়িতে সে কাজ করে তাদের সকলকেই কালোর মা তার গৃহ-প্রবেশের পূজোর আমন্ত্রণ করবে। তাই এত সাজের ঘটা। অবশ্য এসব বাড়ির প্রায় সকলেই জানে, যে কালোর মা এক কাপড় পর পর দুদিন পরে না। আর কালোর মা যেসব শাড়ি পরে তার অধিকাংশই অমলের বেশ চেনা চেনা লাগে। এমন কোন চেনা শাড়িতে কালোর মাকে দেখলেই অমল ভাবতে থাকেন—অণু আবার শাড়ি কেনার ব্যয়না করবে।

বেশ কিছুদিন হলো অণু, অর্থাৎ স্ত্রী অনামিকা কালোর মার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছে—কেবল কামাই আর কামাই। ভাগ্যিস রামার লোক আছে, নইলে আমার হাতে হাজা হয়ে যেতো। অবশ্য সেও কি আর ভুব দেবে না। কেন এত কামাই করছে কালোর মা? অমল জানতে চান। অণু মুখ কামটা দিয়ে জানিয়ে দেয়—কেন আবার, বাড়ি করছে, বাড়ি। নিজের বাড়ি। তোমার মতো কি ভাড়া বাসায় কাটাতে চিরদিন?

অমল ব্যাপারটা বুঝতে পারেন এবং দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন—হবে, হবে। তোমারও বাড়ি হবে। একটু ব্যাক ব্যালেন্সটা...। কথা শেষ করতে হয় না, অণু বীকা চোখে অমলের মুখটা দেখতে দেখতে বলেন, থাক আর জোক দিতে হবে না।

রামায়ের থেকে আসা কড়াই ধরার গন্ধ অনুর রংগজিনীটা মূর্তিতে জল ঢেলে দেয়। এখন কালোর মার গৃহ প্রবেশের নেমস্তনের কথাগুলো মনে পড়ে অমলের। তিনি কথা দেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবো। বাড়ি করা হয়ে গেছে?

দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস

কালোর মা আর পাঁচজন কাজের মেয়ের মতো সাত কাহন করে নিজের কথা বলে না। অবশ্য একেবারে বলে না, তেমনও নয়। সে তো কোন অন্যায় কাজ করে না, তাই তার কোন কিছুতে লুকোচুরি বলে কিছু নেই। আর তাই তার সহজ উত্তর—না দাদা, আপনাদের কাছ থেকেই কুড়োয়-কাড়ায় যা পাই, তা দিয়া কি সব করন যায়! তয়, হইছে অ্যাটা কুড়ে। ... ঘর আর বারান্দা। বারান্দার পশ্চিম কুণায় গ্রান্ডনের জায়গা। কাঁচা মাটির বাড়ি, রাত্রির বেলায় বিজ্ঞানা ভিজা ওঠে। তাই বর্ষের মাচা বনাইতে হইল। পিঠে বড় লাগে। অ্যাটাটা তোষক না হলি ধুমান যায় না।

অমল কালোর মাকে এত কথা বলতে কোনদিন শোনেননি। তাই বানিকটা থবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। নিজে রসিক মানুষ। বলেই ফেলেন—তা নতুন বাড়িতে নতুন বিজ্ঞনা-পত্ৰ তো চাই! একটা তোষক বানিয়ে ফেলো।

কিন্তু কালোর মা কথাটার বিশেষ অনুপ্রাণিত হলো না। 'অমলই বা কী করে বুঝকেন যে কালোর মার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হবে উল্টা বুঝলি রাম?—কী যে ক'ন দাদা! বাড়িটা নতুন বাটে, তয় কিনা তার সব কিছুই তো পুরোনো। আপনার বন্ধু বিলুনা সিঁড়ি ঘরভায় পাকা স্বদ দিল না? তার করগেটের টিন কয়ডা পাইছিলাম। তার সাথে আর কয়ডা পুরোনো টিন দিয়া চাল দিছি। আর হরেন মিস্তিরির কাছে দুই ছগয়াল কাজ করে, হে তো আপনে জানেন। ওর ভারী বাঁধার পুরোনো বাঁশ দিয়া...

অমল দেখলেন, কালোর মার সময় আজ বড় ধীরে বইছে। অন্যদিন তার কথা কবার সময় থাকে না। দুপুরের মধ্যে পাঁচ বাড়িতে কাজ করে সেই কিবাটি পিঠো ট্রেন ধরে। তারপর কোথায় সেই দলপুত্র। আজ আর কোন তাড়া নেই। অমল কথা শেষ করার জন্য ভাড়াভাড়ি বলেন—অন্যের কাছে যা পুরানো, তোমার কাছে তো তা নতুন। ঠিক আছে, যার তোমার বাড়ি দেখতে।

অমল বইয়ের পাতায় চোখ নামাবার সময় পান না, কালোর মা অমলের কথার খেঁই ধরে বলে ঠিকই কইছো দাদা! তাই কইছিলাম যদি বসার ঘরের তক্তাপোষের তোষকটা আমারে দিয়া দ্যান...

হ্যাঁ, বসার ঘরের তোষকটা বেশ পুরানো। অনামিকা ভাল বেতশিট আর বেতকাভার দিয়ে সেটাকে ঢাকা দিয়ে ভব্রহু করে রাখে। কিন্তু কালোর মা সে খবর পায় কী করে?

অমলের মনের কথাটা বুঝি আঁচ করে কালোর মা। সে পুরানো কথার ধারাবাহিকতার সূরে বলে—ভাদ্র মাসে বৌদি কইলো, কালোর মা, নীচের তোষকটা রোদে দ্যাওন লাগে। দ্যাখলাম দাদা, আপনার মত লোকের বাড়িতে এই তোষকভা সাজে না। হেই কই...

— বৌদিরে বলে গে।

অব্যাহতি পাওয়ার অন্য কোন উপায় অমলের মনে পড়ল না, অনামিকার আশ্রয়ই নিতে হলো। যা ম্যানেজ করার অণুই করুক—ভাবেন অমল।

কালোর মা এই কদিন আগেও থাকতো বাগজোলা খালের পারে, জ্বরদখল কলোনিতে। তারও নতুন বাড়ি হলো। শ্বেক পুরানো বাঁশ-টিন আর চটাইয়ের বেড়া। প্রতি বছর পুরানো পড়া নতুন ছাত্রদের পড়াই না? ওদের কাছে তো এই পুরানো পড়া নতুন। একটু আধটু অদল-বদল কত কই যে নতুনত্ব আনে। সিঁড়ি ঘরের চালার করোগেটেড টিন কালোর মার ঘরের চাল হল তাকে নতুনই দেখায়। ভাবতে অমলের বেশ লাগে।

পরদিন কলেজ থেকে ফিরে অমল দেখেন তাঁর বসার ঘরের চৌকিটা ন্যাড়া। তার মনে হলো যেন আদুল গায়ে একটু বুড়ো রোগা মানুষ তাঁর দিকে ডাব ডাব করে তাকিয়ে আছে। একটা শতরঞ্চি বা চানর দিয়ে চৌকিটাকে ঢেকে দেয়নি অণু। অমলের মনেও ছিল না, যে কালোর মা এই তোষকটা তাঁর কাছে চেয়েছিল। অনুকে বললেন এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখনো তোষকটা ছাদে রয়েছে। অনামিকা ঠেস দেয়—দাদা-বলল, আর উনি গলে গেলেন। যাও গেরো পেরবেশে গিয়ে তোষকে বসে এসোগে।

— ওঃ আমি ভাবলাম, তুমি কোনভাবে কিছু একটা বলে ম্যানেজ করবে। তোষকেও চুপি পরিয়ে দিল কালোর মা।

অবশ্য মনে মনে অমল খুব খুশি হলেন। কারো পুরানো, অন্য কারো কাছে নতুন। বজ্র শেষে কত নতুন বই, প্রায় নতুন কাপড়-চোপড় পুরানো বলে ব্যতিল হয়, আর এ তো কুড়ি বছরের পুরানো এক পঁচা তোষক!

ট্রেন থেকে নেমে অমল হাঁটতে থাকেন কালোর মার নির্দেশ মত—পিলটিফর্মে নইমে ফার্মার দিকি হাটবা। হার পর পিলটিফর্ম শ্যাম হালি লাইন জুইড়ে বা দিকি নামবা। দ্যাক পা আটটা হাঁটার রাস্তা লাইনির পাশে পাশে উত্তরমুখি গেছে। ঐ রাস্তা

ঘরে হাঁটতি থাকপা। এটি পুরে পাবা পাক রাস্তা...

অমল সবকথা শোনে না। গাঁ-এর নামটা অবশ্য কথার ফাকে ডাইরিতে লিখে নিয়েছিলেন। সেই ভাসা-ভাসা মনে থাকা নির্দেশ মত পথ হাঁটতে থাকেন অমল। কিন্তু পথ যেন ফুরাতে চায় না।

— এই যে ভাই, বেলতা গ্রামটা কতদূর? একজন পথচারীর কাছে জানতে চান অমল।

— ওই তো বেলতা। আট্টু আগোয় যান, পাঁচ মিনিটের মথি পৌছোয় যাকেন।

পাঁচ মিনিট পনেরো ছড়িয়ে যায়, তবুও বেলতার দেখা নেই। এতটা পথ হেঁটে সেই ভোর রাতে কালোর মা রেল স্টেশনে যায়? অমল ভাবেন—আর তিনি কিনা একদিনের জন্য এই হাঁটাপথটুকু পেরোতে এতটা খিরত!

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কালোর মার 'দুই মিনিটের' রাস্তা শেষ হলো পর্যটন মিনিট পেরিয়ে। অবশ্য কালোর মা হয়ত তাঁর চেয়ে অনেক দ্রুত হেঁটে—ভাবলেন অমল। শীখ বাজার শব্দে অমল দাঁড়িয়ে পড়েন—কোনদিক থেকে আসছে শীখের আওয়াজ? কিন্তু অমল দেখতে পান, সামনেই দাঁড়িয়ে কালোর মা তার অতি উজ্জ্বল সাদা দাঁত বের করে—কখন থেইকা বাঁড়াইয়া আছি—দাদায় আছে না কান, দাদায় আছে না কান...

আয়োজন সামান্যই, অমলও বেশি কিছু প্রত্যাশা করেননি। ভাল, সবজি, মাছের ঝোল আর দই। একটা করে রসগোল্লাও ছিল। খাওয়ার পর অমল কালোর মার খরপোর ঘুরে ঘুরে দেখলেন। রাস্তার পাশেই দু-কাঠা জমিতে কালোর মার দুই কামরার দোচালা টিনের ঘর, সামনে ছোট উঠান, আর ঘরের পশ্চাতে সামান্য গর্ম—হয়ত সবজি ফলাবার জন্য ফেলে রাখা। কালোর মার খুব সখ ঘরের পেছনে থাকবে কলা গাছ আর পেপে গাছ।

ফেরার পথে অমলের মনটা বেশ খারাপ হয়। দোচালা টিনের ঘরে দুটো কামরা। দুই ছেলের জন্য। দুটি ঘরেই তাঁর বাড়ির কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য ব্যবহার্যের উপস্থিতি। কিন্তু কালোর মার কোন ঘর নেই। যেমন ছিল বাগজোলা ক্যাম্পের ভাড়া-নেওয়া ঘরের বারান্দায় তার ঠাই, এখানেও তাই। কেবল পার্শ্বকা এই যে বাগজোলা বস্তির বারান্দায় শোওয়ার বিছানা ছিল বস্তার উপর বাঁধার স্তর, আর এখানে বাঁধার চালির উপর অনামিকার দেওয়া সেই তোষক। এটা নজরে

পড়তে অশ্রু অমলের একটি ভাবান্তর হলো—যাক, কালোর মার একটা পুরানো তেথক যে জুটেছে শোওয়ার জন্য। এবং আশ্চর্য অমলের মনে হলো, তার পুরানো তেথকটা এই পরিবেশে যেন নতুনদের আভাস দিচ্ছে। অমলের আরো মনে হলো, কালোর মাকে আর বাগজেলার পঁচা জলের দুর্গন্ধের দুর্ভোগ পোহাতে হবে না। খেলা মাঠের সবুজ ঘাস আর ধান খেত থেকে ভেসে আসা ধানের গন্ধে কালোর মা নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখবে—তার উঠোন ভরে গেছে জন্ম মাটিতে ফেলে আসা সোনার ধানে।

বিদায় দেওয়ার সময় কালোর মা যেন অমলের মনের কথাটাই বলে ফেলে—  
দাদা, সবতো হুগাইল্লিম, এখন ক্যাবল মাথা গোঁজার ঠাই নয়, ধানের গন্ধও নাকে আসে, পরের হলিও ভারি আপন লাগে, দাদা। ঘুমাইতে তখন ভারি ভালো লাগে। মনে হয়—অহনি অজিমা কইবেনে, ওঠ ছিমড়ি, ওঠ। উঠানে গোলা দেওন লাগে, মজন মলতি হবে। ওঠ, ওঠ।

অমল ভাবেন, তখন কি কালোর মার চোখে ভাসে, ফেলে আসা তার দিনিমার ভিটে-বাড়ি, ধানের পালা, গোয়াল ঘর...?

অমল ক্রত পা চালান, ট্রেন ধরতে হবে।

## হরিগুরুচাঁদ স্মরণে

উৎপল বিশ্বাস

তুমি হরিচাঁদ রূপে অবতীর্ণ, তুমি গুরুচাঁদ রূপে নিলে সমাধান।  
তুমি ভক্তের ভগবান, তাই ভক্তেরে করলে অজ্ঞ-অকাতরে দান।।  
তুমি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান দিতে রাখনি কিছু বাধা।  
তুমি কোন কাজের কোনখানে রাখনি কোথাও ফাঁকি।।

তুমি অজয়, তুমি অক্ষয়, তুমি পূর্ণ অবতার।  
তুমি বিশ্ব, তুমি বর্ষা, তুমি সৃষ্টি, তুমি অধরা।  
তুমি অমর, তুমি অজয়, তুমি ক্ষিরোদ ও ইন্দ্র।।  
তুমি নীচ হয়ে করিলে নীচেরে উদ্ধার।

তুমি আলো, তুমি বায়ু, তাই জীবের ঘূঁচলে অন্ধকার।  
তুমি মুনী, তুমি জ্ঞানী, তুমি মানব মুক্তির দার।।  
তুমি কাকালকে নিলে ধন, অমানীকে নিলে মান, রাখনি কিছুবাদ।  
তুমি কোটি কোটি মানুষের ত্রাণ কর্তা তাই পৃথিবী মনো সাধ।।

তুমি ধার্মিক, তুমি সামাজিক, তুমি সাংস্কৃতিক, তুমি রাজনৈতিক নিশারী।  
তুমি মানব মুক্তির বারিষি, তাই আমরা তোমার অনুসরণকারী।।  
তুমি হরিচাঁদ, তুমি গুরুচাঁদ, তুমি গুরু মহারাজের।  
তুমি কাকাল, তুমি ধবনী, তুমি নিশা নিশেহরারের।।

তুমি ইন্দ্র, তুমি পরমেশ্বর, তুমি আল্লা, তুমি ভগবান।  
তুমি দাতা, তুমি আতা, তুমি মানুষকে সব কিছু করলে দান।।  
তুমি আত্মা, তুমি মুক্তিদাতা, তাই তোমারে করি প্রণাম।  
তুমি সব কিছু নিলে, জীবের মজল তরে, বসে ওড়াকান্দিধাম।।

নীলা নয়, কর্মভনে প্রকার হলে তুমি বিশেষ।  
মৃগা নয়, অবহেলা কর ব্রাহ্মণবর্গী হিসেবে।।  
তুমি জ্ঞানী, তুমি গুণী, তাই ভক্তি ও পূজা করি তোমার।  
তুমি পীড়িত এসে, হলন মাঝে, চিত্ত সুদ্ধি করে দাও আমার।।

## শাসনে, পরিবর্তনে

সব্যসাচী গোস্বামী

নিষেধের অস্ত্র দিয়ে  
সমস্ত শরীর জুড়ে একে দেয়া হোক  
ছেদ যতি চিহ্ন সব  
দাড়ি, কমা, হুইফেন,  
প্রশ্চিহ্ন, বিস্ময়বাচক।

নিষেধের কীচি দিয়ে  
কেটে ছেঁটে বাদ দাও ভালবাসা, বিদ্রোহ, শোক।  
ঘিরে ফেলে চারপাশ  
পিছমোড়া করে বাঁধো  
আনুগত্যে আপাদমস্তক।

নিষেধের কাপড় দিয়ে  
ঢেকে দাও একে একে চোখ, মুখ, কান।  
কবরে নৈশেদ থাক,  
চরাচর জুড়ে শুধু  
জোপে থাক রাতের শাসান।

## লালবাজার

সব্যসাচী গোস্বামী

তুমি যখন  
বললে আমায়  
'কেমন আছ' ?  
মিষ্টি করে।  
আমি তখন  
জ্বরের ঘোরেও  
স্পষ্ট দেবি  
ডানা কাপ্টায়  
একটি পাবি  
মুখখানি তার  
অঙ্গকারের  
মুখোশ ঢাকা  
দু'চোখে তবু  
মুক্ত দিনের  
অপমানা

রাত্রী নামে  
আঁধার টুইয়ে!  
লোহর শিকল  
পরান টুয়ে  
লালবাজারে  
লালবাজারে...

## ভালবাসার ইস্তাহার

সবাসাচী গোন্ধামী

তুই কাছে এলেই  
ডিজিয়ে যেতে ইচ্ছে করে যাবতীয়  
লাইন অফ কন্ট্রোল  
শুধু সীমান্তের কাঁটা ভারের বেড়াগুলোই  
বঙ্ক বেরসিক মনে হয়।

তোর অতীত তাকে পিছু টানে  
তাই, তোর ভিতর দোলাচল।  
আমার বর্তমান আমাকে পিছু টানে  
তাই, আমার ভিতর দোলাচল।  
মাকখানে দাঁড়িয়ে থাকে  
নিষেধের অদৃশ্য পাঁচিল।

লিখি,  
কাটি,  
ছিড়ি,  
বারবার...  
কি লিখব?  
ভাষা জানা নেই  
নৈশদতার।

মন কোন নিষেধ মানে না  
তাই বারবার পাসওয়ার্ড ভেঙে  
চুকে পড়ে তোর হৃদয়ের  
অলিতে গলিতে।

২৫৬ ✍️ জেনারেল

এতো কথা বলতে নেই,  
চুপচাপ বসে তো এখানে  
চেটেপুটে খাই তোর  
দু'চোখের মুগ্ধতা।

তোর কাছে যেতে বুঝি পাসপোর্ট লাগে?  
ভিসা করতে হয় বারবার?  
যদি চোখের ভাষা না পড়তে পারিস  
তবে, বুকে প্রাকার্ডের মতো কুলিয়ে নেব  
ভালবাসার ইস্তাহার...

২৫৭ ✍️ জেনারেল

## মনুসংহিতার উত্তরপর্বে

সংক্ৰেটিশ ভারতী

তুলশিতলায় দাঁড়িয়ে তুমি সাক্ষাৎপ্রদীপ হাতে  
মা, তোমার ইস্ট দেবতার নাম যাচ্ছিলে ভুলে বারবার—  
সেই সকালে আধপেটা বেয়ে মেয়েটা গেছে কলেজে  
যার চৌকঠ পেয়েয়নি কোনোদিন বংশের কেউ আগে।  
সন্ধ্যা গড়িয়ে এল, খুকি শিবির আয়রে ঘরে;  
মাঠের বুক চিরে শূন্য যাওয়ার পথ  
যেখানে ক্ষেতে গড়ায় যুবতীর ছেঁড়াফাটা অন্তর্বাস।  
মাগো, তোমার খুকি ফিরবে না আর কোনোদিনও  
খানিক আগে ওতপাতা লালসাদাত  
খুবলে নিয়েছে আমার নাকিমূল।  
তোমার খুকিরে চিনতে পারবে না আর;  
আমি কি পেয়েছি চিনতে আমার জন্মভূমির রূপ?  
এখানে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির  
বউকে বাজি রেখে পাশা খেলে,  
রাজসভায় রমণীর বস্ত্রহরে লম্পটের দল  
মহুরথী পক্ষ স্বামী রা-কাটেনা ছৌপদীর চোখের জলে।  
তোমার মনে পড়ে মা, মাঠে হাল দেওয়ার আগে  
মেঘবৃষ্টির নিকে তাকিয়ে  
বাবু খনার বচন আওড়াত বারবার  
বৃষ্টিও আসত একদিন বেলাপে।  
অথচ বাবা জানত না—এ দেশটায়  
খনার মতো বিদূষী নারীর জিতে  
স্বামী-স্বপ্নের ছুরি চালায় নিপুণ হাতে।

সংক্ৰেটিশ ভারতী

খনা নিজেই কি জানত—

মেয়েদের পুরুষের চেয়ে বেশি জানতে নেই।  
আমার মৃত্যুবীজও হয়তো এমনই করে  
লুকিয়ে রেখেছিল মনু  
আমার জিভের নিচে।  
কেমনা কলেজে পা রেখে জেনে ফেলেছিলাম হাওয়ার মুখ  
মেয়েদের চির পরাধীন করে রাখার মনুর গোপন রহস্য।  
আমার জন্মভূমি এমনই দেশ  
বাঁচার রহস্য জেনে গেলে  
মৃত্যু আসে বহুজনী রঙ মেখে,  
মেয়েদের মরতে হয় চলন্ত বাসের খোলে  
ধনক্ষেতের আলো কিংবা পরিত্যক্ত কারখানায়।  
দিল্লির রাজদরবার থেকে সাগরপাড়ের কলমলে মুখাই  
অথবা আমাদের হৃদয় কামদুনির শূন্য যাওয়ার পথে  
মহাবৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্বিকার পান্ডব বীর  
আর কৌরব এখনও ভৈরব নাচে কীর্তনখোলা মাঠে  
ধর্গিতা নারীর ক্রন্দন চিৎকারে।  
তবু তুমি তুলশিতলায় সাক্ষাৎপ্রদীপ দিতে,  
তোমার খুকি যাবে খনার কাছে  
আকাশের তারা গোনা শিখতে।  
চেয়ে দেখ, সদ্য কলতে শেখা টুঙ্গা সই,  
লাজুক বউ মৌসুমী চিনে ফেলেছে দেশটিকে।  
আমার মৃত্যু ছুঁয়ে আগুন হতে চায় ওরা,  
ভাবার বীজ উড়িয়ে ঝঙ্কা বাতাসে।  
একটু আগে খনা ওদের দিয়ে এসেছে বাঁচার মন্ত্র—  
নিজের কথা নিজে বলো আগুনের কানে কানে।

মা, বড় সাধ ছিল আমার নিখর প্রাণে :  
 একবার ফিরে আসি  
 আমাদের সেই দারিদ্র্যমাথা মাটির দাওয়ার  
 যেখানে আমার কচি হাত ধরে বলতে তুমি —  
 আসছে ছুটে একা গাড়ি  
 খুকু যাবে সূর্যের বাড়ি।  
 মাগো, আমি আলো হতে চেয়েছিলাম।  
 আজ, তুমিতে আর সেই তুমি নেই—  
 তোমার ঘরে অধার নামে সূর্য ওঠার আগে  
 আমার মৃত্যু বেচেছ শহুরে দামে,  
 তোমাদের পাকা ঘরে মস্তুর গাড়ি আসে যায়  
 হাজার মেয়ের ছেঁড়াফটা অন্তর্যাস  
 এখনও ধূলায় লুটায় —  
 চেয়ে দেখ মা—  
 তোমার চোখে এখনও মনু  
 কথা বলে যায়—

## বনে বনে চণ্ডালিনী

আমার সবুজ পরশ রেখে  
 যাই মুক্তিকার পরে  
 ধরিবী হসিয়া ক'হে—  
 আমি কি এতই কাঙ্ক্ষল  
 তোমার সবুজ আশে কাটে  
 কি আমার সকাল  
 চারিপাশে বৃক্ষরাজি, ছোট ছোট তৃণ  
 সকলে হসিয়া ওঠে  
 হয় রে! সবুজ সোহাগী  
 অরণ্য কি উৎসবে জাগে  
 আমরা তো কতকাল আগে  
 ধরিবীর বুকে বসে আছি  
 সাজিয়ে দিয়েছি ধরা সবুজের  
 বিচিত্র শোভায়—  
 এ ধরাকে বিবর্ণ করেছে যারা  
 তারাই উৎসবে মাতে পুনরায়  
 মৃজাপর, অরণ্যের হয়—

কিধির অরণ্যরোদন  
 ভাঙ্গের নরম রাতে  
 কির কিরে বৃষ্টি শেষে  
 ক্লান্ত আকাশ  
 দূর হতে ভেসে আসে  
 একটানা টুলারের শব্দ  
 রাতজাগা জীবনের ডাক ছড়িয়ে  
 চলে যায় গভীর সাগর  
 পানে মৎস্য সন্ধানীরা  
 মোমের নরম আলোয়  
 আমার সাহিত্য বিলাস  
 খুয়ে দেয় বাইরের নিকশ  
 অধার

## স্বামী মনুষ্যের যে কতটি পড়া দরকার

### সেরা গবেষণা

#### দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস

বাঙালি হিন্দু মতাবিজ্ঞানের স্বরূপ

৮০

এই সময় এই সমাজ

৮০

শ্রীশ্রীহরিশ্রীস্বত

প্রসঙ্গ : হরিশ্রীস্বত কাকুরের নিষেধাজ্ঞা

১০০

প্রকাশিত খর্ষ : প্রসঙ্গ মানুষের মানব সত্তা

১২০

সুনীল কুমার রায়

বহুজন সভাপতি : নমজাতির

আত্মপরিচয় ১৫০

সমুদ্র বিশ্বাস

ঐতিহ্যের আলোয় মতুরা আন্দোলন

৭৫

গ্রামবাসীর জগৎপথে মতুরা আন্দোলন

৭৫

ঐতিহ্য কেন পুন হলে

৭৫

রামচরিত কেন গ্রন্থযোগ্য নয়

৭৫

মহিমাসূত্রের ব্যঙ্গধর্মের

৭৫

মহিমা মুক্তি আন্দোলন

৭৫

মহিমা সৃষ্টিতোর গতি-প্রকৃতি

৭৫

মহিমাচরিত না কলা কথ্য

৭৫

ঐতিহ্য এক প্রকার স্বাধীনতাবোধ

৭৫

বাঙালি কীর্তন নৌকাবাহিনী

৭৫

বাংলা ভাষার বহি

৭৫

আত্মমন : একটি প্রামাণ্য নথি

৭৫

জগতবর্ষের অন্তরালে

৭৫

বেদ-পুরাণে লক্ষ্মী-সরস্বতী

৭৫

বাংলার বাবু সংস্কৃতি

৭৫

দুর্গাপূজার অন্তরালে

৭৫

দিলীপ গারেন

রাশ্মি বর্জিত

মনোহর প্রজ্ঞাপন

### সেরা নাটক

#### সমুদ্র বিশ্বাস

অন্তরীপ ৩০

চম্পু ৩০

সত্যসংবাদ ৩০

অগ্নিবাহু ৩০

মরন বীর ৩০

রাশ্মি রাশ্মী সংবাদ ৩০

রাশ্মি নর রাশ্মি ৩০

বীর শহিদ মহিমাসূত্র ৩০

বিত্তমণ্ডের কল্যা ৩০

মুখপোড়া হুম্মান ৩০

মিত্রচিহ্ন আগস্ট ৩০

জয় চরিত্র জয় চরিত্র ৩০

পিতৃহত্যাকারী প্রহ্লাদ ৩০

গির্জার প্রতিজ্ঞা ৩০

### সেরা উপন্যাস

#### সমুদ্র বিশ্বাস

অয়তন্য ১৫০

অনভিট ১৫০

বোম্ব সেয়ে ১৫০

## বিক্রয়কেন্দ্র (প্রত্যহ ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত)

৯, মণীষা মিত্র রো (শিরালদহ, ডিমপট্টা),

কোলকাতা - ৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৮৯০২৪৮৮৩২০, ৮৫৮২৮৩৩৬২১

২৬২ ৫ ৩৩৩৩

## দুর্গাদেবী

কাহিনী উৎস—সমুদ্র বিশ্বাসের লেখা 'দুর্গাপূজার অন্তরালে'

### হর্ষবর্ধন চৌধুরী

ইন্দ্র :

আজি উৎসব মুখরিত অমরাবতি,  
আনন্দে দেবগণ করিছেন সজ্জারতি,  
অত্যাচারী অসুরের অত্যাচারে হলে অবসান।  
নিশ্চিত আনন্দে দেবগণ গাহিতেছে গান।  
হয়েছে মত্ত করি আকর্ষ অমৃত-সুরা পান।  
ভগিনী এই শুভদিনে কেন বিবাদ বদন  
কল কেহ কি করিয়াছে কোন ক্ষতি সাধন?

দুর্গা :

স্বামী যার কারান্তরালে করিতেছে দিন যাপন,  
কেমনে করিবে সে উৎসবে আংশগ্রহণ?

ইন্দ্র :

কারা কোথায়? প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে আছে স্বাচ্ছন্দ্যে  
অফুরন্ত ভোজন, সুরা আর নর্তকীদের সান্নিধ্যে।

দুর্গা :

রাজা সে অসুরদের বিলাসের ধার নাহি ধারে,  
ব্যাকুল সে সপা দেশে ফিরিবার তরে।

ইন্দ্র :

দেশে আর কিরে যাবে না সে কখনও,  
ধীরে ধীরে ত্যাগকর, যদি মোহ থাকে কোন,

দুর্গা :

স্বামী, সে অগ্নি সাক্ষী করে করেছে বিবাহ,  
আর কহিছ তার প্রতি থাকিবে না কোন মোহ।

ইন্দ্র :

ভগিনী স্বামী বলে সম্বোধন করিছ কাহারে?  
মুক্ত দেবতারা, কোন সম্পর্কের ধার নাহি ধারে।

দুর্গা :

যবে বীর মহিমাসূত্র বিদ্বজ্জ করিল অমরাবতি,  
তব দূত, করজোড়ে তার সভায় গিয়া, আনাইল মিনতি।  
কহিল কিসের বিনিময়ে তিনি দেবেন নিম্বুতি  
দেবতাপাশে। শাস্তিতে গড়িতে দিকেন বসতি।

২৬৩ ৫ ৩৩৩৩

কহিলেন বীর, "সম্মান দানিতে হবে যত আদিবাসীগণে,  
নগর গড়িতে আর আশ্রয় লাগাইবে না বনে।  
পরাজিতজন, প্রাণ রক্ষার্থে, রাজী হয় যে কেন শর্তে।  
সম্মতি জানায় কহিল আর কী হবে করিতে?  
অসুর সমাজে পারী থাকে সম্মানের শিখরে  
ভাবিল অসুররাজ, যদি দেবরাজ ভগিনীকে বিবাহ করি,  
বিবাহ করি আশ্রয় মনে করি দেবগণ,  
অসুরদেশ কখনও করিবে না আক্রমণ।  
মহা সমারোহে দিলে বিবাহ মহিষাসুরের সাথে,  
সেই হতে তার সাথে আমার জীবন গিয়েছে গেঁথে।  
একদিন দূত-বেশে কিছু সৈন্য করিলে প্রেরণ,  
জানাইলে আমাদের অমরাবতীতে আমন্ত্রণ।  
সম্মানের নিদর্শন গণি অসুররাজ হইলেন সম্মত,  
এই আগমনের খবর রহিবে গোপন এই ছিল শর্ত।  
সেই হতে আমার স্বামীকে রাখিয়াছ কারান্তরালে,  
কঠিন প্রহরায়। বন্দি করি রাখিয়াছ আতিথ্যের ছলে।  
কখনই যাই তাহর কাছে, কেন কথা নাহি বলে মুখে,  
অবিশ্বাসের আগুণ জ্বলে মুখে, চোখে তার  
লজ্জার পারিণা চাহিতে তাহর মুখ পানে।  
বল, অসুররাজে বন্দি করিয়াছ কি কারণে?

ইন্দ্র : হায় ভগিনী তোমার এত অধঃপতন আগেতো দেখিনি,  
দেবমোরা সদামুগ্ধ, কোন বন্ধনে বন্দি কখনও থাকেনি।  
সুখ আর ভোগের তরে আমরা ছুটে যাই দেশদেশান্তরে,  
দেবতারার করে ভোগ, কাহারও দায় বহন নাহি করে।

ওগু অসুরেরা ছিল দেবতার স্বাধীনতার অন্তরায়,  
অসুর বিনাশের তাই বুজি নিত্য নব উপায়।

দুর্গা : বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে কেন করিলে না নিধন?  
কেন আমার সাথে ঘটাইলে তাহর বিবাহ বন্ধন?

ইন্দ্র : যুদ্ধক্ষেত্রে কি শুধু কিছু নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড?  
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডজুড়ি চলিছে অখণ্ড যুদ্ধকাণ্ড।  
পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, আছে মানুষ যত,  
সকলে ব্যস্ত আপনার অধিকার করিতে প্রসারিত।  
তুমি কি মনে কর মহিষাসুর তোমাতে খুব ভালোবাসে?  
শুনে রাখ আসলে গৌর-বর্ণা নারী পেয়ে উচ্ছসিত সে।  
আসলে দেব-কন্যারে বিবাহ করি, করে সে অহংকার,  
কেন স্ববর্ণের নারীকে নাহি দিল মহারাজার অধিকার?

দুর্গা : মান্নিমা তোমার কথা, তোমার কথায় বিশ্বাস করে,  
এসেছে সে প্রহরারীন গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করে।

ইন্দ্র : প্রেমের ছলনায় তুমি মোহিত করেছ অসুরে।  
আমার বিশ্বাস ছিল তোমার যোগ্যতার প'রে।

দুর্গা : মিথ্যা কথা আমার ছিল না কোন ছলনা,  
অস্তুর দিয়ে আমি তাহারে করিতাম কামনা।

ইন্দ্র : তোমার গাত্রবর্ণের প্রতি ছিল অসুরের অকর্ষণ,  
ওরে অবুঝ শোন, তোমার প্রতি নাহি ছিল প্রেম কোন।

দুর্গা : সত্য যাচিবারে এখনই চলিলাম আমি কারাগারে  
প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসে সে আমারে।

ইন্দ্র : দারী, পশ্চাতে কর গমন, যেন না ঘটে কোন অঘটন।  
হায় সরলা দুর্গা কী সত্য করিবি উদ্ঘাটন,  
রহি দীর্ঘ কারান্তরালে শেষ হয়ে গেছে সব বিশ্বাস  
আমাদের প'রে। দেখিলে তোমাতে জেগেছে কেলিবে দীর্ঘশ্বাস।  
অগ্নি দৃষ্টিতে করিবে দহন, কহিবে না কোন কথা।

দুর্গা : দুঃখ পেয়ে আশিষি ফিরে নীচু করে মাথা।  
আমার প্রণয়ের না জানাইল কোন উত্তর,

অগ্নি দৃষ্টিতে দিল ওগু থিকার।

ইন্দ্র : দুষ্ট অসুরের দেওয়ার কিছু নাহি ছিল উত্তর,

অনিষ্ট কিছু করার আগেই করেছি উদ্ধার।  
ভাগ্য ছিল সহায় না হলে ইন্দের মত ভাই হয়।  
তাই ত্যাগিয়া অসুরের প্রতি সব মোহ,  
সূরা পান করে দেবতাদের বাড়িও উৎসাহ।

দুর্গা : এত সহজে ভেঙে দিলে বিশ্বাসের ভিত,  
স্বামীকে অবিশ্বাস করে বাচিব কাহার সহিত?

ইন্দ্র : শৈশব হতে হয়েছে বড় হাত ধরে যার  
বিবাহ করি আজ সে পর হ'ল তোমার।  
দৈব চেতনার হও জাগ্রত, সংশয় ত্যাজ,  
অসুর নিধনে তুমিও আমাদের কর সাহায্য।  
একী বাহিরে একী শুনি ধনুকের টংকার

দুর্গা : নটেরা এসেছে রাজ্যতেছে বান্দা, এ শব্দ তার।

ইন্দ্র : পরিচিত শব্দ, এই শব্দে ভীত হয়ে,  
পাথড়ে জঙ্গলে বেড়াতেম পালিয়ে।  
ভুলে গেলে তুমি কি দুর্বিসহ সে দিন,  
প্রতি মুহূর্তে অসুরেরা জীবন করেছিল সঙ্গীন।

দুর্গা : অবশেষে আমি তোমার কথায় নর্তকীর রূপ ধরে,  
পাথড়ে পাথড়ে বেড়াতেম নাচ-গান করে।  
আহত হইল অসুরপতি মোর কামবানে,  
ছন্দের হল আবসান বিবাহ বন্ধনে।

ইন্দ্র : বিবাহ, হা, এমন শব্দ নাই দেব অভিযানে,  
নারীর প্রয়োজন শুধু সন্তান জন্ম-দানে।  
অধিক সন্তান হলে হবে অধিক সেনা,  
তবেই সম্ভব এই পৃথিবীতে দেব অধিকারে থানা।  
সন্তানের জন্যে যে কেউ হাত পারে সহায়ক,  
পিতা মাতা অথবা তার যে কেউ হোক।  
সন্তান জন্মের পর নারী পায় পূর্ণ স্বাধীনতা।

ভাব্যা বা পত্নী হয়ে করে না কাগুরো অধীনতা।  
মুক্ত সে, নহে কোন নিয়মের অধীন,  
দেবী বলে পূজো করে তারে মর্তবাসীজন।

দুর্গা : অসুরের ঘরনী আমি, কে পূজিবে দেবী বলে?  
মুক্ত করি দাও মহিষাসুরে। যাই তার সাথে চলে।

ইন্দ্র : ফিরে গিয়ে রাজ্য করিবে তার দুর্দশার কাহিনী,  
আক্রমণ করিবে অমরাবতি লইয়া অসুর বাহিনী।  
আবার রাজ্য-স্বরা হয়ে বনে বনে বেড়াব ঘুরে,  
ফুধা-ফুধায় কত জনের প্রাণ যাবে ঘোরে।

দুর্গা : কিছু কত দিন বন্দি করে রাখিবে মহিষাসুরে,  
অসুরেরা একদিন নিয়ে যাবে উদ্ধার করে।  
তাই বলি রাজ্য বন্দি থাকিতে থাকিতে,  
দেখ পারে কিনা দেবতার অসুর ধ্বংস করিতে?

ইন্দ্র : অসুরের সাথে সম্মুখ সমরে সমর্থ নয় দেবকুল,  
ছলে তাই অসুর কুল করিতে হইবে নির্মূল।  
তুমি পার, যদি চাহ দেবকুলে করিতে উদ্ধার।

দুর্গা : পুরুষেরা বার্থ যেনা, নারী হয়ে কি আছে করার?

ইন্দ্র : হত্যা করিতে হইবে অসুররাজ মহিষাসুরে।

দুর্গা : স্ত্রী হয়ে কেমনে বধিব আপন পতিরে?

ইন্দ্র : ফের স্ত্রী ফের পতি, এই কদিনেই শেষ হয়েছে মতি।  
শোন এত যদি সংশয়, তবে তারও আছে গতি।  
তোমারো শক্তি দেওয়ার ভান করি, তার কণ্ঠে আসিব রাধি।  
তুমি আকুল ব্রহ্মদেব রক্তবর্ণ করিবে রাধি।  
সেথা উল্লাসের মত অভিশাপ দেবে যত দেব গণে।  
কহিবে দানবরাগে মুক্তি নাহি দলে মরিবে অনশনে।  
এইভাবে মহিষাসুরের আত্মা করিবে অর্জন।  
একদিন আমি গিয়ে করিব তোমার মন ভঞ্জন।

এরপর ভগিনী বলে চাহিবে এক পাত্র পানীয়,  
মহিষাসুরেরে পান করাইয়া করিবে আচ্ছন্ন।  
সেইক্ষণে আমার ঘাতক করিবে প্রবেশ,  
মুহুর্তে ছুরিকাঘাতে অসুরেরে করিবে শেষ।  
তখন আমারে পতিঘাতি করিবে সর্বজন,  
ঘৃণায় অবজ্ঞায় আমায় করিবে বর্জন।  
অহেতুক চিন্তার নাহিক কোন প্রয়োজন  
সেব মহিমা কীর্তন করিতে মর্তে আছে ব্রাহ্মণ  
গাহিতে তাহারা অসুরকিনাশী তুমি মহামায়া  
সর্ব দেব শক্তিতে মিলি রচিত তোমার কায়া।  
তোমার মহিমায় সকলের দুঃখ কষ্ট নাশ হয়,  
সকল কাম্বিত বস্ত্র সহজে হস্তগত হয়।  
তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে  
করিবে তোমার পূজা যুগ যুগ যত্রে।  
এখন স্বর্গর বধিতে মহিষাসুরে করহ গমন।  
রক্ষিতে সৃষ্টি মহিষাসুরে দুর্গা করিল নিখন।

(যনুকের টংকার বাড়তে থাকে ঢাকের শব্দ ও শোনানো যেতে পারে।  
মহিষাসুরের শ্রোত্র ও শোনানো যেতে পারে। তার পর গমন ভেসে আসবে)

আমহদের/ছড়ি রাজা/কোথায় গেলি তুই  
ওদের অত্যাচারে আমরা/বনেতে পালি।  
সেখান থেকে/আমাদের বয়ে।  
কাজ করতে/বাধ্য করে।  
দেয়না মজুরী/বাঁচার মত  
কষ্ট দেয়/আগে কত।  
এখন আছে তির নুকান মধুরের পালকে  
ধনুকে টংকার দিয়ে তোকে বেড়াই ডেকে।  
আগারে ফিরে আমাদের রাজা  
অত্যাচারীকে দিব নাজ।

## সুন্দরবনের বিপন্ন শবর

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

ধর্মতলা থেকে ভূতল বাসে চেপে রামগঙ্গা প্রায় চার ঘন্টার রাস্তা। রামগঙ্গা থেকে ভূটভূটিতে করে চাঁদমারি ঘাটে পৌঁছতে লাগবে প্রায় এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট। সেখান থেকে চার কিলোমিটার হেঁটে সত্যদাসপুর আদিবাসী পাড়া। এই গ্রামটি পাথরপ্রতিমা স্থানার জি-প্রটের মধ্যে। জি-প্রট একটা গ্রাম পঞ্চায়েত। পাথরপ্রতিমা ব্লকের ১২টা বীপের মধ্যে জি-প্রট একটা বীপ। এই বীপে ১১৫টা শবর পরিবারের বাস। লোকসংখ্যা ৬৯৭। আবার রামগঙ্গা থেকে যেয়ায় ১৫ মিনিট বড়চূড়া নদী পার হলে পাথরপ্রতিমা ঘাট। সেখান থেকে ১০ কিলোমিটার গেলে পশ্চিম ছারিকাপুর আদিবাসী পল্লী। ইঞ্জিনভায়েন এক ঘন্টার একটু বেশী লাগে। পশ্চিম ছারিকাপুর আদিবাসী পল্লী পাথরপ্রতিমা গ্রাম পঞ্চায়েত। এটাও একটা বীপ। এখানে আছে ১৪৭ টা শবর পরিবার। লোকসংখ্যা ৭৫৫।

সমস্ত শবর পরিবারই জঙ্গল-নির্ভর। হাত দরিদ্র। খুব ছোট ছোট মাটির ঘর। চালগুড়ো খুব নিচু। সোজা হয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকা যায় না। জানালা নেই। আলো বাতাস ঢোকে না। অন্ধকার। কোথাও কোথাও ঘরগুলো এসেবার গায় গায়। শৌচাগার নেই। আলো নেই। জলের অভাব। এটাই সাধারণ চিত্র। দু-একটা ব্যতিক্রম আছে। সত্যদাসপুর আদিবাসী পাড়ার বনদপ্তর থেকে ১২ খানা ছোট ছোট ঘর বানিয়ে দিয়েছে। ঢালাই পিলার, বাঁশের পোরমা দিয়ে ঘেরা, টালির ছাউনি। একটা পুকুরও কেটে দিয়েছে। গ্রীষ্মে জল শুকিয়ে যায়। ইন্দ্রিয়া আরাঙ্গ বোজালার তিনটি পরিবার বাড়ি পেয়েছেন। ইন্টার সেওয়াল, টালির ছাউনি। কয়েকটা বাড়ি, আইলার পরে, কোম্পানী সংস্থা থেকে সৌর আলো পেয়েছে। ভাঙা-চোরা খড়ের চালে সেগুলো (সৌর প্যানেল) শোভা পাচ্ছে।

পশ্চিম ছারিকাপুর আদিবাসী পল্লীর ৩২টা শবর পরিবারের জন্য, আইলার পরে, সুপেরান ওয়াল্ড মার্ভিসেস ৩২টা ছোট ছোট (১৫ হাত X ১০ হাত) চাল বঁধে দিয়েছে। ছোট ছোট ঢালাই পিলার, মাটির ছিটেবেড়া, আর তিনের চাল।

শবররা যাতে নিজেরা ছিটেবেড়া দিয়ে নেন, তার জন্য লুপেরান ওয়াল্ড সার্ভিসেস, পরিবার পিছু চার হাজার করে টাকা দিয়েছে। যদিও অধিকাংশ চালাই এখনও ছিটেবেড়াহীন উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অতীত-অন্যটনে প্রতিটি পরিবার ধুঁকছে।

আলোচ্য শবর পরিবারগুলো জন্মলগ্ন থেকেই সীমাহীন বঞ্চনা ও শোষণের শিকার। কাঞ্চল দাস (৭৯), গ্রাম: মাধবপুর, থানা: পাথরপ্রতিমা। এখনকার স্থানীয় মানুষ। শবরদের সম্পর্কে খুব খোঁজ বরবর রাখেন। কাঞ্চল দাস তাঁর ববার কাছ থেকে শোনা কথা এবং তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে মিশিয়ে আমাকে শোনালেন। এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন দু'জন। ভূপেন্দ্র নারায়ণ বেরা ও মুরারী জানা। ভূপেন্দ্র নারায়ণ বেরা ছিলেন মাধবনগরের জমিদার, আর মুরারী জানা পশ্চিম ছারিকাপুরের। দু'জনই মেদিনীপুরের জমিদার পরিবার থেকে এসেছিলেন। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে এই সমস্ত জমিদার, এখনকার জঙ্গল কেটে আবাদ করার জন্য ময়ূরভঞ্জ থেকে কিছু আদিবাসীদের এনেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শবররাও ছিলেন। জমিদারবাবুরা নিজস্বের কাছারিতে শবরদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সমস্ত শবররা উদ্যান্ত পরিশ্রম করে জঙ্গল হাঙ্গল করেছিলেন। সেই সময় শবর পরিবারের মেয়েরাও, বাচ্চাদের কাপড় দিয়ে পিঠে বেঁধে নিয়ে, কাজ করেছেন। ঘুমিয়ে পড়লে গাছের জায়গায় শুয়ে দিয়েছেন। নিজের চোখে দেখা, জানাছেন কাঞ্চল দাস। শবররা কিন্তু জমিদারদের কাছ থেকে কোন জমি-জিরেত পাননি। পরিবার নিয়ে শুধু খাওয়া পরাও বিনিময়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছেন। এই সমস্ত জমিদাররা অকপাতিভর আদিবাসীদের স্ব-ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে এনে তাঁদের দিয়ে জঙ্গল হাঙ্গল কনিয়েছেন। তাঁদের শ্রমকে নিষ্কৃতভাবে শোষণ করে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। শবররা তখন নিরুপায় হয়ে রাস্তার পাশে জঙ্গলের গাছ-পাতা (হেঁতাল রোয়ের পিছ) দিয়ে কুঁড়ে বেঁধে থেকেছেন। পরে আনোর জমিতে ভূমিহীন মজুর হিসেবে কাজ করেছেন। বীরা এই সমস্ত সরল, নিরঙ্কর আদিবাসীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন, তাঁরাও শবরদের ন্যায্য মজুরি দিতেন না। আখা-মুল্যে, আখা-পারিশ্রমকে কাজ করাতেন। সারাদিন খাটিলে এক সের চাল অথবা কিছু খুঁদ অথবা কিছু পয়সা দিয়ে বিলম্ব করতেন। যখন কাজ হুঁট না, তখন বাবুদের

কাছ থেকে কিছু চাল অথবা ধান ধার করে নিয়ে আসতেন। যতদিন না শোধ করতে পারতেন, তত দিনই বাবুর বাড়িতে বেগার খাটতে হতো। এভাবে যখন আর চলছে না, তখন এই অঞ্চলের শবররা জঙ্গল-নির্ভর হয়ে উঠতেন। জঙ্গলের মাছ-কাঁকড়া-মধু-কাঠ সংগ্রহই একমাত্র আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়াল। কাঠ কাটা দীর্ঘদিন বন্ধ। মাছ ধরাও বিশেষ হচ্ছে না। এখন কাঁকড়া আর মধুর ওপর নির্ভর। কাঁকড়ার ওপর বেশি।

শবররা এখনও আদিবাসীদের ক্রমাগত শোষিত হয়ে চলেছেন। দু-একটা নমুনা দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। পশ্চিম ছারিকাপুর আদিবাসী পরীতে গিয়ে জানা গেল প্রায় প্রতিটি ঘর ২০০৯ সালের মে মাসের আইলার সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শবররা বলাছেন ক্ষতিপূরণের টাকা তাঁরা এখনও (১২.০২.২০১১) পাননি। কাসেসপ্রাপ্ত ঘরের ওপর অপোস্ত ও আখা-খাঁচড়া কুঁড়ে বানিয়ে কোনক্রমে বাস করছেন। নূনতম সাহায্য বে ত্রিপল তাও বিশেষ জোখে পড়ল না। অনুসন্ধান জানা গেল আবেদনকারীরা প্রত্যেকেই ত্রিপল পেয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলো বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানি। রাস্তাতেই দালালরা ওং পেতে ছিল। নিরঙ্কর, দিগর, সরল, সাবাসিদে শবরদের হাড়িয়া, তাড়ি, মদ, গাঁজা ইত্যাদি খাইয়ে নেশাজন্ত করে পাঁচ-সাতশ টাকা ত্রিপল পঞ্চাশ একশ টাকা দিয়ে কিনে নেয় (বলা ভাল ছিনতাই করে)। এ তো গেল ত্রিপলের কাহিনি। কিন্তু বাঁসের ঘর ভেঙেছে তাঁরা ক্ষতিপূরণের টাকা এখনও পর্যন্ত পেলেন না কেন? খোঁজ নিয়ে জানা গেল পরিবার পিছু (ঘানের বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে) দশ হাজার করে টাকা পাথরপ্রতিমা বি.ডি.ও. অফিসে এসে পড়ে আছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, এই টাকা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নামে জেকে দেওয়া হবে। এটাই সরকারি নিয়ম। তারজন্যে ব্যাংক একটা একাউন্ট খুলতে হবে। এবং সেই একাউন্ট নম্বর বি.ডি.ও. অফিসে জানাতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পঞ্চায়েত অথবা কোন দ্বিতীয় এটা করে দিতে পারেন। ওনলাম একাউন্ট পে-ই (account payee) চেক এর ব্যবস্থা হওয়ায় এই বিপত্তি দেখা দিয়েছে। আনেকের অভিযোগ নগদ নারায়ণ ছাড়া সাহায্যকারীদের সাহায্য পাওয়া ভার।

আরও একটা ঘটনা। ২০০৯-এর আইলার পর পশ্চিম ছারিকাপুর আদিবাসী

পল্লীর ৬২টি পরিবারের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য পরিবার পিছু ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা করে মঞ্জুর হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় বিধায়ক বেনিফিসিয়ারী চিহ্ন করবেন। আর মঞ্জুরীপত্র অর্থে বাড়ি বনিয়ে দেওয়ার কথা পঞ্চায়েত সমিতির। ধূপক দুই রাক্ষসৈনিক মনের। পঞ্চায়েত সমিতির যুক্তি হলো বেনিফিসিয়ারী নির্বাচনের এজিয়ার যখন একমাত্র বিষয়কেন্দ্র, যেখানে তাঁদের কোন ভূমিকা নেই, তখন পঞ্চায়েত সমিতি শুধুমাত্র বাড়ি তৈরি করে নিতে যাবে কেন? ধূপকের টিনাপোড়েনের বাসি গরিব শররয়া। পাথরপ্রতিমা বি.ডি.ও. অফিসে টাকা পাড় আছে। বি.ডি.ও. সারের নিকশায়। টাকা বরফ করতে না পারার গঞ্জনা অন্যতে হচ্ছে। আসন্ন করার আগে বাড়ি তৈরির সম্ভাবনা কী? বহুখানিক আগের ঘটনা। পশ্চিম হারিকাপুর আদিবাসী পল্লীর ১৫-১৬ জন শরর বি.ডি.ও. অফিস থেকে একসঙ্গে চারমাসের বার্ষিক ভাতার টাকা নিয়ে বাড়ি কিনাছিলেন। রাশদা থেকে খোয়ায় করে পাথরপ্রতিমা ঘাটে আসার সময় নৌকের মধ্যে দগলারা এক এক জনের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে তোলা আদায় করে। দুইমুঠ আরও আছে।

এবার একটু অন্য সমস্যার দিকে চোখ ফেলানো যাক। সত্যানুসারে আদিবাসী পাড়ায় একটা স্কুল আছে। নাম : দাদপুর আদিবাসী অর্থতন্ত্রিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। সুন্দর স্কুল। পাকা বাড়ি। প্রত্যেকটা শ্রেণির জন্য আসানি আসানি ধর। শিক্ষকদের বসার ঘর আসানি। শররদের ছোলামেরেরা ফাতে সেরাপড়া শিখতে পারে তাদের জন্য আদিবাসী পাড়াতে এই স্কুল। এখন এই বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১০৪ জন। খাতা বন্ধনে জাদিবাসী ছোলামেরের সংখ্যা ২০ জন। কিছু গড় উপস্থিতি, তাও আবার অনিয়মিত, ৪-৫ জনের বেশি নয়। ১০.০৬.২০১১ তারিখে ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে তিন জন আদিবাসী ছাত্রকে পেয়েছিলাম। দুইজন শিক্ষক (জায়ন্ত পোদ্দার ও বোয়াকেশ জঙ্কাইত) ছিলেন। দুইজনই স্থানীয় যুবক। বিদ্যালয়ে আদিবাসী ছোলামেরদের উপস্থিতি এত শোচনীয় কেন, শিক্ষকদের কাছে জনগণে ত্রয়েছিলাম। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেল—

\* শরর পরিবারের যে-সব ছোলামেরদের বিদ্যালয়ে আসার কথা, তাদের বাপ-ঠাকুরদারার নিষেধ। কেন্দ্রনি লেখাপড়ার ধার ধরেন না। তাই

তাঁরা ছোলামেরদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে আপত্তি আত্মকিক নন। প্রতিটিতে বিন কোন আকর্ষণ করে না। মা-বাবার সঙ্গে জঙ্গল গিরে দুটো কীকড়া ধরায় এসেছে আগ্রহ বেশি। ছোটো বোনা থেকেই এরা নেশার (ভটক, চেনি, জর্ন ইত্যাদি) আসক্ত। তাই পড়াশোনায় অনিচ্ছ। নেশার ধরত জোশানোর অন্য ব্যাকারা কিছু পরসি জোশানোরের প্রবল তালিম অনুভব করে। বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ আপত্তি নেই। মা-বাবা বাড়িতে থাকেন না। যখন থাকেন, নেশায় কঁপ হয়ে থাকেন। এক দিনতে ছোট খুপরি ঘর। অন্ধকার। সকলে এক সঙ্গে বসে দাঁড়িয়ে থাকার পরিসরও নেই।

এ কাপারে এ অঞ্চলের গ্রামজন অঞ্চল প্রধান কাল চন্দ্র মণ্ডলের হস্তমত জনগণে চাইলাম। তাঁর কাকি, আদিবাসী পাড়াতেই। শররদের সম্পর্কে সবচেঁ তর্কই তাঁর নথ্যপত্র। বাংলা বাস, ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। শররদের ছোলামেরেরা ফাতে নিরস্ত্রিত বিদ্যালয়ে যায়, তার জন্য জিপি VEC (Village Education Committee)-র দুইজন করে সদস্য নিরে ডিনাট টিম তৈরি করে দিয়েছিলেন। এক একটা টিম সপ্তাহে দু'দিন করে আদিবাসী পাড়ায় এসে সকল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত থাকতেন এবং ছোলামেরদের স্কুলে পৌঁছে দেন। এইভাবে ডিনাট টিম সারা সপ্তাহ (সোম থেকে শনি) কাজ করেছেন। পর পর তিন মাস কিছুটা সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল। এক দেড় খণ্ডি ফ্রান্সে কঠোরতার পর আদিবাসী ছোলামের স্কুল থেকে পালিয়ে আসতে। কিছুদিন পর তারা আর স্কুলে যেতে চাইতো না। টিমের সদস্যরা যে-সময় পাড়ায় থাকতেন (সকাল ৯টা থেকে ১১টা), সেই সময় কেন ছোলামেরদের পাড়ার মাথা কুঁড়ে পাওয়া যেত না। অন্য জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে থাকতো।

ছোলামেরদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত প্রধান বিভিন্ন যেষাসেরী সন্তোকে বসে বসে, বাতা, পোশাক এবং স্কুল ইউনিফর্মেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবে নিত-তে মিল তো আছেই। কিন্তু এতেও বিশেষ কাজ হয়নি। তখন প্রধান

সাহেব বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভর দেখালেন যে স্কুলে ছেলেমেয়েকে না পাঠালে সপ্তাহের রেশন, কেরোসিন তেল ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে। কেরোসিন ডিলারকে বলে একবার পর পর দু'সপ্তাহ কেরোসিন তেল দেওয়া বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হয়নি।

প্রাক্তন প্রধান, বাদলবাবু, আরও অনেক কথা খেঁদের সঙ্গে জানানেন। অনাদিবাসী মানুষরা নানাভাবে শব্দরদের ঠকিয়েছে। এগুলো তাঁর নিজের চোখে দেখা। কারণ, তিনি নিজে আদিবাসী শব্দরদের সঙ্গে প্রায় চল্লিশ বছর বাস করছেন। নিরক্ষর শব্দররা টাকা পয়সার হিসাব বুঝতেন না। অনাদিবাসীদের বাড়ি কাজ করে মজুরির টাকা ঠিকমত গুলে নিতে পারতেন না। জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে অনাদিবাসী দোকানদারদের কাছেও ঠকেছেন। মাঝ-কাঁকড়া বেচে ন্যায্য দাম পেতেন না। তবে এখন অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। স্বভাব সরল মানুষগুলো এখন প্রয়োজনে প্রতিবাদ করতে শিখেছেন।

বাদলবাবু জানানেন, আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে একটা স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা শব্দরদের ২২ খানা ঘর শৌচাগার সহ বানিয়ে দিয়েছিল। ইটের দেওয়াল আর টালির ছাউনি। অনাদিবাসী দালালরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। শব্দরদের স্বভাব-অনুভবের সুযোগ নিয়ে নামমাত্র মূল্যে ইট এবং টালি কিনে নিয়ে চলে গেছে। শব্দররা ঘরের ইট-টালি বিক্রি করে দিচ্ছেন খবর পেয়ে, বাদলবাবু গ্রামের মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ঐ সমস্ত মালগুলো না কেনার জন্য। ঈশ্বরারী দিয়েছিলেন যদি কেউ কেনেন, জানতে পারলে, সেগুলো আবার বিনামূল্যে শব্দরদের ফিরিয়ে দিতে হবে। তখন বাইরের দালালরা শব্দরদের দেশান্তর করে যাতেব মজুদে মালগুলোকে হাণ্ডিস করেছেন।

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি দুই আদিবাসী পল্লীর পুরুষ মহিলা উভয়ই গভীর জঙ্গলে নিয়মিত মধু ভাঙতে যান। এই দু'মাস জঙ্গলে কাঁকড়া করা বন্ধ। একটা মধু ভাঙার দলে ৭-৮ জন থাকেন। কোন দলে সাধারণত দু'জনের বেশি মহিলা থাকেন না। ৮-৯ দিনের এক একটা ট্রিপ। মৌলেরা জঙ্গলের মধ্যে মৌমাছিক পোকা বলেন। মৌলদের যে সমস্ত কাজ করতে হয় সেগুলো হল মৌমাছি খোঁজা। মৌমাছির গতিপথ অনুসরণ করে মৌচাকের সন্ধান করা। গাছে উঠে মৌচাক কাটা। বগড়াপাতা (হেঁতাল পাতা)

নিয়ে বাড়িয়া (মশাল) তৈরি করা। চাকে জ্বলন্ত মশাল ধরে থাকা। গাছের গোড়ায়, ঠিক চাকের নিচে, সিলভারের ইঁড়ি ধরে মৌচাকের কাটা টুকরোগুলোকে লুফে নেওয়া। লাঠি বাড়ি হাতে নিয়ে পাহারা দেওয়া। পুরুষরা যখন নানা কাজে ব্যস্ত, মহিলারা তখন লাঠিবাড়ি হাতে নিয়ে সতর্ক প্রহারা থাকেন। শব্দর মৌলেরা মনে করেন জঙ্গলের মধ্যে পাহারায় একটু টিলে পড়লেই যে-কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে। তাঁদের ধারণা এ ব্যাপারে মহিলারা বেশি সতর্ক। আরও একটা কাজ বিশেষভাবে মহিলাদের দিয়ে করানো হয়। সেটা হলো মধু ভাঙার পর ফেরার সময় মধুভর্তি ইঁড়ি মহিলারা কাঁকালে করে নিয়ে আসেন। তখন পুরুষরা প্রহারা থাকেন। শব্দররা বলেন পুরুষরা যখন মধুর ইঁড়ি মাথায় নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটেন, তখন তাঁদের গাছের ডালপালায়, ঝোপ-ঝাড়ে বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। নৌকোতে ফিরে মহিলারা রান্না-বাছার দায়িত্ব নেন।

মধুর মরুভূমি বঙ্গের মাত্র দু'মাস। কন দপ্তরের লিখিত অনুমতি নিয়ে তবেই জঙ্গলে মধু ভাঙতে যাওয়া যায়। কেন? জঙ্গলে মধু ভাঙতে হবে সেটা 'পাশে' উল্লম্ব থাকে। শব্দররা সাধারণত যেসব জঙ্গলে মধু ভাঙতে যান সেগুলো হলো বিজয়কিয়া, কলস, বাইশিনখিরা, চুলকাটি, ভুবনেশ্বর, ভাঙরমারি, কারসামারি, তুলিনাঙ্গা, বেলিফুলি, লতাবেড়, বৈঠাভাঙি, কাঁটাগনি, বাতাচিরা প্রভৃতি। আদিবাসী শব্দর মৌলেরা হেঁতাল, গোরান, কেওড়া, বাইন, খোলসে, চাপান, বান, গৈয়ো প্রভৃতি ফুলের মধু সংগ্রহ করেন। তাঁরা বলেন হেঁতাল, গোরান, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি ফুলের মধুর রঙ লাল। খোলসে ও বান ফুলের মধুর রঙ সাদা। গৈয়ো ফুলের মধু তেতো। শব্দরদের অভিজ্ঞতা হলো মধুর মরুভূমি একটু বৃষ্টি হলে ভাল মধু পাওয়া যায়। কারণ, বৃষ্টি হলে জঙ্গলের ফুলগুলো ভাঙলোভাবে ফোটে। তখন চাকে বেশি মধু জমে। কনদপ্তর থেকে একটা ট্রিপে মাঝখিন্দি এক কুঁড়িফুলের বেশি মধু ভাঙার অনুমতি নেই।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা থানার দুটো গ্রামে ১৯৫২ জন শব্দর বাস করেন। এই সমস্ত শব্দররা অনাদিবাসীদের সঙ্গে পাশাপাশি থাকলেও, তাঁরা এক বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে বাস করছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের নিষ্ঠুর শিকার এই শব্দর সম্প্রদায়। শব্দরদের প্রতি অনাদিবাসীদের

উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অবহেলা, শোষণ, লাঞ্ছনা এই বিজ্ঞিততাকে আরও প্রকট করেছে। দারিদ্র ও অশিক্ষা এঁদের নিত্য সঙ্গী। অনাহারের হাত থেকে বাঁচাতে গরিব আদিবাসীদের জন্য যে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা আছে, আমরা খেন সেগুলো থেকে তাঁদের বঞ্চিত না করি। সরকারি সুযোগগুলো হলো বার্ষিকভাতা, বিধবাভাতা, মাতৃকালীন সুবিধা, জন্মনি সুরক্ষা योजना, অন্নপূর্ণা योजना, অস্ত্রোদয়, একশ দিনের কাজ ইত্যাদি। সমস্ত শবর পরিবারকে বিপিএল তালিকাভুক্ত করে, জাতি পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে। যাতে করে শবর পরিবারগুলো সংশ্লিষ্ট সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারেন। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শবরদের ক্রমাগত অবহিত করাই প্রধান কর্তব্য। তবেই এই উদ্দেশ্য অনেকটা সাধিত হবে। এবং শবর সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার হবে যদি এই মানুষগুলোকে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এনে কিছুটা লেখাপড়া শেখানো যায়। অধিকাংশ শবর পরিবার সেই জমি খুঁয়েছেন। কিছু স্বার্থান্বেষী আদিবাসী মানুষ তাঁদের জমি আত্মসাৎ করছেন।

অনেক স্থানীয় ও বহিরাগত আদিবাসীরা যারা শবর সম্প্রদায়ের কল্যাণে কাজ করতে চান, তাঁদের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে শবর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সংগঠন গড়ে তোলা। সেই সংগঠন তৈরি হবে 'জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে জন জাতির উন্নয়ন' তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে। পশ্চিমবঙ্গে মোট শবরদের সংখ্যা ৪৩,৫৯৯ (২০০১)। সমগ্র সুন্দরবনে শবরদের সংখ্যা কত তার হিসেব নেই। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য শবরদের ওপর বিশেষ সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। যার ওপর ভিত্তি করে সুন্দরবনের হাত দরিদ্র শবর পরিবারগুলির যথাযথ উন্নয়ন করা যায়।

## পরিশিষ্ট - ১

একপলকে সুন্দরবনের জনসংখ্যা : অতীত ও বর্তমান

|                            | ১৯৯১    | ২০০১    | ২০১১    |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| মোট জনসংখ্যা               | ৩১৫৪৮৯০ | ৩৭৫৭৩৫৬ | ৪৪২৬২৫৯ |
| পুরুষ                      | ১৬২৪৪৩২ | ১৯৩২৪০১ | ১১৬৪১৩৩ |
| মহিলা                      | ১৫৩০৪৫৮ | ১৮২৪৯৫৫ | ২১৬২১২৬ |
| পুরুষ (শতাংশ)              | ৫২.৪৯   | ৫১.৪৩   | ৫১.১৫   |
| মহিলা (শতাংশ)              | ৪৭.৫১   | ৪৮.৫৭   | ৪৮.৮৫   |
| তপসিলি জাতিভুক্ত           | ১২৭৭৩৬৭ | ১৩৯৬৬৪৮ | ১৫৭৩৮৫৯ |
| তপসিলি উপজাতিভুক্ত         | ১৫৩০৮৮  | ১৮০৪২৯  | ২১১২২৭  |
| তপসিলি জাতিভুক্ত (শতাংশ)   | ৪০.৪৯   | ৩৭.১৭   | ৩৫.৫৮   |
| তপসিলি উপজাতিভুক্ত (শতাংশ) | ৫.০৪    | ৫.২২    | ৪.৭৯    |
| মোট সাক্ষর                 | ১২০৭৭৯৪ | ২০২৮২০৮ | ২৮৪৬০৬১ |
| সাক্ষর (পুরুষ)             | ৮১৭৬৯২  | ১২২৮৫১৮ | ১৫৯২২২৭ |
| সাক্ষর (মহিলা)             | ৩৯০১০২  | ৭৯৯৬৯০  | ১২৫৩৮৩৪ |
| সাক্ষরতার হার              | ৩৮.২৮   | ৫৩.৯৮   | ৬৪.৩০   |
| পুরুষ সাক্ষরতার হার        | ৫০.৩৪   | ৬৩.৫৭   | ৭০.৩২   |
| মহিলা সাক্ষরতার হার        | ২৫.৪৯   | ৪৩.৮২   | ৫৭.৯৯   |
| মোট কর্মরত জনসংখ্যা        | ৮৪২৪২৯  | ১০০২৯১৯ | ১৬৬২৪৩৩ |
| মোট কর্মরত পুরুষ           | ৭৯২১০৭  | ১০০৯১৬৬ | ১২৬৮০৯২ |
| মোট কর্মরত মহিলা           | ৫০৩২২   | ২৩৬৭৭৫৩ | ৩৯৪৩৪১  |
| কর্মরত জনসংখ্যা (শতাংশ)    | ২৬.৭০   | ২৬.৬৮   | ৩৭.৫৬   |
| কর্মরত পুরুষ (শতাংশ)       | ৪৮.০২   | ৭৭.৪৫   | ৭৬.২৮   |
| কর্মরত মহিলা (শতাংশ)       | ৫.৯৮    | ২২.৫৫   | ২৩.৭২   |

সীতানো : শুধু সুন্দরবন চর্চা, দ্বিতীয়বার, প্রথমসংখ্যা, ১৫ অক্টোবর ২০১৩

পরিচিতি - ২

2007-2008

1997

## References

July 2007

"Beliefs"

[illegible]

২৭৮  

७ - विद्यार्थी

9

Table 3 (continued)

[illegible]

290

# বাড়ির অঙ্গন থেকে পথে-ঘাটে শনিপূজার তাৎপর্য

ধীরেন্দ্রনাথ বান্ধে

কলকাতার রাজপথে মৌরসী পট্টা প্রায় ভাঙতে চলেছে। নতুন ভাগীদার হয়ে দাপটের আসর জমিয়ে তুলেছে শনিঠাকুর। কলকাতাসহ পার্শ্ববর্তী শহরতলী একবার ঘুরে দেখলেই তা বোঝা যায়; অবশ্য সমস্ত শনিথানের হিসাব দেওয়া কঠিন। কারণ, শনিসুমারীর সুযোগ ঘটেনি। তবে কলকাতার উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব অংশের প্রধান রাজপথগুলিতে শবুন বাহন দেবতাটি যেখানে-সেখানে আস্তানা গেড়েছেন। সে সব অঞ্চলের সামাজিক গতিবিধির পরিচয় পেলেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, জনসাধারণের কোন অংশের ভক্তিরসে শনিঠাকুরের কৃষ্ণাসক্তি শীসে জলে পুষ্ট হয়ে উঠছে। প্রধানত হকার অধ্যুষিত অঞ্চল আর নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির ভাল গতিবিধি আছে এমন অঞ্চলগুলিতে যেমন—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, মনিকস্তলা রোড, বাগমারী বাজার, মধ্য কলকাতার হাজানন্দ পার্ক, দুর্ঘসেনা স্ট্রিট, বৌবাজার, শিয়ালদহ, দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া থেকে টালিগঞ্জ কাঁড়ি পর্যন্ত রাস্তার যে সব শনির থান গড়ে উঠেছে, সেগুলি যে কোন পথচারীর চোখে না পড়ে পারে না। কোথাও শুধু শনিবার রাস্তার নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে পূজা হয়, কোথাও স্থায়ী বেশী, আবার কোথাও স্থায়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। যে ভাবেই হোক টাকা-সিকেত ভর্তি প্রণামীর থালা লক্ষ্য করলেই ক্রমবর্ধমান শনিভক্তির স্বাক্ষর মিলবে।

পাশাপাশি—আরও একটি বিষয় চোখে পড়ে যে, কতকগুলো অঞ্চলে শনিপূজার প্রাদুর্ভাব নেই বললেই চলে। যেমন—হাসেল স্ট্রিট, হো-টি-মিন সরণি, আলিপুর রোড, বর্ধমান রোড, মোধপুর পাক, হুইড রোড, পোর্ট এন্ড্র্যাকাসহ বিভিন্ন অভিজাত অঞ্চলে ও শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে শনির থান নেই বললেই চলে অথবা কোথাও বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বৃন্দাটী টিম টিম কনছে।

সমস্ত অঞ্চলেই বিভিন্ন জাতিসত্তা, ধর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মানুষ বসবাস ও

বাড়ির অঙ্গন থেকে পথে-ঘাটে শনিপূজার তাৎপর্য

যাতায়াত করেন—একথা মনে রেখেও শনির রমরমা হীনগুলো বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না সমাজের কোন অংশের ও স্তরের মানুষ গত কয়েক দশক ধরে শনিঠাকুরকে খুশি করার চেষ্টায় উৎসুক হয়েছে? এভাবে কলকাতার শনি রোগাক্রান্ত ও রোগমুক্ত অঞ্চলের সাধারণ যে ছবি পাওয়া যায় তাতে লক্ষ্য করা যায়, যে অংশে ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের বসবাস ও যাতায়াত সেই অংশে এবং যেখানে হাজার হাজার শ্রমিকের যাতায়াত বা বসবাস সেই সেই অঞ্চলে শনিরোগের সংক্রামণ কম। তাহলে শনিরোগের প্রতিপত্তি বেশি কোথায়? এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, বিশেষ করে হকার অধ্যুষিত অঞ্চল ও খুদে ব্যবসায়ী, ছোট চাকুরিখীবীর গতিবিধি বেশি, সে সব অঞ্চলেই শনির থানগুলি গড়ে উঠেছে। এই স্তরের জিন্নমূলগামী গণঅংশের মধ্যেই এই দেবতার প্রতিপত্তি ক্রমবর্ধমান। কোথাও কোথাও তো হকার সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় বারোয়ারি পূজার প্রচলন হয়েছে। মেটকথা—হকার, খুদে ব্যবসায়ী, বাজারে ফড়েগিরি ও দলদলি করে ফিরা টুকটাক কাজ করে, এই সমস্ত নিম্নবিত্ত স্তরের মানুষের মধ্যেই শনিঠাকুরের প্রতিপত্তি বেশি। এখানে বলে রাখি, মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষের একটা বড় অংশ এই গণস্তরে পতিত হয়েছে এবং তা হয়েছে অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলেই। এরই ইনানিং শনিঠাকুরকে খুশি রাখতে বেশি আগ্রহী।

শনিঠাকুরের এই রমরমা জৌলুস সাম্প্রতিক। এর পূর্বে শনি পূজা প্রধানত পূর্ববঙ্গ থেকে জিন্নমূল হয়ে আসা পরিবারগুলোর বাড়ির অঙ্গনে অনাড়ম্বর পাঁচালি পড়ার মধ্য দিয়ে ঘরোয়াভাবে অনুষ্ঠিত হত। তবে দেখা যায় কয়েক দশক আগে থেকেই শনিদেব অঙ্গনে থাকতে না পেরে প্রকাশ্য রাজপথে নেমে এসেছেন। হাজারেই গণ্য আগে, তাহলে কি শনির এই রমরমার কারণ বাড়ির অঙ্গন থেকে রাজপথে নেমে আসারই? রাজপথে শনিদেব নেমে আসার ফলেই কি সমাজে নিম্নবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব? এ দুটি প্রশ্নই এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর অনেকেই বলতে পারেন যে কিছু মানুষ পরস্পর ব্রোজধারের ধানদান থান পেতে বসেছে। আসলে কি তা সম্ভব? পরসার ধানদান যে কোন ঠাকুরের থান পেতে বসলে কি সফল হয়? তাহলে আরও তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর অন্য যে কোন ঠাকুরের থান পেতে বাধ্য কেওয়ার? অর্থাৎ এত দেবতার বিশেষভাবে শনির পুনরুত্থানই যে ধর্মজীবনে বিশেষ সাম্প্রতিক

বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছে তাকে 'পরসার ধান্দা' দিয়ে ব্যাখ্যা করা বাতুলতা হবে। জনগণের বা তার কোন অংশের মধ্যে বিশেষ ধরনের ধর্মের বা দেবতার চাহিদা না থাকলে তা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যারা কোনও নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন কিংবা নতুন মোড়কে পুনঃপ্রবর্তন করেন তারা মানুষের মনের এই সুপ্ত চাহিদাকে অনুভব এবং সাদা দেন। এ সম্পর্কে ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসের বক্তব্য—“ধর্মগুলি এমন লোকেরাই সৃষ্টি করেন যারা নিজেরা ধর্মের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং জনগণের ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তাগুলি সম্বন্ধে যাদের উপলব্ধি রয়েছে।”

গ্রিস, মিশর ও ভারতে নানা বিশ্বাসের উদ্ভব, পুরানো দেবতার অন্তর্ধান, নতুন দেবতার আবির্ভাব কারো খুশিমত হয়নি, সেই সমকালীন চরিত্রবিশিষ্ট দেবতা, ধর্মের চাহিদা, জনমানসেই বিকাশ ঘটেছিল। এই চাহিদার উদ্ভব কোন বিশেষ অবস্থার প্রতিফলন সে কথায় পরে আসছি। এখানে এটুকু বলা যায় যে, যাটের দশক-এর শেষ থেকেই কলকাতা শহরতলী অঞ্চলে শনিদেবের মত চরিত্রবিশিষ্ট দেবতার চাহিদা বেড়েছে যে দেবতা কৃষ্ণের মত মধুর নয়, গনেশ বা শিবের মত আশুতোষও নয়, কোমল বা উদার চরিত্রের কোনও দেবতা নয়।

#### শনিদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

শনি পাঁচালিতে জানা যায়, সুমঙ্গল নামে এক ব্রাহ্মণ তার গুরু হয়েও রেগেই পায়নি। গঙ্গাতীরে শনিমন্ত্র জপ করতে গিয়ে নিয়মভঙ্গ হওয়ার জন্য শনিঠাকুর তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীবৎসরাত্র ব্রাহ্মণকে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। পরে পুজো পেয়ে শনিদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বিপদমুক্ত করে দেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ কোপন স্বভাবের এই দেবের কোপদৃষ্টি যার উপর পড়ে তার সর্বনাশ। এটা সহজেই বোঝা যায় শনি পাঁচালিতে ছেড়ে ছেড়ে, যেমন—

অভক্তি করিয়া যেবা প্রসাদ পাইবে।

অক্লান্তে শমনের ভবনে সে যাবে।

আমার পূজার যথা করে আদার।

চিরকাল দুঃখ পেয়ে হইবে কাটার।

সর্বদা শনির পদ থাকে যার মনে।

উদ্ধারে বিপদ হতে পড়িলে শমনে।

শনির পাঁচালী যেবা রাখিবে ভবনে।

কখন না পড়ে সে বিপদ বন্ধনে।

শনি প্রণমিয়া যেবা নিজ কার্যে যায়।

সমাদর করে তারে রাজার প্রজায়।

এই ধরনের কোপন স্বভাব দেবতার চাহিদার যে এক স্তরের মানুষের মধ্যে দানা বেঁধেছে তাদের চাহিদা মিটিয়েছে প্রকাশ্য রাজপথে একের পর এক শনিঠাকুরের থান। প্রগা উঠতে পারে—হকার, খুদে ব্যবসায়ী ও ছোট চাকুরীদের মত নিম্নমধ্যবিত্তদের মনে এই ধরনের কোপন স্বভাব দেবতার শরণ নেওয়ার ইচ্ছা জোগে উঠল কেন? এই ইচ্ছেটাকে শুধু ইচ্ছে দিয়ে বোঝা যাবে না। এই ইচ্ছার শিকড় জীবনের যে বাস্তব মাটিতে রয়েছে সেখানে তলিয়ে থুঁজতে হবে। মানুষের চিন্তা-ভাবনা সংস্কৃতি সবকিছুই বস্তুজগতের কোন না কোন ধরনের প্রতিফলন। ধর্মও তাই। তবে ধর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে প্রতিফলনটা সোজাসুজি নয়, ওলটানো; বাস্তব নয় অলীক। ধর্মে পার্থিব শক্তিই যদি অতিপ্রাকৃত শক্তির চেহারায় প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তাহলে অতিপ্রাকৃত শক্তি শনিঠাকুর কলকাতায় কিভাবে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করল তার রহস্য সম্বন্ধে বলতে হলে দেখতে হবে আদি ও সমসাময়িক পার্থিব ও সামাজিক শক্তিগুলো কি—যা শনিঠাকুরের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব।

#### শনিদেবের আদি প্রতিপত্তি

এ সম্পর্কে শনিদেবের প্রতিপত্তির আদিবর্তী (প্রায়শঃ ১৭ শতাব্দী) সময়কালকাল অজবিতর পরিচয় মেওয়া দ্রোত পারে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের মত মধ্যযুগেই পাঁচালির দেবতা শনিও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের ন্যায় শনিও জোর করে পুজো আদায় করেন, না হলে হিংস্র হয়ে ওঠেন এবং ভীষণতঃ ঘৃণা চরিত্তে ছাড়েন। এইজন্যই মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের সাথে শনি-চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের এ রকম হিংস্র হওয়ার সামাজিক কারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

“তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-পীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ত্রীকণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথাকিৎ সাফল্য লাভ

করিতেছিল এবং দুখ-ক্লেশকে ভাসিয়া ভক্তির বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল।”

মঙ্গলকাবের দেবতাদের তুলনায় শনি আরও ভয়ানক ও হিংস্র। মহামারীর প্রতীক, শব-ভোজী শব্দন তার বাহন। কারণ, এইরকম একটা সর্বনাশ যুগেই শনি-পাঁচালীর প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে শনির পাঁচালী রচিত হয়েছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শনিকে নিয়ে পাঁচালী লেখার মত উপাদান ও প্রতিপত্তি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পাওয়া যায়। নবাবী বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দী, বগী ভাস্কর পণ্ডিতের অত্যাচারে অষ্টাদশ শতাব্দী, দেবী সিংহের কৃষক নির্যাতনের এবং পুরানো সামন্ত শাসন ও নতুন ইরোজ শাসনের সন্ধিক্ষণ এই অষ্টাদশ শতাব্দী। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের লুপ্তন, অস্বাভাবিকতা, হাহাকার, আকাল আর সর্বনাশের পটভূমিতে শনিদেবের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজের বাস্তব চেহারাতেই শনির অতিপ্রাকৃত শক্তির আকারে প্রতিফলিত হয়েছিল।

#### বর্তমানে শনি-প্রতিপত্তির পটভূমি

গত কয়েক দশক থেকে শনি-প্রতিপত্তির উপর আলোকপাত করা যাক। গত দশ-বারো বছরে শনিদেবের ক্রমপুনরুত্থানের পটভূমি কি? আমরা দেখেছি ষাট-এর দশকের শেষ থেকে অর্থনৈতিক সংকটের ভয়াবহতা ক্রমবর্ধমান আকারে গরিব মধ্যবিত্তদের জীবনে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ফলে, এই অংশের মানুষের জীবন মন ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলি বিপর্যস্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক জীবনবোধ দ্রুত উল্লাসিক চরিত্র ধারণ করেছে।

বড় ব্যবসায়ী শ্রেণি মন্দা বাজারের চাপটা খুঁতে ব্যবসায়ীদের উপর চাপিত দিয়েছে। প্রত্যেক ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার দরুন ছোট ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বাজার আরও সংকুচিত হয়েছে, কিস্তিতে কিস্তিতে মালের টাকা পরিশোধ হচ্ছে। অথচ, মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোনো ক্ষমতাই তাদের হাতে নেই। বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ফলস্বরূপ দ্রুত উপর অস্বস্তিভাবে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। খুদে ব্যবসায়ীর জীবন ও জীবিকার উপর পুঞ্জির ও ফটকাবাজীর এই আক্রমণ একটা সর্বনাশ চেহারা নিয়েছে। পুঞ্জির আক্রমণে জনগণের এই স্তরের নিরাপত্তা ও

নিশ্চয়তার যে শিকড় শিথিল হয়েছে, শাসকশ্রেণির সন্ত্রাস তাকে নাড়া দিয়ে গেছে। পুলিশের জনবিরোধী ভূমিকা, জোর করে ধূষ আদায়ের চাপ, ফুটপাথ মুক্ত করার নামে হুলাওয়ার যোগে হামলা সমাজবিরোধীদের তোলা আদায়, এর উপর রং-বেরং-এর হকার নেতাদের বক্তৃতা দান এদের জীবনের স্থিতি ও নিরাপত্তাকে তরুণ করে দিয়েছে। পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের উপদ্রবও হয়তো তাদের সহ্য হত যদি মন্দা বাজারের চাপ তাদের জীবনের ভিতকে নাড়িয়ে না দিত। পুঞ্জি ও ফটকাবাজির অপ্রত্যক্ষ আক্রমণের সাথে সমাজরক্ষক ও সমাজবিরোধীদের হামলাবাজি তাদের কাছে শাকের আঁটির মত অসহনীয় হয়ে পড়েছে। মূল্যবৃদ্ধির চাপে ছোট চাকুরীদের নুন আনতে পাওয়া কুরায়। পাড়ায় পাড়ায় সর্বত্র নব নব রূপের আক্রমণ সর্বত্র অনিশ্চয়তার আবহাওয়া গড়ে তুলেছে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেও এরা কখনও সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। শ্রেণিগত অবস্থানের জন্য এই শ্রেণির মানুষের নিজস্ব নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ফলে, নতজন্ম হয়ে আত্মসমর্পণ ও পান থেকে চুন খসার ভয়ে সদা সমুদ্র ধাক্কাই সাময়িকভাবে এদের ভবিতব্য। সর্বনাশা শক্তিগুলো কি চেহারা নিম্নমধ্যবিত্তের মানসালোকে প্রতিফলিত হতে পারে? সমাজরক্ষক, সমাজবিরোধী, পুঞ্জিপতি, মহাজনদের পরস্পর সংযোগ কি রাধাকৃষ্ণ যুগলমিলনের চেহারা দেখা সম্ভব না শব্দ বাহন শনিই একে অতিপ্রাকৃত ভাবে প্রতিফলিত করতে পারে? বরভয়বাজী লক্ষী নয়, প্রতিহিংসপরায়ণ শনি; অগ্নি তুষ্ট শিব নয়, ছিরাচোষী কোপনরূপের শনির মাথায় অতিপ্রাকৃত আকারে জমজীবন বিপর্যস্তকারী শক্তিগুলোর প্রতিফলনকে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান স্তরে এই বাস্তব পটভূমিতেই শনিঠাকুরের সময়মা ও জীকর্মকের ব্যাখ্যা মেলে।

নিম্নমধ্যবিত্তদের শ্রেণিভিত্তিক কারণ হিসাবে যে বিশ্লেষণ দেওয়া হল, তার থেকে এ প্রস্তাব বেরিয়ে আসতে পারে যে, বাইরের শক্তিগুলি জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে অথচ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে মধ্যবিত্তদের এই অংশ যদি শনির চরণে শরণ নেয়, তবে ধনিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মাঝেই বা শনি পাওয়া পাবে না কেন? তাদের কি অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব নেই? সকলেই জানে পুঞ্জিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মাঝেই যে সংকটের বীজ আছে তাতে মন্দা বাজার, প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া দেউলে হয়ে পড়া এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা

\* আত্মত্যাগ ভয়ানক : বাংলা মঙ্গলকাবের ইতিহাস, পৃ-৮।

পুজিবাদী শ্রেণির থাকে না, ফলে এই শ্রেণি তাদের সম্বন্ধেই যথেষ্ট চিন্তা করে। শ্রমিকশ্রেণিসহ জনগণের কাছে। এই কারণেই মূল্যবোধ, ঈর্ষা, লে-অফ, লক-আউট তালাবন্দির ঘটনা বেড়ে চলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পুজিবাদী ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি কোন শ্রমের চরণে শরণ নেয় না। অর্থাৎ, তারাও সমাজগত অতিপ্রাকৃত শক্তির শরণ না নিয়ে তারা প্রকৃতির উপর নামিয়ে আনে নিপীড়ন ও বঞ্চনা।

অপরদিকে শ্রমিক শ্রেণির জীবনে অনিশ্চয়তা ব্যাপক, তারা সংগঠিত শিল্প ব্যবস্থায় তাদের জোট বাঁধতে শিখিয়েছে। তারা উন্নত চেতনার দ্বারা পরিচালিত হতে শিখেছে। গড়ে তুলতে পেরেছে সর্বাত্মক প্রতিরোধ। মনব জগতের এক ব্যাপক অংশে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তার আন্তর্জাতিক ভিত—পুজিবাদী জগতের বিরুদ্ধে। ফলে, তার লড়াই করার উপর ভরসা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, অতিপ্রাকৃত শক্তির শরণ নিতে তাকে হয় না।

এর কারণও খুঁজে পাওয়া যাবে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই। যে ধর্মবিশ্বাস শনি, সারী, লক্ষ্মী, গণেশ ইত্যাদি নানা দেবদেবীর মধ্যে এক-একটি প্রাকৃতিক বা সামাজিক শক্তির প্রতিকলন দেখাতে চায়, তার ভিত্তি নিহিত বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ কুপমন্তুক সমাজ ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে। এ ধরনের সমাজের প্রতিকলনই সমাজে হাজার গুণা দেব-দেবীর কল্পনার মধ্যে প্রকাশ পায়। উৎপাদন ব্যবস্থা বিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মবিশ্বাসেরও আবরণগত পরিবর্তন ঘটে। পণ্য উৎপাদনশীল সমাজব্যবস্থায় বা পুজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হয়, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিগত শ্রম আর ব্যক্তিগত থাকে না, সম্পূর্ণ মানবিক শ্রমের সাথে তার বিমূর্ত্তবরণ ঘটে। এই বিমূর্ত্ত মানুষের প্রতিকলন হিসাবে 'দর্শনজ্ঞান' আর 'ঈশ্বরের বাগান' দেখা দেয়।

ধর্মবিশ্বাসের এই বস্তুগত ভিত্তি মনে রাখলে দেখা যায়, কোনও উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত শ্রেণি পিছিয়ে-পড়া ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি শনিজাতীয় দেবতার চরণে মাথা নোয়ারনি। পুজিপতি শ্রেণির কর্মজীবনের বরতর হিসাবে রয়েছে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে মিশ্রণভেদ্য ধর্মভঙ্গুর আর শ্রমিক শ্রেণির রয়েছে সর্বত্রেরা বিশ্বদর্শন।

অন্যদিকে মনোবিশ্ত জীবনস্তরে মানুষের ক্রমগত সন্নিবেশের ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসাবেই শনিজাতীয় মধ্যযুগের দেবতা উপলব্ধ হয়েছে। ফলে, মনন থেকে রাজস্বপ্নে শনিসেবের রমরমা।

— চরন—

## আধিপত্যবাদ ও সমাজতন্ত্র

মনোহর মৌলি বিশ্বাস

আধিপত্যবাদ হল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রক্রিয়া, তা সে রাজনৈতিক ক্ষমতা হোক, অর্থনৈতিক ক্ষমতা হোক, সামাজিক ক্ষমতা হোক, শিক্ষাগত ক্ষমতা হোক, সাংস্কৃতিক ক্ষমতা হোক—যে কোনও ক্ষমতাকে কেন্দ্রবিন্দু (centripetal) করাই আধিপত্যবাদের কাজ। রাজ্যটির সমাজ সার্বিকভাবে ভারতীয় সমাজের অন্তর্গতবাদের বুনটটি এমন তা সে আধিপত্যবাদকে সম্বল পালন পোষণে অভ্যস্ত এবং এই আধিপত্যবাদের আকরভূমি মূলত হিন্দুসমাজের কর্তব্যবস্থা। প্রতিটি মানুষ চরিত্রগতভাবে আধিপত্যবাদের প্রতি আসক্ত—অনুক্রিয়াকর্তন। কবি বিনয় মজুমদারের কথায়—

ইতস্তত অসুস্থ কুকেরা

পৃথিবীর পরবিত ব্যাপ্ত কনকলী

দীর্ঘ দীর্ঘ ব্রহ্ম শ্বাসে আলোড়িত করে;

এবং সব বৃক্ষ আর পুষ্প যে যার ভূমিতে দূর দূরে

চিরজল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসপ্রাণী কথা।

সমাজের প্রতিটি মানুষ একে অন্যের পাশাপাশি থাকে, একে অন্যকে চেনে, জানে, বেছে নেয়, কিন্তু কেউ অন্যকে নিজের অধিকার-সম্বন্ধে প্রবেশ করতে দেয় না, দিতে চায় না। এই অধিকার সম্বন্ধেই না বলে বরং 'আধিপত্যবাদ' শব্দটি ব্যবহার করতে আমি বেশি আগ্রহী। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে তার কূলে প্রবেশ করতে দেয় না—দিতে চায় না, ক্ষত্রিয় কৈশিককে তার কূলে প্রবেশ করতে দেয় না—দিতে চায় না, বৈশ্য শূদ্রকে তার কূলে প্রবেশ করতে দেয় না—দিতে চায় না। শূদ্রের কেলায়। ব্যক্তিগত কেবল। অন্যরা কেউ শূদ্র হতেই চায় না—শূদ্রের মধ্যে যদি আছে, মালিন্য আছে, কৃশা আছে—তাই সে রাজ্যে কেউ প্রবেশে আগ্রহী হয় না। আসলে হিন্দুসমাজের কর্তব্যবস্থা জন্ম দিয়েছে আধিপত্যবাদের, সামাজিক সংগঠন ভোগের, আর্থিক স্বাধীনতা ভোগের, সংস্কৃতির কর্তব্য হলে ওঠার, রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়া ওঠার। আধিপত্যবাদ এমনি জিনিষ তার বিরুদ্ধে কথা বললে

ভোগান্তিতে পড়তে হয়—শক্তি ভোগ করতে হয়।

পঞ্চাশত্রে এমনটাও ঘটেছে আবার। শিক্ষার ও ধন-সম্পদের নিম্নবর্ণের থেকে কেউ উপরে উঠলে তার মধ্যেও প্রভুত্ববাদ আসন করে নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি স্মরণ করা যায়। তিনি বলেন, 'গড়ে ওঠা নিয়মের আদর্শগত আধিপত্যবাদ, বলতে বিধা নেই, তাদের কল্পনার ভূমির সীমারেখা কর দিয়ে এবং নিম্নবর্ণের থেকে যারা শেষমেঘ উঠে আসছে উপরের দিকে, তাদের আতঙ্ক করে নিচ্ছে দলে। এই ঘটনা তর্কের খাতিরে বলতে অসুবিধা থাকে না, নিম্নবর্ণের মধ্যে গড়ে ওঠা আধিপত্যবাদ দলিতদের প্রতিবাদ আন্দোলন দুর্বল করে নিচ্ছে, কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়ে এমনটা নয়।'

ভারতের সাহিত্যভূমিতে বর্ণব্যবস্থা জন্মলাভ করেছে হিন্দুধর্মের আকরগ্রন্থ বেদের উদর থেকে। পর-উপকালে একগুচ্ছের মুনিব্রহ্মসহ স্মৃতিকারদের হাত ধরে ধন, সম্পদ, শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ সর্বাধিক ক্ষমতা কেন্দ্রানুগ করা হয়েছে সবলদের হাতে। ধন-সম্পদ-শিক্ষা-সংস্কৃতি এগুলি হল আধিপত্যবাদ ধরে রাখার উপকরণ। আর এই সব উপকরণগুলি যে মূল স্তরের চারপাশে ঘোরাফেরা করে তার নাম রাজনীতি বা রাজনৈতিক ক্ষমতা।

আধিপত্যবাদ ভাঙার কাজটাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে সব থেকে বড় ভূমিকা পালন করে। ইতালি দেশের মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) সে দেশের এক ছোট ও অখ্যাত বীণা সানিনিয়াতে জন্মেছিলেন। 'নাস ইতালির বৈষম্যমূলক প্রশাসনে ও শোষণে সানিনিয়ার অবমাননা, দুর্বোধ্য অর্থনৈতিক অবলম্বনে সে ক্ষোভ জন্ম হয় তা অন্তর্ভুক্তই সানিনিয় জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়।' এই জাতীয়তাবাদ নিম্নলিখিত ভাষায়, 'সংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা মনন-মিলা ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রামসিই সর্ব প্রথম সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ (Cultural Hegemony) ভাঙার কথা শুনিয়েছেন।

ভারতেও উচ্চবর্ণীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর লড়াই এক দীর্ঘ ইতিহাস। সেই লড়াইয়ে প্রবাদ-প্রতীম হয়ে উঠেছেন ড. বি. আর. আম্বেদকর। জনৈক ছিলেন মহাপ্রদেশের ছোট্ট সছর মৌ-এর সেনা ছাউনিতে এক অজস্র কর্মচারী রামজি শকপালের গৃহে, ১৮৮১ সালের ১৩ এপ্রিল। ইতালির গ্রামসি ছিলেন তাঁর থেকে বয়সে মাত্র তিন মাসের বড়। দু'জনের মধ্যে একটা বড় মিল

উভয়েই মেধাবান মানুষ। ড. আম্বেদকরের প্রতিভা ছিল আন্তর্জাতিক মানের—আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. এবং পিএইচডি করার পরে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে ডি এসসি করেছিলেন।

দু'দেশের আধিপত্যবাদের মধ্যে চেনারাপত কোনও মিল নেই। ইতালির মানুষের কাছে বর্ণভেদ কী, তার সাথে কোনও পরিচয় নেই। আর ভারতে বর্ণবাদ এমন এক বস্তু যে অস্পৃশ্য সমাজের মেধাবান মানুষ অতি সহজেই মেধাহীন হয়ে পড়ে। নিম্নবর্ণের জন্মানোর কারণে কলঙ্কে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয় তাদের। উচ্চবর্ণ আধিপত্যবাদ তার মূল কারণ। এন ডি কাঞ্চলের প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে একটা উদাহরণ নেই। বাঙলা তর্জমা না করে ইংরেজি অংশ সরাসরি তুলে দিলাম।

The Mahars were the marshall race and original inhabitants of Maharashtra. Therefore, they are known as Bhoomi Putra which means the son of the soil or nature they served mostly in armies and held many important positions in Maratha, Muslim, Moghul, British and independent Indian armies. They fought many wars and conquered many territories. In spite of their bright army carrier, they could not become rulers in medieval and modern period because they were put in the category of Avarnas. According to religious scriptures Avarnas could not become anything else but servants and serfs. Their social status pulled down their army and economic status also.

উচ্চবর্ণীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর লড়াই মহাপ্রদেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস হয়ে উঠেছে, তার কারণ ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক মানের পণ্ডিত ছিলেন এবং তার কলমে শক্তিতে সকল বিষয় ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হতে পেরেছিল। ড. আম্বেদকরের অনেক আপে তামিলনাড়ুতে অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর লড়াই এবং মূলত উচ্চবর্ণীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই বোধকরি আরও অনেক বড় ইতিহাস। অস্পৃশ্য পারাইয়ার (Parayar) জনগোষ্ঠী নেতা অহিওথী থাস (১৮৪৫-১৯১৪) যার আসল নাম ছিল কথাকারিয়ান, তিনি ছিলেন তামিল সাহিত্যের বিশিষ্ট মানুষ। তামিল,

ইংরেজী, সংস্কৃত ও পালি ভাষার কথা বলতে পারতেন।

বিশ্ববী চরিত্রের এই মানুষটি পঁচিশ বছর বয়সে ১৮৭০ সালে নীলগিরি পাহাড়ের টোডা ও অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৮৭৬ সালে সংগঠিত হয়ে তারা একটা বাহিনীতে পরিণত হয়ে যায়। ১৮৮৬ সালে তিনি ঘোষণা করেন, অস্পৃশ্যরা হিন্দু নন। ১৮৯১ সালে জনগণনা কমিশনে অস্পৃশ্যরা বর্ণবিহীন (caste less) বলে দাবি করেন। ১৯০৭ সালে জুন ১৯ তারিখে 'ওরা পরস্যা তামিকান' নাম দিয়ে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। উচ্চবর্ণীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। 'Iyothee Thass is perhaps one among the several dalit icons whose names have been blacked out by the mainstream history'

আইওথী খাসের সময়ে সেনাকেন 'নন-ব্রাহ্মণ ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ করা হয়েছিল এবং তা জন্ম দিয়েছিল এক প্রবল সামাজিক ঝড়ের। নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক অ্যানী ব্যাসান্ত এই ম্যানিফেস্টোর বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। "When the NON-BRAHMIN MANIFESTO was released for public debate and scrutiny in December 1916 Annie Besant, editor of New India (NI) and patron saint of the national Home Rule movement denounced its contents and stated intentions in strident terms. She Characterised the Manifesto as 'mischievous and unpatriotic' and claimed it had been authored by 'short-sighted narrow-minded people's whose chief objective was to 'denounce the work of National Congress and the Home Rule Movement' "

এই উদ্ধৃতিটি থেকে বোধকরি একথা স্পষ্ট হয় যে উচ্চবর্ণীয় আধিপত্যবাদ অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর মানুষদের প্রবলভাবে দখল করেছিল এবং তারা বর্ণবিষয়ে নিগূহীত হয়ে এতটা কষ্ট পাকিল যে ব্রিটিশের পরাধীনতা থেকে তাই অস্পৃশ্যদের কাছে বর্ণভেদের ঘৃণা ও অত্যাচার অধিকতর কষ্টদায়ক মনে হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্যে উচ্চবর্ণের মনুষ্যেরা আত্মবলিদান করছিল সে সময়ে, দেখা যায় গ্রিক সেই সময়ে তারা আত্মবলিদানে সম্পৃক্ত না হয়ে প্রকাশ করছিল 'নন-ব্রাহ্মণ ম্যানিফেস্টো'। স্বাধীনতার অর্থ তাদের কাছে মনে হয়েছিল, সে তো শুধু

উচ্চবর্ণীয়দের ব্যাপার। অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর কাছে বিদেশি শাসন কিংবা স্বদেশী উচ্চবর্ণীয়দের শাসনের মধ্যে ভেদান্তর তাদের মনের মধ্যে বিশ্বাস সৃজন করেনি।

১৯১৬ সালে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বিখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী ড. এ. এ. গোম্পেন উইজার আরক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন বি আর আশ্বেদকর। আলোচনার বিষয় ছিল 'কাস্টেস ইন ইন্ডিয়া : দেয়ার মেকানিজম, জেনেসিস আন্ড ডেভলপমেন্ট'। বেদের কাল থেকে হিন্দু সমাজে যে বর্ণবিভাজন প্রবেশ করেছিল, পরবর্তী কালে 'মনু' সহ অন্যান্য স্মৃতিকারেরা—যেমন যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বৃহস্পতি ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ সামাজিক বিভাজনের সাথে শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পৃক্ত করায় অত্যন্ত ধীর লয়ে কালক্রমে ভারতবর্ষে শ্রেণি ও বর্ণ প্রায় সমার্থক হয়ে যায় পুরাপুরি সমার্থক না হলেও তা অনেকখানি একই ধরনের বলা যায়। গোম্পেন উইজার আরক বক্তৃতায় লিখিত ভাষণে আশ্বেদকর বলেছিলেন, "That classes have become castes through imitation and excommunication এ ঘটনার প্রায় দুইশতক পরে আরেকটি বড় ঘটনা ঘটেছিল। পাঞ্জাবে 'জাতপাত তোড়ক মণ্ডল' নাম দিয়ে জন্ম হয়েছিল একটি প্রগতিশীল সংগঠনের। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর ১২ তারিখে ওই সংগঠনের সম্পাদক সন্ত রামের কাছ থেকে তিনি একটি আমন্ত্রণ পত্র পান, তাদের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্যে। তিনি একটি ভাষণ প্রস্তুত করেন। সংগঠনের নাম 'জাত-পাত-তোড়ক মণ্ডল' একথা মাথায় রেখেই লিখেছিলেন সভাপতির ভাষণ।

আয়োজকেরা আবেদনগে পাঠ করেছিলেন ড. আশ্বেদকরের প্রস্তুত করা ভাষণ। তারা আশ্বেদকরকে ওই ভাষণটি দিতে দেননি। এসেদের স্বরাজ নিয়ে ড. আশ্বেদকর মন্তব্য করেছিলেন, "There is no use having Swaraj, if you cannot defend it. More important than the question of defending swaraj is the question of defending Hindus under the swaraj. In my opinion only when the Hindu society becomes a casteless society then it can hope to have strength enough to defend itself. Without such internal strength, swaraj for Hindus may turn out to be only a step towards slavery."

কলকাতা হাইকোর্টের তরুণ প্রতিভাদীপ্ত অহিন কবসারী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

রাজনৈতিক বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছিলেন ড. আশ্বদকরের কাছে। উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে থেকে শিক্ষা করে সমতা আদায় করা যাবে না—এ শিক্ষা আশ্বদকরের কাছে থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও বাণীতা তাকে অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় করেছিল। ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি ইচ্ছাকরেই অসংরক্ষিত কেন্দ্র বরিশাল থেকে তদানীন্তন বরিশাল জেলা কংগ্রেস সভাপতি অশ্বিনী দত্তের ভাইপো সরল দত্তের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিরাট ভোটের ব্যবধানে জমিদার সরল দত্তকে পরাস্ত করে অনন্ত নজির গড়েছিলেন। তার আগেই উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পূর্ব ও মধ্য বাংলার বিশাল অঞ্চলে নমঃশূদ্রদের আত্মসচেতনতার এক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। ১৮৭২-৭৩ সালে ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, বশোহর, ঢাকার বিশাল অঞ্চলে উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তারা হরতাল (general strike) পালন করেছিল।

তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের অস্পৃশ্যদের আন্দোলনের সাথে বাংলার অস্পৃশ্যদের আন্দোলনের প্রবল মিল আছে। ১৯০৫ সালে উচ্চবর্ণের মানুষেরা যে সময়ে 'বন্ধভঙ্গ' বিরোধী আন্দোলন করেছে, তখন তারা তা সমর্থন করেনি। উচ্চবর্ণের মানুষেরা যখন স্বদেশী আন্দোলন করেছে, তারা তার সাথে যুক্ত হয়নি।

এ নিবন্ধে যে কথা বলার তা হল অস্পৃশ্যরা জন্মসূত্রেই সমাজতন্ত্রী। উচ্চবর্ণের আধিপত্যবাদীরা সমাজতন্ত্রের কথা বলে এক প্রকারের মননপ্রাধা নির্মাণ করেই আত্মতৃপ্ত হয়, নিজেদেরকে উদার বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আধিপত্যবাদকে সহজে পালন-পোষণ করে বলেই সমাজতন্ত্র নির্মাণ হয় না। তারা তা জানেন। কিন্তু আধিপত্যবাদ বিসর্জন দেওয়া যে ভয়ঙ্কর কঠিন কাজ—সেই কঠিনতার কাছে সমগ্র দেশ সময় জাতি পরাস্ত।

আধিপত্যবাদের নিয়মনিতি মেনে বাংলার সংস্কৃতি চর্চার একটা পরিবর্তন এনেছিল এটা ঠিক। ভদ্রলোক শ্রেণি সেখানে অস্পৃশ্যদের জয়গা দেবার কথা ভাবেনি। অনুরাধা রায় সে কথা বলেছেন এভাবে : 'For a long time the Bengali middle class happily combined their communist self-image with cultural-loving ones. Their communism at its best was cultural communism, largely dissociated from real life. This excessive interest in cultural matters, which may be called 'culturalism' bred complacency and could offset political wrong,

at least till recently. And despite indulging in so much of culture, the communists not only failed to achieve any cultural counter hegemony in society, but they also became hegemonised themselves by cultural mainstream.' কমিউনিস্টরা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না যদি না আধিপত্যবাদ থেকে মুক্ত হবার মনন তৈরি হয় তাদের।

তথ্যসূত্র :

১. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাস্ট, প্রভেড এন্ড অইডেনটিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া : দা ন্যাশনালিস্ট অব বেঙ্গল, ১৮৭২-১৯৪৭, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, সেকেন্ড এডিশন, ২০১১:৩০
২. রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে ভূমিনা হিরাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, হৃত্য প্রকাশনী, কলকাতা ২০১১:১৪৭০ [১০/১০/১১]
৩. সৌরীন ভট্টাচার্য, শরীফ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রামশি পবিত্র, পূর্ব পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৩:৪৫
৪. N. D. Kamble, Deprived castes and their struggle for Equality, Ashish Publishing House, New Delhi, 1983:3
৫. Ravikumar's article "Iyothee Thass and Politics of Naming", The Sunday Pioneer (28.11.2005)—
৬. V. Geetha and S. V. Rajadurai, Towards and Non-Brahmin millennium : From Iythee Thass to Pariyar, Sammy Kolkata, 2011:1
৭. ড. ব্যবসাহেব অশ্বদকর : রাইটিং ওয়াজ লিপিসহ, এডিশন ডিপার্টমেন্ট, ৭নং : মনঃমহারাষ্ট্র, ভল্যুম ১; ১৯৭৯:২২
৮. —ই— পৃ. ৪০।
৯. আচার্য মহানন্দ হালদার, শ্রীশ্রীচরণ চরিত্র, বেতুলা মহাসন, রাধাকৃষ্ণনগর, উত্তর ২৪ পরগনা ২০০৩ সাল (শ্রীমহাজিত সংস্করণ) : ১০৭-১০৮
১০. —ই— : ৩১২
১১. Anuradha Ray, Bengal Marxism. Early discourse and Debates, samya, kolkata, 2014 : 181-82

# রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাহিনী

সুশান্ত কুমার

উত্তরবঙ্গ ও আসাম একসময়ে কামরূপ নৃপতির শাসনাধীন ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে কোচ উপজাতির লোকেরা হাজো নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কামরূপের এই পশ্চিমাঞ্চল দখল করে এবং হাজোর দুই পৌত্র বিশ ও শিশু কোচবিশার ও বৈকুণ্ঠপুরে যথাক্রমে ১৫১০ ও ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রাজত্ব স্থাপন করেন। অনুগামী উপজাতি-পরিচয় তাগ করে নিজেদের রাজবংশী বলে দাবি করেন।<sup>১\*</sup> বৈকুণ্ঠপুর এনেটে-এর রাজধানী প্রথমে ছিল শিলিগুড়ি বা শিলিগুড়িতে। পরে তা জলপাইগুড়িতে সরিয়ে আনা হয়।

রাজবংশীদের উপজাতি পরিচয়ের সপক্ষে রিজলে, হুন্টার, প্রিয়ারসন, ডান্টন, ওভেনেল প্রভৃতি বিখ্যাত গবেষকগণ মত প্রকাশ করেছেন। তবে রাজবংশীদের উৎপত্তি সম্পর্কে এরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ডান্টনের মতে রাজবংশীরা হাবিড় বংশোদ্ভূত। মিঃ ওভেনেলের মতে, এরা মঙ্গোলীয় পর্যায়ের। এ বিষয়ে রিজলের বক্তব্যকেই সব থেকে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। রিজলে বলাছেন, “রাজবংশী নামের আড়ালে এরা সুনির্দিষ্টভাবে কোচ উপজাতিরই লোক। ক্ষত্রিয়ের একটি প্রাদেশিক বর্গ হিসাবে রাজবংশীরা যে নিজেদের দাবি করে, তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তিই বুঝে পাওয়া যায় না। রাজবংশী নামটি, উত্তরবঙ্গে ও হিন্দু জনসমষ্টির নিজ পৌত্রের জাতিগুলির মত অনেকটা একটি ধরনের উপদেশ প্রকাশ করে; ঠিক যেমন, সারা ভারতবর্ষে যে কোন জরগর ভূম্যধিকারী শ্রেণি নিজেদের রাজপুত বলে দাবি করে, যাদের কোন সুনির্দিষ্ট উৎস বুঝে পাওয়াই শক্ত।<sup>২\*</sup> পৌত্রগণিত মতে পরজন্মের ভরে অনেক ক্ষত্রিয় উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে উদ্ভূত হয়ে আশ্রয় নেয়। এর ফলে এক সংকরগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, যারা আসলে আর্ববংশীরা, যাদের মাতা কামরূপী।<sup>৩\*</sup> রাজবংশীরা সত্যিই আর্ববংশীকর কিনা বলা শক্ত, তবে বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে হিন্দু প্রভাবে রাজবংশীরা যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় তা অনস্বীকার্য। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শতরদের প্রভাবে যে রাজবংশীদের ওপর পড়ে নি একথা জোর গলায় বলা যায়

না। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল জাতিগুলির অভ্যন্তরস্থ গোত্রবিভাগের মত রাজবংশীদের ‘পড়ুয়া’ বিভাগ। এই পড়ুয়া বিভাগের অনেকগুলির বৈষ্ণব প্রচারকদের নামে প্রচলিত। যেমন চৈতন্য, নিত্যানন্দ, আদিত প্রভৃতি পড়ুয়া, এজ্জড়া উদাহরণস্বরূপ রয়েছে পৌরোহিত্যে অধিকারীদের বিশেষ অধিকার। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বংশানুক্রমিক ‘গুরু’র মর্যাদার অধিকারী হন এবং বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন। কিন্তু ধর্ম প্রচলিত হলেই কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেই ধর্ম সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয় না। আর সেই জনগোষ্ঠী যদি আদি কৌম সমাজ হয় তবে সে তার স্বাভাবিক বজার রাখার চেষ্টা করবেই। প্রকৃতপক্ষে রাজবংশীরা কয়েক শতাব্দি ধরে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের হিন্দু জাতিতে পরিণত করে, তবু তা সত্ত্বেও তাদের সমাজ বিমূর্ত্যবাহার মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, এ প্রসঙ্গ, আলোচিত হলে সাধারণত রাজবংশীর হেরকম প্রকলভাবে নিজেদের হিন্দু প্রমাণের চেষ্টা করে তাতেই কিন্তু বোঝা যায় যে তাদের ওই হিন্দুত্ব অর্জিত বা আরোপিত স্বধর্ম নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—একবার ইল্যান্ডের প্রিন্সি কার্টমিল একটি রাজবংশী পরিবারের উত্তরাধিকার মামলার রায়দান কালে মন্তব্য করেন, “বৈকুণ্ঠপুরের এই পরিবারটি ব্রাহ্মণ বংশ বলে যদিও পরিচিত, তবু একই সঙ্গে তারা এমন কতগুলি প্রথা পালন করে যা তাদের হিন্দু পরিচিতির পক্ষেই অনস্বত বলে মনে হয়।”<sup>৪\*</sup>

## রাজবংশী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও কৃষিনির্ভর সম্পর্ক

রাজবংশীরা মূলত কৃষিজীবী। কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কাজে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে এমন খুব কম দেখা যায়। জমির সঙ্গে রাজবংশীদের আর্থিকতার সম্পর্ক পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত রাজবংশীদের কৃষি ব্যবস্থা মোটামুটি একটি সুস্থিত জোতদারী আধিপ্যারী সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল ছিল। সাধারণভাবে জোতদাররা তাদের সমস্ত নাজ-সরঞ্জাম দিয়ে তাদের জমিতে কোন ব্যক্তিকে আধিপ্যার হিসাবে নিয়োগ করত। এসব নাজ-সরঞ্জাম অবশ্যই প্রাচীন ধরনের। আজ পর্যন্ত আধুনিক নাজ-সরঞ্জাম, বীজ-সার-ওষুধ, বা সেচ রাজবংশী কৃষিজীবীদের আরজের বাইরে।

রাজবংশী কৃষিজীবীদের মধ্যে আধিপ্যারের সংখ্যা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং কৃষিমজুরের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। রাজবংশী জোতদাররা প্রগনত

আদিবাসী ও রাজবংশীদেরই আখিয়ার হিসাবে নিয়োগ করত। তরাই-এ যেসব চা-বাগান আছে সেখানেও রাজবংশী শ্রমিক নেই বললেই চলে। ইদানীং কালে রাজবংশীদের মধ্যে কৃষিমজুরের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজবংশী জোতদার আখিয়ার সম্পর্কের মধ্যে শোষণের ধারাটি অবশ্যই অব্যাহত ছিল। কিন্তু তার রূপ ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। মালিক-প্রজা ধরনের শোষণের সম্পর্কের পরিবর্তে লেখাপড়ার অভাব অথবা আদিগোষ্ঠী জীবনের প্রভাব যে কোন কারণেই হোক, রাজবংশী জোতদার আখিয়ারদের মধ্যে 'বাপ ছেলে' ধরনের শোষণের সম্পর্কটি বিদ্যমান ছিল। 'বাপ-ছেলে' ধরনের শোষণ সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হল যে, এক্ষেত্রে শোষক ও শোষিত উভয়পক্ষেই শোষণের প্রতি একরকমের মূল্যবোধ, বিশ্বাস বা আস্থা জড়িয়ে থাকে এবং শোষণের রূপটি প্রত্যক্ষ হয় না। ফলে এই ধরনের শোষণের সম্পর্ক একদিকে যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তেমন প্রয়োজন মত সহজে রূপ পরিবর্তন করতে পারে না। রাজবংশী জোতদার আখিয়ারের এই 'বাপছেলে' ধরনের সম্পর্কের মধ্যে জোতদারী-মহাজনী শোষণের সর্বপ্রকার ক্ষতিকারক দিকগুলিই উপস্থিত ছিল।

রাজবংশী গ্রামগুলি আগেকার দিনে জোত হিসাবেই চিহ্নিত হত, পরে গ্রাম বা মৌজা எனক ঠিক হয় এবং গ্রাম ও জোতের সীমারেখা অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন হয়ে যায়। যদিও সাধারণভাবে গ্রামগুলির নামকরণ জোত হিসাবেই প্রচলিত থাকে। পঞ্চাশের দশকেও জোতগুলিতে জোতদারই ছিল প্রধান। এদের বলা হত পঞ্চায়ত। যেমন তখন জোতের জোতদারের নাম ছিল তফা সিং। কিন্তু তাকে বলা হত পঞ্চায়ত। গ্রামের সামগ্রিক অর্থনৈতিক যে কোন সমস্যা জোতদারই লেখাওনা করতে এবং মীমাংসা করতে। অবশ্যই গ্রামের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি—যেমন বড়-চাঁদা বা পাশের গ্রামের জোতদার এদেরও ঐ পঞ্চায়ত পরিচালনায় কিছু ভূমিকা ছিল। এই সমস্ত রাজবংশী জোতদাররা ঠিক আধুনিক ও শহরে ধরনের বিলাসী না হলেও অমিতব্যয়ী ও ব্যয়বশল জীবনযাপন করতেন। অবশ্যই কিছু ক্ষমতাসম্পন্ন জোতদার পরিবারের শহরের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ ছিল এবং তাদের মধ্যে লেখাড়ারও ভাল প্রচলন ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে রাজবংশী জোতদাররাও চাকুরি, বাবসা, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে নিচে রয়ে যায়। পঞ্চাশ, ষাট-এর দশকে

যখন রাজবংশী জোতদার আখিয়ারদের মধ্যে 'বাপ ছেলে' ধরনের শোষণ সম্পর্কে ভাঙন আরম্ভ হয় তখন ক্ষমতাসম্পন্ন রাজবংশী জোতদার পরিবারগুলি শহরজীবনে আশ্রয় নিতে থাকে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট জোতদাররা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না এবং ক্রমে এরা সমেত সমস্ত রাজবংশী জনসমাজ দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়।

রাজবংশীদের 'বাপছেলে' ধরনের জোতদারী আখিয়ারী ব্যবস্থা ১৯৫০-র জমিদারী দখল অফিন চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত মোটামুটি সুস্থির অবস্থাতেই ছিল। পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ থেকে ১৯৬৭-র নকশালবাড়ি কৃষক-আন্দোলন পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থা বিভিন্ন ভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। রাজবংশীদের মত এরকম একটি পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক জাতি কীভাবে ক্রমাগতই নীচে নেমে যাচ্ছে, তার কথা তাদের কাছে, তাদের কথা-বার্তায়, গানে-গল্পে হামেশাই শোনা যায়। আগে আখিয়ার যত সহজে পাওয়া যেত এখন তা সম্ভব নয়, নতুন করে আখিয়ার হার কেউ রাখতে চায় না রাজনৈতিক কারণে। এক্ষুড়া আন্দোলনের পরতীকালে জমি বিলিয্যবস্থা এবং তা থেকে উদ্ধৃত সমস্যা নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আন্দোলনের পরে যখন সরকার থেকে জমির বিলিয্যবস্থা শুরু হয় তখন একশ্রেণির দালালের উদ্ভব হয়। এরা বিভিন্ন কারণের পাট্টা পাওয়ার ন্যায্য অধিকার থেকে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে। এক্ষুড়া পাট্টা পাওয়া জমির দখল নিয়েও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যারা পাট্টা পায় তারা যে দখলেই সেই জমি রাখতে পারে, তা-ও নয়। বারিসের কারণে অনেকে জমি বিক্রি করে দেয়। প্রভাবিত হয়েও অনেকে জমি হারায়। পুরানো জোতদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়। আখিয়ার জোতদার ব্যবস্থা অনেক পরিবর্তিত হয়। আখিয়ারদের রাজনৈতিক শক্তি বাড়ে, কিন্তু তাতে সামগ্রিকভাবে অবস্থার কোন উন্নতি হয় না। তাদের ব্যবস্থা অনুন্নতই থেকে গেছে। উৎপাদন কম। মজুরিও খাপসি নয়।

১৯৫০ সালে জমিদারী উচ্ছেদের আগে যেসব রাজবংশী জোতদার ছিল এদের অনেকেই গরিব হয়ে যায় এবং অনেকে তাদের পুরানো জীবনযাত্রার চরিত্রপট ধার্য পঞ্চায়ত রাখে নিয়ে স্থান-অস্থানের সম্পদ বিক্রি করে ভূমিহীন হয়ে পড়েন। তারা আখিয়ারের আখিয়ারী দক্ষাওয়া হওয়ার ফলেও কিছুটা উন্নতি পান। পরে যে রাজবংশীরা মতের মতের দেখা দেয় না, তারা না পান।

নেই। এর ওপর পঞ্চাশ দশক থেকে এই অঞ্চলে ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি রাজবংশী সমাজের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ, নেপাল, বিশ্বের প্রকৃতি জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণ লোক এই অঞ্চলে আসায় এখনকার জনসংখ্যা কাঠামো লক্ষ্য করার মত। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশের রঙপুর, দিনাজপুর প্রকৃতি থেকে অনেক রাজবংশী এখানে এলেও ভাষাতে, আচার-আচরণে, প্রথা-অনুষ্ঠানে ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্যের কারণে স্থানীয় রাজবংশীদের থেকে এদের একটি সামাজিক ব্যবধান রয়ে গেছে। যাই হোক, অধ্যাপক পার্থনাথ মুখার্জীর মতে বাইরের থেকে এমন ব্যাপক জনসমাগমই রাজবংশীদের হাত থেকে জমি সরিয়ে দিয়ে তাদের দারিদ্র্য বাড়িয়ে তুলেছে।”

#### ধ্যান-ধারণা মূল্যবোধ ও সমাজ-বৈশিষ্ট্য

অর্থনৈতিক চাপ বহিরাগত বা শহরের প্রভাব ইত্যাদি রাজবংশীদের জীবনে বিভিন্ন মূল্যবোধের ওপর অঘাত হনছে। বাটের দশকের কৃষক-আন্দোলন জ্যোতদার আধিপত্য সম্পর্কের অন্তরঙ্গ মূল্যবোধ ধরে রাখতে চাইছে না। ঠিক যেমন যে সমস্ত পরিবারে মেয়েদের কাজে বের হতে হচ্ছে, সেখানে পুরানো পুরুষনির্ভর সম্পর্কের ধারণা ও মূল্যবোধ অনুপস্থিত হয়ে পড়ছে। সামগ্রিকভাবে, নতুনশেলবাড়ির রাজবংশী জনসমাজ আজ বুঝতে পারছে যে আধুনিক বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংঘাতে তাদের পুরানো সংস্কৃতি একইভাবে ধরে রাখা সম্ভব নয়। এই সঙ্গে উন্নততর সমাজ-জীবনও তাদের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্য রাজবংশী সমাজ জি-বিজিজে হয়ে যায়নি, তার কারণ এখনও তাদের মধ্যে জাদি বৌদি বৌদি সমাজের মত গোষ্ঠীমত সংহতি কিছুটা থেকেই যাচ্ছে। যেমন, রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক ইতিহাস যে আজকের ছেলেরা আর আগের মত ধরে রাখতে পারছে না, এ বিষয়ে রাজবংশী বৃহত্তর একটা ক্ষোভ রয়ে গেছে। কিন্তু এখনও তারা কৃষকদের দুই একটা বৌদি সংরক্ষণ করে না। এবং তারা যখন এখন হয় তখন এ সম্পর্কে এমনকি বৌদি বিষয়েও খুব খোলামেলা আলোচনা করে নেয়।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে পুরুষনির্ভর মূল্যবোধের প্রাধান্য নারী কর্মীদের মধ্যে কমে এলেও, সামগ্রিকভাবে রাজবংশী সমাজে পুরুষ-প্রধান্য খর্ব হয়নি।

শিক্ষার বিস্তার না হওয়া এবং অল্প বয়সে সন্তানের বিবাহ দেওয়া এর অন্যতম কারণ। রাজবংশীদের মধ্যে সনাতন হিন্দু সমাজের প্রচলিত ও অপ্রচলিত বা নির্দিষ্ট বিভিন্ন ধরনের বিবাহ-প্রথা বর্তমান। এই সমস্ত বিবাহ এবং অগণিত পারিবারিক সম্পর্কের সমস্যা নিয়ে গাওয়া গান আজও রাজবংশীদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়। রাজবংশীদের মধ্যে এক-বিবাহ, বহুবিবাহ এবং বিধব-বিবাহ প্রচলিত। রাজবংশী বিয়ের নিয়ম অনুযায়ী একই ‘পড়ুয়ার’ অন্তর্ভুক্তরা নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে না। আবার যে কোন পড়ুয়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কেবল অন্য যে কোন পড়ুয়ার ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয় না। কোন নির্দিষ্ট পড়ুয়ার সঙ্গে কেবল অন্য কতকগুলি পড়ুয়ার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। এর অন্যথা হলে সমস্যার সৃষ্টি হয় বটে, তবে তা থেকে খুব বেশি সামাজিক জটিলতার সৃষ্টি হয় না।

রাজবংশী সমাজের বিবাহের যতগুলি ধরন প্রচলিত আছে সেগুলিকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথমটি সমাজকর্তৃক পুরোপুরি স্বীকৃত, এবং দ্বিতীয়টি শর্ত-সাপেক্ষে স্বীকৃত। প্রথমভাগের মধ্যে পড়ে ফুল বিয়ো বা ফুলমারা বিয়ো, দ্বিতীয়টিতে আছে পানি ছিটা, এ দানী বিয়ো, ঘর সৌধানী বিয়ো, গাও গছ, ইত্যাদি। শ্রীচরুচন্দ্র সন্ন্যাস মহাশয় তাঁর বইতে” এই সমস্ত বিবাহপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন, বাঁচে তার পরিচয় দেওয়া হল।

ফুল বিয়ো : এই বিবাহে বর কোন কুমারী মেয়েই পাণিগ্রহণ করে। এই বিবাহে একজন পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। রাজবংশীদের মধ্যে অধিকাংশই সব থেকে উচ্চস্তরে আছে। পুরোহিতের কাজ তারাই করে।

পানি ছিটা : কিছুদিন আগে পর্যন্ত কন্যাপন দেওয়ার রীতি রাজবংশীদের মধ্যে প্রবল ছিল। কোন যুবকের কন্যাপন দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে সেই যুবক বড়দের পরামর্শ নিয়ে কন্যার অভিভাবককে অনুরোধ করে তাদের পালন দিয়ে বর-কনের মাথায় জল ছিটিয়ে দিতে। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করতে পারে। তবে বিবাহ সম্পূর্ণ নয়। যখন স্বামী ঘেঁষে টাকার রোজগার করে তখন গ্রামের লোকদের ভোজ দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করে। এই ভোজ দেওয়ার ঘটনাটি বিবাহের অনেক পরেও ঘটতে পারে। এমনকি সন্তান-সন্ততি বড় হয়ে গেলে বা তাদের বিবাহ হয়ে গেলেও হতে পারে।

৬৩৭নীর বিয়া : যখন কোন বিবাহিত স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ ঘটে, তাকে বলে ৬৩৭নীর বিয়া। এই ধরনের বিবাহ সাধারণত ঘটে যখন স্ত্রীলোকটির স্বামী শারীরিকভাবে দুর্বল বা ভরণ-পোষণে অক্ষম বা দীর্ঘদিন ব্যক্তিগত অনুপস্থিত এবং স্বশুর-কন্যাপণের লোভে পুত্রবধূকে অন্যের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয়। এখানে পাত্রীকে পুরোপুরি পণের মত ব্যবহার করা হয়। এখানে স্ত্রীলোকটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব স্বামী ত্যাগ করতে হয় না, কেবলমাত্র তার দেওয়া কন্যাপণ তাকে ফেরৎ দিতে হয়। এ ধরনের বিয়ে সমাজকর্তৃক স্বীকৃত।

বিধবা-বিবাহ—জবজ্ঞাপন্ন বিধবা মহিলারা নিজের পছন্দমত পাত্র ঠিক করে বিবাহ করতে পারেন। এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর বাড়িতেই বসবাস করেন। একে স্থানীয় রাজবংশী ভাষায় ভাছুয়া বলে। যখন কোন বিধবা গোপন সহবাসের ফলে অন্তসত্তা হয়ে পড়ে তখন সে তার আকর্ষিত পুরুষটিকে বিবাহ করে। এই বিবাহকে 'গাও গছ' বলে। এই বিবাহেও পাত্রকে একটি ভোজসভার আয়োজন করতে হয় এবং দুই পক্ষকে নিমন্ত্রণ করতে হয়।

রাজবংশীদের বিবাহ-প্রথার মত বিবাহবিচ্ছেদও সরল প্রকৃতির। যেকোনো যত্নে বিবাহ-সম্পর্ক বিয়ে হিন্দু সমাজে যে অনমনীয়তা ও জটিলতা বর্তমান, এখানে তা অনুপস্থিত এবং এ ব্যাপারে আদি কৌম-সমাজের ভাবধারাই অনুসৃত হয়ে চলেছে। অন্যভাবে 'ফুলবিয়া পদ্ধতি' প্রাক বৈবাহিক সম্পর্কে কিছু কম নিমিত্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সব মিলিয়ে বিবাহটি এইভাবে ভাবা যেতে পারে যে রাজবংশীরা সরল উপজাতি সমাজ খোলে পরিবর্তিত হওয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সংস্কৃতি রপ্ত করার মধ্যে, উত্তম সংস্কৃতির মিলনটি ঘরে রেখেছে। এর উপর আবার আধুনিক শহুরে সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এর থেকে উদ্ভূত বিবিধ সামাজিক সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং প্রধানত ক্রমাধীন অর্থনৈতিক অক্ষমতার এদের নিত্যন্ত পরিবর্তিত করে যাচ্ছে যার প্রতিফলি রাজবংশীদের পাঁচালীগানে, পঞ্চায় প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়।

#### রাজবংশীদের পাঁচালীগান, নাটক ও জীবন

রাজবংশীদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীতের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। জলপাইগুড়ি ও রঙপুর জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গান

সম্পর্কে অনেক কথা জানিয়েছেন নির্মলেন্দু ভৌমিক<sup>১১</sup>। রাজবংশীদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং সমস্যাকে কেন্দ্র করেই তাদের সমস্ত সৃষ্টি হয়েছে। শিশুর অন্নপ্রাশন বা 'ভাতছোঁরানি', বালিকাদের প্রথম রাজদর্শন বা ফুলকুটানি, বন্ধা রমনীর দুঃখ, রাজবংশী যুবক-যুবতীর প্রেম। বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান, গার্হস্থ জীবন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে গান রয়েছে রাজবংশীদের জীবনে। রয়েছে মৃতদেহে সৎকার নিয়ে 'মড়াখোয়া' গান, ওষ্যাদের নিয়ে ওঝালি গান ইত্যাদি। নকশালবাড়ি রাজবংশীদের লোকগীতির মধ্যে পাঁচালী জুড়া রয়েছে রামায়ণ গান, নটুয়া, হলী, শাসতরী, মনশিক্ষা, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি। এগুলি মূলত সবই ধর্মভিত্তিক সংগীত। এদের পাঁচালী গানের পার্থক্য হল যে একমাত্র পাঁচালী গানেই কেবল সামসাময়িক সমাজচর্চাটি সরাসরিভাবে প্রকাশ করা হয়।

রাজবংশীদের পাঁচালী গান বিষয়গত দিক থেকে দুইই বস্তু-অবলম্বী, ভাববস্তুভার বিশেষ প্রভাব এতে কখনই থাকে না। এর একটি কারণ হতে পারে যে, এই পাঁচালী গান রাজবংশীদের নাটকের অঙ্গবিশেষ। রাজবংশীদের বিভিন্ন নাটকের সামাজিক বক্তব্যকে অনুসরণ করতে গিয়ে এই গানের চরিত্র হয়ত এমন প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক হয়ে উঠেছে। রাজবংশীদের পাঁচালী গানের ভাষায় তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক টান ও বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে উপস্থিত। পাঁচালী গানের সুর বেশ তকণ, শব্দে কালে বিলাপের মত শোনায়। রাজবংশীদের সারাজীবনেই দুঃখেরই প্রধান, তাই হয়ত তাদের সুর এমন তকণ নিয়েছে। অতীত এই পাঁচালী গানের ভাষা ও সুর অক্ষম-ভেঙ্গে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। নকশালবাড়ি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ প্রবীণ পাঁচালী শিল্পী হলেন শ্রাব্দকোত গ্রামের শ্রীজ্ঞান সিং। নকশালবাড়ি রাজবংশীদের পাঁচালী গানের ভাষা ও সুরের যে আঞ্চলিক সীমানা শ্রীসিং তার সঙ্গীতসীরা নির্দেশ করেছেন, তা হল পূর্বে আমবাড়ি (কাঁদিনেওয়া) পশ্চিমে মরংহিল (নেপাল) উত্তরে যাদুভাড়া এবং দক্ষিণে খড়িবাড়ি ও বিহার সীমান্ত। বর্তমানে জনপ্রিয় গায়ক রতন সিং।

পাঁচালীগানের শিল্পীরা পাঁচালীগানকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন—পাঁচালী, রং-পাঁচালী ও মান-পাঁচালী। পাঁচালীগানে স্থানীয় কোন ছোটখাটো ঘটনাকে ভাষ্যাত্মক বর্ণনা করা হয়। এগুলিকে মুখজোড়া

(একটম্পোর) বলা হয়ে থাকে। এখানে সাধারণত পরকীয়া প্রেমসংক্রান্ত বিষয় নেওয়া হয়। রং-পাঁচালীতে অঞ্চলের সমাজজীবনের বিভিন্ন দুঃখদুর্দশা ব্যক্তিগতরূপে বিবৃত করা হয়। এর মধ্যে ঐ সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিও ধরা পড়ে। মানপাঁচালীতে বৃহত্তর সমাজের তা রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংগীত রচনা করা হয়। এখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সব বিষয়গুলিকেই অনা হয়। মানপাঁচালীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে গায়ক এখানে গানের কথাকে নিজের ইচ্ছামত কোন পরিবর্তন করতে পারেন না। সেফেত্রে তারে নৃতন করে গান বাধতে হবে।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে পাঁচালী গান মূলত নাটকের অংশবিশেষে অবশ্য নাটকের সঙ্গে অনেক সময়ে জনপ্রিয় নাটকের গানগুলি বিনা নাটকে শুধু গানের আসরে গাওয়া হয়ে থাকে। পাঁচালী নাটকের আসর যেখানে বসে তার কেন্দ্রে থেকে একটি বাঁশের খুঁটি যার ওপরে প্রত্যেক বংশপাতার ছাউনি। এই খুঁটিকে বিরে বাজনাধার ও দোহারকি গায়করা বসেন। এদের বিরে বৃত্তাকারে বসেন শিল্পীরা। খুঁটি থেকে দু-তিন গজ দূরে একটি বৃত্তাকার ফাঁপ-জায়গা থাকে। এখানে অভিনয় হয়। এই জায়গাটির পর দর্শকরা বসেন। অর্থাৎ খুঁটিকে কেন্দ্র করে পর পর বহি চারটে বৃত্ত রচনা করা যায়, তবে কেন্দ্র থেকে প্রথম বৃত্তে বাজনাধার ও দোহারকি, দ্বিতীয় বৃত্তে অভিনেত্রী, তৃতীয়স্থিত অভিনয় হয় এবং চতুর্থস্থিত দর্শকরা বসেন। শিল্পীদের মধ্যে আছেন অভিনেতা, নর্তক, বাজনাধার ও গায়ক। অভিনয়ের জন্য অভিনেতার প্রয়োজনীয় কিন্তু নান্যতম গাঢ়বস্ত্র করেন। হালেক সময়েই সেটি প্রতিবি বদলান্য থাকে। নাটকের সংলাপ খুব একটা বাঁধন্য থাকে না শুধু থাকে একটি কাঠামো। অভিনেতার অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সংলাপ উঠার করে এবং বিভিন্ন অংশ প্রবৃত্ত শুধু নাটকটিকে নীধরূপ দেওয়া হয়। একটি নাটক একত্রে সফলত চলেতে পারে। নাটকটির দিক দিকে পাঁচালী নাটকেও এম সাধারণ "নাট্য-খ্যোটির" বলা যায়। তবে নাটকের মধ্যে দর্শকের ইচ্ছামত অংশগ্রহণের প্রয়ে পাঁচালী নাটক খুব একটা নয় বলে মনে হয়। যেকোন আদি ভারতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঁচালী নাটকেও "কামেডিয়ান" থাকেন। তিনি সাধারণভাবে রক্তরের মধ্যে দিয়ে হাসির উত্থেক ঘটান। কিন্তু নাট্যভাবের নিরূপ

ও নাটকের গতি পরিবর্তনও তার কয়িহের মধ্যে পড়ে। অবশ্য সামগ্রিকভাবে পাঁচালী নাটকগুলি সমাপ্ত হয় ট্রাজেডির মধ্যে দিয়ে। নাটকে নর্তক বলতে থাকে। দশ-পনের বছরের ছোট ছেলেরা মেয়ে সেক্রে নাচে। কিন্তু মূল অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে না। নাটকের দুটি অঙ্কের পরবর্তী সময়ে আমোদ উপকরণ হিসাবে থাকে নাচের এই ব্যবস্থা। এই ছেলগুলি আসলে এভাবে ভবিষ্যতের অভিনেতারূপে শিক্ষানবিসী করছে। গানের শিল্পীদের সঙ্গে প্রধানত হারমনিয়াম এবং ঢোল বা কঁসি জাতীয় তালবান্য দিয়ে সহযোগিতা করেন বাজনাধাররা। দোহারকি গায়করা সাধারণত পদগুলির পুনরাবৃত্তি করেন বা ধুয়ো দেন। গান কখনও অভিনেতার নিজেও গায়। কখনও গায়কও গান ধরে। আবার কখনও কখনও অভিনেতা গান ধরে, অন্যরা দোহারকি করে। গান আগে থাকতেই তৈরী থাকে। নাটকের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বিশেষত আবেগপ্রধান পরিস্থিতিতেই গানগুলি গাওয়া হয়।

#### রং পাঁচালী

এবার কয়েকটি গান নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। নকশালবাড়ি অঞ্চলের রাজবংশীদের গাওয়া গান নিয়েই এখানে আলোচনা হবে। প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে সীমিত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে শুধু পাঁচালী বা দুখ জোড়ার উদাহরণরূপ গান গাওয়া যাবে। সংগৃহীত সব গানগুলিই রং-পাঁচালী বা মান পাঁচালী ধরনের। এখানে বিভিন্ন গানের নমুন্যরূপ কয়েকটি গান অন্তর্ভুক্তিত হল।

প্রথম রং পাঁচালীর নমুনা :-

হয় বিধি আমার এই না ছিল  
সিন্দে আমার অঙ্গার হইল।  
বেমন ভাঙ্গিল মাটির বসনা  
কখনও কি হয় সত্য।  
জন্মিয়া অভাগিনীভার মরণ হয় না কি তার।  
আজি উড়াল পক্ষী কি ঘুরিয়া আসিবে  
আবার অভাগিনির পেঞ্জরায়।

আবার অন্য গানে,

তোর মুখে গুনিয়ে কথ্য  
স্বামীয়ে, শরীর মন মোর যইক ধরে না।  
স্বামী, পরনারীর মুখের ছাপি  
যেন চৈনদের পুণিমা।  
ওরে করম্বি রবে ভালবাসারে  
নিমের মত হইবে তিতা।

প্রথম গানটিতে স্বামী-পরিত্যক্তা এবং দ্বিতীয়টিতে স্বামী-যুক্ততা নারীর অসহায়তা কুটে উঠেছে। স্বামীর এক স্ত্রী বর্তমান থাকে সত্ত্বেও আর একটি নারীর প্রতি সে আসক্ত। সে নূতন স্ত্রী খনতে চায়। ওনে স্ত্রী মর্ম-হ্রদ্যায় বিদ্ধ, কিন্তু সে নিরুপায় বাধা দেবার যথেষ্ট ক্ষমতা তার নেই। কারণ একাধিক বিবাহ সমাজে প্রচলিত। সুতরাং বিলাপও আক্ষেপই একমাত্র অবলম্বন। গানগুলিতে এই আক্ষেপ ও বিলাপই প্রকাশ পাচ্ছে। এ ধরনের গান ওই অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। মূলত, রং-পাঁচালীর মধ্যে দিয়ে রাজবংশী নারীসমাজের দুঃখ-দুর্দশা, অধনের রূপটি প্রস্ফুটিত হয়।

#### কয়েকটি মানপাঁচালী, কিছু আলোচনা

রাজবংশীদের পাঁচালী গানগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হল মানপাঁচালী। কারণ, এই গানের মধ্যে দিয়ে রাজবংশী গীতিকাররা এক সুদূরপ্রসারী ও সামগ্রিক নৃসিংহ ব্রহ্মাণ্ড ও জাতির সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর এক রাজবংশী জনজীবনের ভাব প্রকাশ্যে রূপটিতে বেঁধেছে। ফলে এ বিষয়ে তাঁদের সর্বাঙ্গী মানপাঁচালীর মধ্যে বরা পড়ে। এজন্য এই গানগুলির মধ্যে গীতিকারদের জীবন ও নৃসিংহব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়। তাইএব এই গানগুলি বিশ্লেষণ করলে রাজবংশী সমাজে হোদ্য সম্পর্কের প্রকৃতিও বিচার করা সম্ভব হয়।

আমাদের চিত্তাকর্ষক নির্দোষ একটি প্রথম অবস্থান। এই নির্দোষ গান ভেটি সম্পর্কে রাজবংশীদের বীধা গীত গান ১৯৫২ সালে জলপাইগুড়ি মহকুমা থেকে সংগ্রহ করেন জীতারাম সান্যাল মহাশয়। গান দুটি নিম্নরূপ—

উত্তরবঙ্গের বিধক সাহাবান,  
যদি মানবির মত বাচিবারে চান।  
ভোট নিবার বাপে বাপে নাগিছে ঢেউ

৩০৪ ২৫ ৩৩৫

চোঙ্গা কুকে ভেউ, লম্বা রাখ করে কেউ  
নাতালা বান্ধি নানান রকম পাটি,  
ভোটের তান করেছেন উজান ভাটি  
দ্যাশে নাগিছে মস্ত বড় ঢেউ  
বড় বড় নাতাওলার না হয় খুম,  
নানান দল বান্ধি করে দলাদলি  
কাহো ডাইনে কাহো বা বাঁয়ে যায় চলি।

অপর গানটি,—

কতো দেবিস ভাই ভোটের ভেঁকখারী  
কাংগালের কলু সাজি বেড়াচ্ছে বাড়ি বাড়ি  
নাতালা ভোটের বাপে জেইসে বাবির  
নিজের বাজার করেছেন জাহির  
বুড়া নাতালা কহেছেন নয়া নয়া কুলি  
বেড়াচ্ছে ঘাড়ে লিয়া। ভোট ভিক্কার কুলি  
জিবিকিতে নিদিসিয়া কাহো গান মিতি  
হবার চাছে হামার মেম্বর মেম্বরি  
ভোট মাপেরে ভাই কোল হাওয়া বই  
এলা হো বন্যে লোনা জেখায় নই।

গান দুটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে রাজবংশী মোনর্ভিত্যদের কাছে নির্দোষ এক অর্থহীন প্রহসনরূপে প্রতিভাত হয়েছে। একটি জনসমীক্ষণী নেতাদের নির্বাচনকালে আশা ও প্রতিশ্রুতি বিতরণ, ভোটের জন্য দলাদলি ও ভুট্টোছুটি; এসবই ভোট-সম্পর্কে রাজবংশী গীতিকারদের মোহতর ঘটিয়েছে। সন্দেহ নেই, এই মোহতর ব্যতীত নব্যজনপন্থীরা ভোট প্রকল্পের জন্য সবচেয়ে অনেক আগ্রহী। বোঝা যায়, লোক-দলনিকতা শব্দে কুক্ষিজীবী রাজনীতিকদের থেকে অনেককক্ষে আগে চিন্তা করতে সক্ষম, বিশেষত যেগুলি স্থানীয় সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। এর কারণ তারা তাদের চারপাশের জেবে দেখা সমাজকে সরাসরি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মধ্যে দিয়ে আসতে পারেন।

সুচি-এর দশকের কৃষক-আন্দোলন মহাশয়বাড়ির জনজীবনে এক সুবিশাগ

৩০৫ ২৫ ৩৩৬

যত্ন। স্থানীয় রাজবাণী লোকপরিচয়রূপে সেই আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আলোড়িত হয়েছেন। ফলত এর প্রত্যক্ষ পড়েছে মানপাচালীর মধ্যে। ১৯৬৭-র নবম্বারমাসে কৃষক-আন্দোলন জোতদার-আধিকার শ্রেণিসম্পর্কের রাজনীতি, অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে দানা বাঁধে। এ আমরা আগেই দেখেছি। সম্ভবত, এই শ্রেণিবিশ্ব দুই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকাশিত হবে। আর তাই, এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দুই শ্রেণির নিজস্ব মান-পাচালী গড়ে উঠবে, এটাই আশা করা যেতে পারে। দুইয়ের বিষয় স্বল্পমেয়াদী সীমিত প্রচেষ্টার দরুন ঐ সময়ের আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্তকোন মানপাচালী শিল্পীর নিকট হতে গান সংগ্রহ করতে পারা যায়নি। সংগৃহীত সবকিছু গানই হয়েছে জোতদার-পক্ষীয়। তবে তার জন্যে এই সময়ে জৈববিরোধ থেকে উদ্ভূত সামাজিক-সম্পর্ক বিশ্লেষণে অনুবোধ দ্বারা কারণ নেই। কেন, তা গানগুলি আলোচনা করলেই খোঁজা যায়। এখন আমরা নমুনারূপে প্রথমে দুটি গান উপস্থিত করছি :

জোতদার দেখ নকলি কলির খাওয়ার  
আধিকারকে কইছে গিরি  
জোতদারক ভাই মজুরী  
তোমরা দেখ নকলি।  
এতে পাটি মাগাইছে বগড়া  
গত চিতার দেখেছে ভামসা  
নকলি কলির খাওয়ার  
তোমরা দেখ নকলি জোতদারক ভাই মজুরী।

গানটি আন্দোলনের সময়ের রচনা। গায়কের ব্যক্তি অনুসারে, সমাজের অন্যতম দেখে পাটি রচনা করা হয়েছে। এমন সময় পড়েছে যে, আধিকার, যে নকলি হাতে পিঠি হানা (এল) জোতদার মজুরী করছে মাগড়া। যেই হলে মন। জোতদার কলির খাওয়ার মধ্যে বাপ-বেটার সম্পর্ক কই হলে দেখা। জোতদার কলির খাওয়ার ভাই চাষ করতে গিয়ে এল। সেই মূহুরে কলিজা। অতএব গিরিও নকলি আধিকার জোতদারের মুখের ওপর কোন কথা এসেতে পারবে না। পাটি এই সম্পর্ক ভেঙ্গে দিল। (গিরি মানে যে কোন সম্পর্ক কই। যে বিশেষ সামাজিক প্রতিপত্তি ও উচ্চমর্যাদার অধিকারী)।

গানটি এবং গায়কের কাথ্যাটি কৃষক-আন্দোলনের পূর্বে ও আন্দোলনের সময়ে জোতদার-আধিকারের সম্পর্কে ব্যক্ত করছে। যতই বাপ-বেটা বলা হোক না কেন, সম্পর্কের ভিত্তি যে বৈষম্যের তথা বঞ্চনার তা বুকতে অসুবিধে হয় না। আন্দোলনের সময়ে সম্পর্কটির দ্বিরাবস্থায় যে চিড় ধরে, সম্পর্কের স্বরূপটি উন্মোচিত হয়, শ্রেণিবিশ্বের প্রকাশ ঘটে এবং একধরনের ওলট-পালট শুরু হয়—এ সম্বন্ধেও গানটি থেকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। আসলে, বাপ-বেটা ধরনের সম্পর্ক বর্তমান থাকার আন্দোলনের সময়ে শেষশব্দে একটি কৌশল হিসাবে প্রয়োগ করার মত বোধশক্তি জোতদারের মধ্যে সংগঠনভাবে আসেনি, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই দিশেহারা ভাবটিও গানের মধ্যে বুকতে উঠছে। এই দিশেহারা ভাবটি ক্রমে কেটে যায়, এবং বিরোধ সম্পূর্ণ হয়ে আসে। পরের গানটি লক্ষণীয় :

হারে মথের কলিকাল  
(ওরে) পাখির আকাশ সর্বত্র কাল  
কোচরি সাজলা গিবি সাজিয়া  
ময়না ডাক ভাই নিম্নের আধিকার।  
তোমরা জাত কচরি, তোমার বড়ই ফুটনি  
পেঁচর গর্তে কলি মিয়া বলা চাওনে কুইলার পুঁতি।  
হারে মথের কলিকাল।

এই গানটিও জোতদারশ্রেণির করণে বাঁধা। কোচরি ও মাকলা এক ধরনের পাখি। কোচরি অনুযায়ী পেঁচর গর্তে জন্ম হওয়ায় এরা নীচুহেলি পাখি। ময়না হচ্ছে উচ্চ শ্রেণির পাখি ও মর্যাদার প্রতীক। গানটিতে আধিকারকে কোচরি ও জোতদারকে ময়নার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সমাজের দুটি স্তরকে গানটির মধ্যে পরিভাষারূপে ধরা যাচ্ছে। এই গানটিও আন্দোলনের সময়ের রচনা, জোতদার ও আধিকারের প্রকাশ। বাপ-বেটা সম্পর্কের অন্তরালে সামাজিক মানসিক ভাবে শোষণের যে সম্পর্ক বিদ্যমান, এই গানটির মধ্যে দিয়ে আধিকারের প্রতি জোতদারের জৈববিশ্বের আঙ্গুরে সেই সম্পর্ক প্রকটভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। জোতদার-আধিকারের মধ্যে শুধু সামাজিক দূরত্ব নয়, এক তাঁর জৈববিশ্বের সংগঠন হিসাবেও গানটিকে চিহ্নিত করা সম্ভব। (লক্ষণীয়, এ

গানটিতে আন্দোলনকারী আধিয়ারদের গিরি বগে বিদ্যুৎ কল হুয়েছে, কিন্তু কখনই তাদের জোতদারের মর্খাদা দেওয়া হচ্ছে না।)

ষটি-এর দশকে নকশালবাড়ি কৃষক-আন্দোলনের অন্তিম পর্যায়েও আধিয়াররা যে অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করতে পারেনি নানা কারণে, সে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সাধারণ জোতদাররাও পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলা না করতে পেয়ে অভাব জনটনের মুখে পড়ে এবং তাদের পুরানো প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলতে থাকে। অর্থাৎ পরিণামে দু-এক ঘর ক্ষমতাশালী জোতদার পরিবার বাদে সমগ্র রাজবংশী সম্প্রদায় যেন পরবর্তীকালে একটি শ্রেণিতে পরিণত হয়। আর সেই শ্রেণিটি অবশ্যই বহিঃশ্রেণি। এক ক্ষয়িক্ষ অর্থনীতির পীড়নে সমগ্র জনমানস শ্রান্ত হতে থাকে। পুরানো দিনের সুখস্বপ্নে বিভোর হয় অগ্রীতের জোতদার পরিবারের মানুষেরা। বর্তমান দারিদ্র্যের জন্য ক্লিষ্ট করে। সেই সঙ্গে বর্তমানে আধিয়ার ক্ষেত্রমণ্ডলে ইতারনিনের সঙ্গে নিজেদের সমাপাতার মনে করে। এমনই একটি গান নিচে দেওয়া হল :

দেখিয়া নংসারের গতি মনে মনে কান্না

জিনা না যায় ধনীগরিব, সবাকো ভাই সমান ব্যবহারে।

ওরে সুখের দিন চলি গেল

হয় ঠিক মাগিছে তেল

সিন্দুর দিন পড়েছে আবহা

পূর্ণা পয়সা মিলিয়ে তেল

এতে সুখশান্তি আর কুন কাগে তেল

এতে কিয় রতি ভাবনা, চিত্তের কি ভাবনা

একি সেই মরিখে, তকি হয়তো না মরিখে তেল

দিন কটিতে হইল দায়

ওরে সুখের না সুখের কি ভাবনা

এই গানের গানটি আন্দোলন সম্প্রদায়ের এই গানটি জীবন সত্যকে বোঝায়। এতে গানের মধ্যে পূর্বতন শ্রেণিপাথক্য অনুপস্থিত। গানটির মতো কিত্তি গেল সমগ্র রাজবংশী সম্প্রদায়ই বহিঃশ্রেণির পীড়নে হতবাকের মধ্যে উঠবে।

ভয় লাগেছে কলির ভাবটারে দেখিয়া

চৈত-মাসে গাভহেছে রোপ।

৩০৮

তাই কি তার আদরত পইচনারে ভাই

মকইর ছাত্তুয়া

ভয় লাগেছে কলির ভাবটারে দেখিয়া।

ওরে, লাভের কথা না যায় কথা

পেটের ডাকে কান্দে ছাত্তুয়া

ত্যাগত লোকলা অপবেশন হচ্ছেরে

বেশ হুসপাতালে যায়।

অর্থাৎ দিনকাল এমনই পড়ল যে চৈত্রমাসে নতুন বীজ রোপণ করা হচ্ছে বটে, কি তা সত্ত্বেও মকই-এর ছাত্তু খেয়ে পেট ভরাতে হচ্ছে। শিশুর কান্না অহরহ শোনা যাচ্ছে। আর পয়সায় লোভে তাবং লোকেরা নিবীজকরণ শিবিরে যাচ্ছে। এ-লজ্জার কথা কাকেই বা শোনাবে?

সামাজিক ও আর্থিক সম্পর্কের বেশ কিছু পরিবর্তন, কৃষির অবনতি, জনসংখ্যার চাপ, বিপদগামী ও বিপদস্ত্র অর্থনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত উদ্ভাবন কারণে সমাজজীবনে যে পরিবর্তন ঘটছে, সে সম্পর্কে রাজবংশী লোকগীতিকাররা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের পাঁচালীগানের মধ্যে নিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধের প্রথমদিকে আলোচিত লোকসংগীতের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই এই পাঁচালী গানের মধ্যে উপস্থিত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে গানগুলি সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও গানগুলির মধ্যে একধরনের অন্তর্নিহিত নীতিগত প্রশ্ন লক্ষ্য করা যায়। এই নীতিগত প্রশ্নগুলি আবার সামাজিক সম্পর্কগুলির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক, জোতদার-আধিয়ারের মধ্যে সম্পর্ক, ইত্যাদি। সম্পর্কগুলির নৈতিক দিক নিয়ে কিছু চিন্তার পরোক্ষ অভিব্যক্তি ঘটেছে গানগুলির মধ্যে। ঐ সমস্ত সামাজিক সমস্যাগুলি বৌদ্ধ জীবনে কখনও তাদের শ্রেণিসত্ত্ব, কখনবা সমগ্র সম্প্রদায়টির অস্তিত্বে বেভাবে আলোড়ন তুলেছে, আঘাত করছে, রাজবংশী লোকগীতিকাররা তাদের অনুভূতিগুলি ঠিক সেইভাবে এবং সোজাসুজিভাবে পাঁচালীগানে বিশেষত মান-পাঁচালীগানের মধ্যে প্রকাশ করছেন। গানগুলির মধ্যে কোনরকম ভাবালুতা বা কল্পনাবিলাস উপস্থাপিত হয়নি পরন্তু গানগুলি অতিমাত্রায় সমাজ-অবলম্বী এবং বক্তব্যগ্নিক। রাজবংশীদের পাঁচালীগানে এই বক্তব্যগ্নিকতার ঐতিহ্য তাদের সংস্কৃতির একটা দিক উল্লেখিত করে।

৩০৯

সঙ্গীতের কাঠামোর লিক থেকে কলা যায়, পাঁচালী গানগুলির সুর সরল। একই গুচ্ছ পর্দার ওপর গানটি ওঠানামা করে। সামগ্রিকভাবে শ্রোতার ওপর এক রোমন্থামান যন্ত্রণার মত অভিঘাত সৃষ্টি করে। এটি অবশ্যই আমাদের শহরে কানে মানে হলেও রাজবংশী গায়করাও পাঁচালীর সুরকে কলশ বলতে আপত্তি করেননি। বিভিন্ন গানগুলির সুরের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। গানগুলির ভাষা স্থানীয় রাজবংশীদের ভাষা ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের অনুসারী। বিষয়বস্তুর দিক থেকে গানগুলি সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক। গানগুলির মধ্যে, বিশেষত মান-পাঁচালীতে প্রাকৃতিক উপমা ও রূপকল্পের অভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। এই প্রবন্ধের নমুনা-গানগুলির মধ্যে কেবল রং-পাঁচালীতে উড়ালপাখী, পিঙ্কর, পূর্ণিমার চাঁদ ও তিক্ত নিমের উপমা পাওয়া গেছে। মান-পাঁচালীর একটি গানে মর্যাদার প্রশ্নে ময়না, কেচেরি ইত্যাদি পাখির উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। রাজবংশীদের পাঁচালীগানে কল্পনাপ্রবণতার অভাব থাকলেও অন্যান্য লোক-সঙ্গীতের মতই আবেগসম্পন্ন উপযোগী বিভিন্ন টান টোন—যেমন, ওরে, হুয়রে, মরিরে, ইত্যাদি যথাবিহিত উপস্থিত থাকে। নকশালবাড়ির রাজবংশীদের পাঁচালীগানের গায়কী সম্পূর্ণভাবেই গ্রাম্য, এবং কোন ধরনের শহুরেপনার প্রভাব এখনও গানগুলির ওপর পড়েনি।

সব মিলিয়ে কলা যায়—নকশালবাড়ি অঞ্চলের রাজবংশীদের পাঁচালীগান বিশেষভাবে সমাজমুখী, বস্তুতাত্ত্বিক। স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশে অভিলাষী এবং কথা ও সুরে আঞ্চলিক রাজবংশী ঐতিহ্যের অনুসারী। গানগুলি এককভাবে নৈমিত্তিক এবং অনেকাংশে সাময়িক বা তাৎক্ষণিক। তবে স্থানীয় ও নিতানৈমিত্তিক সামাজিক সমস্যাগুলি বিচার করতে গিয়ে রাজবংশী লোকসঙ্গীতকাররা তাঁদের পাঁচালীগানকে বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উদ্ভীর্ণ করেছেন এমন উদাহরণও অপ্রচল নয়। আর এখানেই এই গানগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য। কিন্তু রাজবংশীদের এই ঐতিহ্যকে আজকের গণপ্রচার মাধ্যম ও যন্ত্রগুলির প্রভাবে আধুনিক শহুরে চটকদার পদ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় নানান হচ্ছে। যার ফলে বর্তমান প্রজন্মের, যারা স্কুল কলেজে পড়ছে, শহুরে যাওয়া আসা করছে, তাদের কাছে পাঁচালীর থেকে হিন্দি সিনেমার গানই বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। কিছু রাজবংশী শিল্পীরা প্রচারমাধ্যম পরিবেশিত তথ্যবহিত পল্লীগীতি অকলসন করে অনুষ্ঠান করেছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, নকশালবাড়ির রাজবংশীদের মধ্যে বিকৃত শহুরে সংস্কৃতির প্রসার কখনও বিস্তৃত হয়ে ওঠেনি এবং উৎপাটিত হওয়ার পরিবর্তে

পাঁচালীগান এখনও তার শিকড় সমাজের মাটিতে প্রোথিত রাখতে পেরেছে।  
(বিশেষ কৃতজ্ঞতা : বোকা মহম্মদার, লেখক - বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ)

#### গ্রন্থপঞ্জী

- ১। হেমন্ত বিশ্বাস—লোকসংগীত সমীক্ষা, বাঙ্গলা ও আসাম (১৩৮৫)
- ২। উদ্ভিধান, টি কে এন, ইন্ডেনেস; যোগেন্দ্র সিং—টুমার্ডস্ এ সোসিওলজি অফ কালচার ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ১৬-৩৪, (১৯৩৫)
- ৩। বরপকুমার চক্রবর্তী—বাংলা লোকসংগীত চর্চায় ইতিহাস (১৩৮৪)
- ৪। সুব্রুকার সেন—বাংলা সাহিত্যের কথা (১৯৪৫)
- ৫। আনন্দোব ভট্টাচার্য—লোকসঙ্গীত রত্নাকর।
- ৬। —এ—
- ৭। সুপ্রকাশ রায়—ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।
- ৮। আবদুল্লাহ রসুল—কৃষকসভার ইতিহাস।
- ৯। মুরারি ঘোষ—প্রবন্ধ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, নতুন সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও শোষণের জাল', সমাজ বিজ্ঞানী পত্রিকা (মার্চ ১৯৮০ সংখ্যা) তে প্রকাশিত।
- ১০। সোমপ্রকাশ, ৪ঠা আশ্বিন ১২৭১, মুরারি ঘোষ-এর প্রবন্ধ থেকে সংকলিত—সূত্র ১, এ।
- ১১। পশ্চিমবাংলা যা হতে পারে, ২য় বণ্ড, গ্রামের পরিকল্পনা—পশ্চিমবঙ্গ সাময়িক অঞ্চল উন্নয়ন পর্বদ পুস্তিক, ১৯৭৭
- ১২। আশিস কুমার রায়—দি প্রিন্স থাণ্ডার অ্যান্ড অফটার, (১৯৭৫)।
- ১৩। গেষ্ট—হিন্দি-অফ-আসাম, পৃ-৪৭
- ১৪। রিজলে—দি ট্রাইব্‌স্ অ্যান্ড কাইন্স অফ বেঙ্গল, ১ম বণ্ড, পৃ-৪১১।
- ১৫। দেনাশিস দাসগুপ্ত—মায়াবন্ধকী (দেশ, ৯ অক্টোবর, ১৯৮২)
- ১৬। প্রিন্সি কাউন্সিলের এই উক্তিটি চারুচন্দ্র সন্যাল-এর 'দি রাজবংশীস-অফ নর্থবেঙ্গল' বই থেকে সংগৃহীত, পৃ-৯।
- ১৭। পার্শ্বনাথ মুখার্জী—প্রবন্ধ : 'নকশালবাড়ি মুভমেন্ট অ্যান্ড প্রিজন্ট রিজন্ট ইন নর্থবেঙ্গল', এমএসএ রাও সম্পাদিত 'সেসাল মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে সংকলিত (১৯৭৭)।
- ১৮। চারুচন্দ্র সন্যাল—রাজবংশীস্ অফ নর্থবেঙ্গল (১৯৬৫)।
- ১৯। নির্মলেশু ভৌমিক—'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' (১৩৮৪)
- ২০। চারুচন্দ্র সন্যাল—সূত্র—এ, পৃ-২৩৫।

# বাঙলা সাহিত্যে মতুরা আন্দোলনের প্রভাব

জীবনকুমার সরকার

মতুরা ধর্ম এবং হরিচাঁদ গুরুচাঁদের নাম এই মুহূর্তে ভুবন আলোড়িত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ও ধর্ম বিপ্লবে অনেকের মতো হরিচাঁদ গুরুচাঁদের অবদান কোনো অংশে কম নয়। দুঃখের বিষয়ে, হরিচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত মতুরা আন্দোলনের কথা, সমাজ সংস্কারের কথা ইতিহাসে যথাযথভাবে চর্চা হলো না। যেমনটা হয়েছে চৈতন্যের ক্ষেত্রে, তেমনটা হয়নি হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের ক্ষেত্রে। এই তিনজনই সমাজবিপ্লবী ও ধর্মবিপ্লবী। চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) মধ্যযুগের যৌর অন্ধকারের মধ্যে আলো ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। সময়ের নিরিখে সে এক ইম্পাত কঠিন কাজ। তবু চৈতন্য অমাবস্যার সুকুটিকে ভয় করেননি। তাঁর সমকালে সমগ্র বঙ্গে, এমনকী ভারত উপমহাদেশে তাঁর সমকূল্য মানবিকযোদ্ধা বিরল ছিল। ফলে তাঁকে 'দ্বিরেই প্রথম রচিত হয়েছিল জীবনী-সাহিত্য। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য সমকূল্য পেরিয়ে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং সূর্যের মতো বিজুত একইভাবে উনিশ শতকের ভাববিশেষ পরিচাণ্ড ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে বঙ্গভারতীয় উপমহাদেশে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন একদিকে লালন (১৭৭৪-১৮৯০) অন্যদিকে ব্রাতা মানুষের মুক্তিলাভ হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮)। চৈতন্য এবং লালন ইতিহাস এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বেশ আলোচিত নাম। উপেক্ষিত কেবল হরিচাঁদ ঠাকুর, যার সমগ্র কাজের মূল্যায়ন এখনও হয়নি। ইতিহাসের আড়ালেই থেকে গেছেন তিনি। সমাজবিজ্ঞানীরাও তাঁকে করেছেন উপেক্ষা। অথচ অবিভক্ত ভারতে, বৃহৎবঙ্গে 'মতুরাধর্ম' প্রবর্তন করে মতুরা আন্দোলনের মাধ্যমে অস্পৃষ্ট, ব্রাতা ও উপেক্ষিত মানুষের মুক্তির দিশায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভারতবর্ষের ধর্মীয় স্ফটিকান হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

প্রাচীনকাল থেকে সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণি যে দুর্দশার করুণ কাহিনি ও শোচনীয় দ্বারা তা বহমান ছিল, তা নির্মূল করতে চেয়েছিলেন প্রথম গৌতম বুদ্ধ। ক্রমশ গৌতম বুদ্ধ পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধধর্মকে পুনরায় গ্রাস করে নেয়। তারপর সৌখ্য অক্রমণ ও বিজয়ের মধ্যে ভারতবর্ষে বাংলার মাটিতে ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত

জীবনকুমার সরকার

আবারও ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে। মুঘল রাজত্বের প্রায় ৭০০ বছরের মধ্যেই চৈতন্যযুগ সূচিত হয়। কেননা তিনিও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর মৃত্যুর প্রায় একশ বছরের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনর্নিমাণ করে তার সকল আশ্রয়ালয় ও জাত ব্যবস্থা। ফলে বাংলার নিম্নবর্ণীয় মানুষ, ব্রাতা, উপেক্ষিত জনতা ব্রাহ্মণ্যবাদের জাত ব্যবস্থার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। তাল অন্ধকারে ডুবে যায় দলিত-দরিদ্রের রক্তিমসূর্য। বুদ্ধ-চৈতন্য-লালনের মানবিক ইতিহাস। এসব কথা আজ আর কারো অজানা নয়। কেউ যদি ইচ্ছে করে না জানতে চান, সে কথা অলপা। সমাজবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এই সময় নতুন করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আরো সাহসের সঙ্গে নতুন নতুন ইতিহাস পুনর্নির্মিত হচ্ছে, যা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আড়িনাকে ভরিয়ে তুলছে।

বাংলা জীবনসাহিত্য প্রথম যাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল, তিনি চৈতন্য। ঠিক একইভাবে চৈতন্য পরবর্তীতে উনিশ-বিশ শতকে জীবনীসাহিত্য রচিত হয় যে দু'জন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, তাঁরা হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর। কঠিন বিশ্বাসের বিষয়, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদকে কেন্দ্র করে যে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হলো তার হিন্দু বাংলা সাহিত্যের চলমান ইতিহাসে নেই। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা ঘৃণাক্ষরেও জানতে পারেনি এবং এখনও পারছে না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

“প্রত্যেক জাতিকে তাহাদের নিজ নিজ ইতিহাস লিখতে হইবে। এক জাতি অন্য জাতির ইতিহাস লিখিয়া দেয় না... কোন জাতির সংকটকালে তার ইতিহাসমণ্ডিত জাতীয় ইতিহাসই একমাত্র পথনির্দেশক। এই ইতিহাস যে জাতির আছে অথচ বিশ্বত তারা অন্ধ খঞ্জের মতই প্রতিবন্ধী।”

আমাদের এখন মনে হচ্ছে, ইতিহাসের কাছে আশ্রয় নিয়ে, সুদূর অতীত থেকেই আমাদের দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশেষ এক শ্রেণির দ্বারা অবতাসে পূর্ণ। তাই বৃহত্তর দলিত মানুষের জীবন ও দলিত মানুষের রচিত সাহিত্য সূক্ষ্ম বিচারে আলোকপ্রাপ্ত হলো না কখনও। চাতুর্ঘ্যের এই মহাসমারোহে স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়ে গেছে মতুরা আন্দোলন প্রভাবিত সাহিত্য।

আজ থেকে দু'বছর আগে অবিভক্ত ভারতবর্ষের, বঙ্গের অখ্যাত গ্রামে

জন্মেছিলেন যুগানায়ক, মানবমুক্তির দিশারী হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮)। উনিশ শতকের প্রারম্ভে হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব ও মতুয়া ধর্মের সৃষ্টি এক যুগান্তকারী ঘটনা। ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্য-শোষণ-নির্ব্যতন প্রভৃতির থেকে ব্রাহ্ম মানুষের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে তৈরি করেছিলেন 'মতুয়া ধর্ম'। সাধারণত কোনোকিছু সৃষ্টির উৎসে থাকে প্রচুর তত্ত্বজ্ঞান, নতুবা ব্যাপক বিদ্যার পরিসর। সেই অর্থে মতুয়া ধর্ম কোনো বিশাল তত্ত্ব বা ভারিকি বিদ্যার প্রতিফলনও নয়। আর হরিচাঁদ ঠাকুর কোনো ভিত্তিধারী ব্যক্তিও নন। অথচ অল্প পাড়াগাঁ থেকে তৈরি করলেন সরল-সহজ কিন্তু যুগান্তকারী 'মতুয়া তত্ত্ব'। এই তত্ত্বেই ভেসে উঠেছিল সমকালীন বঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষ, নির্পীড়িত জনগণ; যা উনিশ শতক পেরিয়ে, বিশ শতকের ভারত উপমহাদেশে অতিক্রম করে একুশ শতকের বিশ্বভ্রমণে প্রয়াসী। ফলে কারও অপেক্ষায় না থেকে মতুয়া আন্দোলন নিজেই দুর্বীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। বুদ্ধ-চৈতন্য-লালনের ঐতিহ্য আর পরম্পরার আধুনিক রূপ হলো হরিচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত মতুয়া ধর্মোন্দোলন।

মধ্যযুগ যেমন চৈতন্য সংস্কৃতির প্রবাহে, প্লাবনে ভেসে উঠেছিল, তেমনি হরিচাঁদ সংস্কৃতিতে উনিশ শতকের গ্রামবাংলা ভেসে উঠেছিল। প্রান্তিক বাংলায় অস্পৃশ্য জনতার মধ্যে দেখা দেয় বিপ্লব। মানবপ্রেম আর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এত বড়ো সংগ্রাম খুবই কম দেখা গেছে। যার ফলে সাহিত্য জগতে উদ্ভব হয়েছিল এক নতুন ধারার। গ্রাম বাংলার মেঠো ভাষা, উপভাষায় অভিব্যক্তি হলো নতুন সাহিত্যের, নতুন যুগের। হরিচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সাহিত্যের নাম 'মতুয়া সাহিত্য'। হরিচাঁদ ঠাকুরের সংগ্রামী জীবন ও বিশ্ববাস্তব আদর্শ অবলম্বনে এই ধারার সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছে বাঙালির ভুবনকে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল জীবনচর্চা আর ধর্মীয় সাধনার অভিজ্ঞতা দিয়ে, যার ফলে আমরা 'চর্যাপদ'-এর মতো সাহিত্য পেয়েছি ('চর্যাপদ' রচিত হয়েছিল অন্ত্যজ শ্রেণির টীকাকারদের হাতেই)। সুতরাং মতুয়া ধর্মোদ্ভূত সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দুঃখের বিষয়, হরি-গুরুচাঁদ বিষয়ক জীবনীগ্রন্থের তথ্য মতুয়া সাহিত্যের প্রসঙ্গ ও পর্যালোচনায় সমকালীন সাহিত্যে কেউ কলমের কালি একটু ব্যয় করলেন না। একেই কি তবে বলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রকৌশল ও কূট প্রকরণের ইশারা। কিন্তু মহাসময়ের দুটি এই উৎপাদিত সত্যকে ভাঙবেই। ভাঙনের খেলা সবে শুরু। চারিদিকে তাই ডগা, আর লাল নিশানের

বিজয় আখ্যান খুঁজে নিতে তৎপর নিম্নবর্ণীয় জনগণ। এই নিরিখে নির্মিত হচ্ছে চতুর্বর্ণের ভুবন। হরিচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের এত আয়োজন, এত বহুৈরখিক মাত্রা—

- হরিচাঁদ ঠাকুর ও (৭৮৭৮-১৮৭৮) রচিত মতুয়া সাহিত্য
- জীবনী বা চরিত সাহিত্য
    - (১. কাব্য, ২. নাটক, ৩. গদ্য)
  - পাঁচালী ও ব্রতকথা বা নীতিতত্ত্ব নির্দেশিকা
  - গবেষণা পত্র ও প্রবন্ধ সাহিত্য
  - কবিগান বা কড়চা
    - (১. দেশোয়ালী গান, ২. টগা, ৩. গণসংগীত)
  - মতুয়া পদাবলী
    - (১. পদ কীর্তন, ২. অষ্টক ও শ্লোক, ৩. পালাগান, ৪. সংগীত)
  - যাত্রাপালা ও নাটক
    - (১. মতুয়া নাটক, ২. সামাজিক নাটক, ৩. ভক্ত সাধক নাটক ইত্যাদি)
  - লোক সংগীত বা পল্লিগীতি
    - (১. সারি গান, ২. জারি গান, ৩. ধূয়া গান ইত্যাদি)

হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবন ও মতুয়া নিয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার (১৮৪৫-১৯১৫)। তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ 'শ্রীশ্রী মহাসংকীর্তন' (১৮৭০ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থই মতুয়া সমাজের প্রথম গ্রন্থ বলে জানা যায়। তারপরেই প্রকাশিত হয় মতুয়া আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনকেন্দ্রিক গ্রন্থ 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' (১৮৭৩ বঙ্গাব্দ)। সাহিত্যমূল্যে গ্রন্থ দুটির গুরুত্ব অপরিমিত। সমকালীন বাংলার অন্ত্যজ শূদ্র ও অস্পৃশ্য জাতির জীবনে হিন্দুধর্মের জাতব্যবস্থা কী নির্মম ছিল, তার জ্বলন্ত ইতিহাস এসে আছে। জাতপাতের বিশৃঙ্খলায় জর্জরিত ছিল সমাজজীবন। আর অন্যদিকে ছিল সামন্ত জমিদার তথা ব্রাহ্মণ প্রভুদের সরাসরি নির্বাতন। প্রভুদের নামে, ধর্মের নামে তাল তাল অশ্রুকারে রেখে দেওয়া হয়েছিল দলিত-দরিদ্র জনগণকে। শ্রমের প্রতি যত্নশীল, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী নমঃশূদ্র সহ অন্যান্য অনগ্রসর জনগণকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত হিন্দু ধর্মের নামে তাদের সবকিছু থেকে বঞ্চিত করেছে। এই শোষণ

গানটির ইতিহাস কবি তারকচন্দ্র সরকার কাব্যবর্ণনে তুলে ধরেছেন—

“ভাত্রমাসে জমিদার কাছারী আসিয়া।  
অইসব বচনিক শুনিলা বসিয়া॥  
গোমস্তা বলিল সব বাবুর গোচরে।  
‘কৃষ্ণদাস কাছারি আসিয়া নিন্দা করে॥  
সহজে কিনয় করি রামায়ণ কয়।  
নিন্দা করিয়াছে তার মনে যত নয়॥  
বিভীষণের উপাখ্যান কহে ব্যরবার।  
করিল ব্রাহ্মণ রাজা দূরের আচার॥”  
শুনে বলিলেন মজুমদার মহাশয়।  
“টাকাগুলি না দেওয়া তো বড়ই অন্যায়॥”  
গোমস্তা বলিল, “কেশ টাকা নিতে পারে।  
কাছারি আসিয়া কেন এত নিন্দা করে?  
আছে নয় কৃষ্ণদাস বড় মান্যবান।  
তমে তম্ ভরসে মম কীসে থাকে মান?  
মজুমদার বলে, “চল যাইব এখনে।  
এত নিন্দা কেন করে আসি গিয়ে শুনে॥”  
গোমস্তা হুকুম দিল পেয়াদার পর।  
“কৃষ্ণদাস কাছে হও দুই সনা কর  
তব টাকা যেই জন হাওলাত নি’ছে।  
আদায় করগে টাকা গিয়ে তার কাছে”॥

(‘শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত’)

মতু তাই নয়, কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার কবিগানের ক্ষেত্রেও পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। মূলত তিনিই পূর্ব বাংলার কবিগানে নতুন জোয়ার ও প্লাবন বয়ে আনেন। তাঁর মতো কবিগান রচয়িতা সমকালে ছিল না বললেই চলে। তাঁর গানের বিশ্ববীক্ষা প্রত্যাখ্যান করার মতো ছিল না, অথচ তাঁর কবিগান তথা সাহিত্য নিয়ে যথার্থ মূল্যায়ন হলো না। শাল্লপুরাণ আশ্রিত অশ্লীল ও ভীষণতায় মোটেই তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ভাবসমৃদ্ধ কবিগানের তিনিই প্রতীক। তাঁকে বাদ দিয়ে পূর্ববঙ্গের কবিগান আলোচনাই করা যায় না। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি বিখ্যাত গান এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন। গানটি ‘বিরহ পর্বায়ের, যা আজও কবি আসরে লোককবিগণ পরিবেশন করেন এবং মতুয়া ভক্তসমাজে

গানটির গ্রন্থযোগ্যতা অতুলনীয় —

“আমার মন নিল যে জন হরে পাই কোথায় তারে।  
আমি তারই দাসী দিবনিশি সই রে  
আমার তার জন্য নয়ন ধরে॥  
অরুণ নয়ন যার হৃৎ বঁকা হতে পারে উল্লসে  
যেন চাঁক হিন্দুল মাখা  
হল কী ক্ষণে তার সঙ্গে দেখা সই রে  
নিল সেই হতে পাগল করে॥  
আমি গৃহী কি কচাঙ্গী সম্যাসী কি ফকিরী  
কিছু বুঝতে না পারি  
আমি কী করিতে কী না করি সই রে  
আমি চিনতে নারি আমারে॥  
যত ধর্ম কর্ম জগতে সাধন ভজন সাধুতে  
করে বহুবিধ মতে  
আমার মন মজে না তার কিছুতেই সই রে  
কেবল চায় সে প্রাণনাথেরে॥  
তোরা গৃহে রইতে বলিস সই  
আমি কী ধন লয়ে গৃহে রই  
আমার সাধনের ধন কই  
বুকে ধানটা দিলে হয় পোড়া খঁহ সই রে  
তোরা দেখনা আমার বুকে ধরে॥  
মহানন্দ কর মানুষ রতন পেল গোলোক হীরামন  
তারা জুড়াল জীবন  
তারক নাই তোর সাধন করগে রোদন হয় রে  
শ্রী গুরুচাঁদের চরণ ধরে॥”  
(দ্বিশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, শ্রী হরিশচন্দ্র ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম আন্দোলন, পৃ: ২৩৯)

মতুয়া ধর্ম আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারকচন্দ্র যেমন মননের তরঙ্গরি চালনা করে কাব্যস্রোতে প্রান্তকায়িত মানুষের কথা বলেছেন, তেমনি মতুয়া ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো অনেকেই প্রতাপসর্বস্ব চিন্তাপ্রণালীকে প্রত্যাখ্যান করে নিম্নবর্ণীয় সাহিত্যের উপমহাদেশ তৈরি করে গেছেন। যেমন—

| লেখক                          | গ্রন্থ                              | প্রকাশকাল     |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ১। আচার্য সদানন্দ হালদার      | 'শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর'            | অপ্রকাশিত     |
| ২। সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস        | 'শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর'            | ১৩৫০ বঙ্গাব্দ |
| ৩। দেবেন্দ্রলাল বিশ্বাস ঠাকুর | 'পরম পুরুষ হরিচাঁদ'                 | ১৯৮৫ খ্রিঃ    |
| ৪। ডাঃ নিত্যানন্দ হালদার      | 'ছোটোদের হরিচাঁদ'                   | ১৯৮৫ খ্রিঃ    |
| ৫। সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে        | 'যুগাবতার শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর' ? |               |
| ৬। প্রমিলা বিশ্বাস            | হরিকথা                              | ১৯৮৫ খ্রিঃ    |
| ৭। মহানন্দ হালদার             | 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত'            | ১৩৫০ বঙ্গাব্দ |
| ৮। বিচরণ পাণ্ডল               | 'শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ চরিত সুখা'   | ১৩৫১ বঙ্গাব্দ |
| ৯। নিতাই চাঁদ মণ্ডল           | 'যুগনায়ক গুরুচাঁদ'                 | ১৩৮২ বঙ্গাব্দ |
| ১০। গৌরগোপাল কাব্যভূষণ        | 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ'                 | ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ |
| ১১। ননীগোপাল দাস              | 'কবি রসরাজ তারক গোসাই'              | ১৯৮২ খ্রিঃ    |
| ১২। কীরণচন্দ্র ব্রহ্ম         | 'সাধক প্রবর আশ্বিনী গোসাই'          | ১৩৮১ বঙ্গাব্দ |
| ১৩। জগবন্ধু মিশ্র             | 'শ্রীশ্রীগোপাল চাঁদ লীলামৃত'        |               |
|                               | ১ম খণ্ড                             | ১৩৯০ বঙ্গাব্দ |
| ১৪। মহানন্দ হালদার            | 'সোনার মানুষ গোপাল সাধু'            |               |
|                               | ১ম খণ্ড                             | ১৯৯২ খ্রিঃ    |
| ১৫। সুকুমার হালদার            | 'কবি শেখর আচার্য মহানন্দ হালদার'    | ১৩১০ খ্রিঃ    |
| ১৬। বিচরণ পাণ্ডল              | 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ মাহাত্ম্য'       | ?             |
| ১৭। ড. পরমানন্দ হালদার        | 'মতুরা ধর্ম দর্শন'                  | ?             |
| ১৮। বিরূপ তালুকদার            | 'বিশ্ব মহামণ্ডলে মতুরা ধর্ম'        | ?             |
| ১৯। ডাঃ নিত্যানন্দ হালদার     | 'শ্রীহরি দর্শন'                     | ?             |
| ২০। নিত্যানন্দ হালদার         | 'মতুরা ধর্মতত্ত্ব সার'              | ?             |
| ২১। Bhagban Chandra Biswas    | 'Sree Harichand Thakur'             |               |
| ২২। নবকুমার রায়              | 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ কথামৃত'          |               |
| ২৩। নবকুমার রায়              | 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ পূজাবিধি'        |               |
| ২৪। হরিবর সরকার               | 'দ্বাদশ আজ্ঞা'                      |               |
| ২৫। সুধনাকুমার ঠাকুর          | 'সদ্ধাকা সংগ্রহ'                    |               |

|                           |                                            |            |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------|
| ২৬। দেবেন্দ্রলাল বিশ্বাস  | 'গুরুচাঁদ হরিগীতা'                         |            |
| ২৭। দেবেন্দ্রলাল বিশ্বাস  | 'বৌদ্ধ ধর্ম মতুরা ধর্মের সমীক্ষা'          |            |
| ২৮। দেবেন্দ্রলাল বিশ্বাস  | 'মতুরা বিবাহ শ্রাদ্ধাদি বিধান'             |            |
| ২৯। সুনীল কুমার রায়      | 'হরিতত্ত্ব মালা'                           |            |
| ৩০। মহানন্দ হালদার        | 'শ্রীশ্রী শান্তি মায়ের পাঁচালী ও ব্রতকথা' |            |
| ৩১। স্বরূপেন্দু সরকার     | 'শ্রীশ্রী হরিঠাকুরের পাঁচালী'              |            |
| ৩২। গৌরগোপাল কাব্যভূষণ    | 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ'                        |            |
| ৩৩। শ্রীপতি প্রসন্ন ঠাকুর | 'পট্টিচক্র ও সাধনতত্ত্ব'                   |            |
| ৩৪। হরিবর সরকার           | 'মহাবারুণী'                                |            |
| ৩৫। সুরেশ বিশ্বাস         | 'শ্রীহরি ঠাকুর'                            |            |
| ৩৬। কর্ণধর রায়           | 'মতুরা দর্পণ'                              |            |
| ৩৭। সমুদ্র বিশ্বাস        | 'জয় হরিচাঁদ জয় গুরুচাঁদ'                 | ১৯৯০ খ্রিঃ |
| ৩৮। মনোরঞ্জন ব্যাপারী     | মতুরা এক মুক্তি সেনা                       | ২০১৪ খ্রিঃ |
| ৩৯। হর্যবর্জুন চৌধুরী     | ভক্ষক                                      | ২০১৫ খ্রিঃ |

দুর্যের বিষয় মতুরা আন্দোলনের ফসল এই সকল লেখক ও গ্রন্থের নাম বাংলা সাহিত্যের লেখক-গবেষকরাই তো জানেন না, সাধারণ পাঠক তো দূরের কথা। এখানে 'অরণ্য রাখা প্রয়োজন, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ সমকালীন সময়ে নির্মিত সবগুলো লেখক ও গ্রন্থের নাম সংগ্রহ করা গেল না। আমার ধারণা আরও অসংখ্য লেখক গ্রন্থ লিখেছেন।

উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে গুরুচাঁদ ঠাকুরের অনন্য জীবন ও দর্শনকে নিয়ে জীবনচরিত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত' (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের পর বাংলা সাহিত্যে এটি সর্বোত্তম দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ জীবনীকাব্য। আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীকাব্য বলেই আমার মনে হয়। কবি মহানন্দ হালদারের কাব্যভাষাও অনন্য ও নান্দনিকসম্পূর্ণ। সমকালীন বঙ্গ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের চাতুর্য ও কলাকৌশলে লাবণ্যহীন ছিল গোটা সমাজব্যবস্থা। সেই সময়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-শিক্ষানৈতিক অবস্থার কথা 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত'—তে বথার্থভাবে রূপায়ণ করেন কবি মহানন্দ হালদার (১৯০২-১৯৭২)—

"যত মহাজন

জমিদার

ধনে বলে সব রয়।

অম্পৃশ্য যাহারা কাঙ্গাল তাহারা  
দুঃখে দুঃখে দিন যায়।।  
অম্পৃশ্য বলিয়া এদের ঠেলিয়া  
যায়া দূরে রাখিয়াছে!  
পূজা দিতে পারে সে সব মন্দিরে  
যেতে পারে বটে কাছে।।  
দেবতারে জ্ঞাতি যত দুষ্টমতি  
দিয়াছে আপন মনে।  
হিন্দু পরিচয় শুধু গপ্পায়  
অহিন্দু সকলখানে।।  
দুঃখের ভারতা বলিবে বা কোথা?  
সবে আছে একদলে।  
সব সূচকুর করে দূর দূর  
এরা সব কাছে গেলে।।  
রাজার কাছুরী কর্মচারী  
তার সবে বর্ষ হিন্দু।  
মোরা যদি চাই কছু নাই পাই  
কৃপাকথা একবিন্দু।।  
বিদ্যা শিখিবারে উহাদের থাকে  
স্থান মোরা নাই পাই।  
গেলে পাঠশালা দূরে দেয় ঠেলে  
বিচারক কেহ নাই।।  
মোরা অর্বাচীন রাজার আইন  
জেন কিছু নাই জানি।  
বা বসে উহারা তাহাই আমরা  
আইন বলিয়া মানি।।  
রাজাকে চিনি না প্রাণের বেদনা  
বাণব কাহুর কাছে  
চিনি জমিদার প্রজা তে তাহুর  
ভয় করি মরি পাছে।।  
এমত প্রকারে বঙ্গের ভিতরে  
অম্পৃশ্য জাতির বাস।

আকারে মানব আছে বটে সব  
বিচারে দাসের দাস।।

আমরা অনেকেই গণসাহিত্যের কথা বলি, সাম্যবাদী সাহিত্যের কথা বলি, কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মণ্যবাদী (ভারতবর্ষের নিরিখে) সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত না করে আমাদের দেশে সাম্যবাদী সাহিত্যের পথ কোনোদিনই প্রশস্ত করা যাবে না। হিন্দুধর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণরাই সমাজের অধিপতি এবং ধর্মীয় সংবিধান রচনা করে সাধারণ মানুষকে শোষণ-নির্যাতন করে এসেছে। কিনা পরিশ্রমে ব্রাহ্মণরা সম্পদের মালিক হয়ে বসেছে। শুধু তাই নয়, বর্ণবৈষম্যকে এমনভাবে স্থায়ী করেছে, যা পৃথিবীতে বিরল। এর ফল যে কখনও ভালো হয়নি, সেতো সমাজমনস্করা কত লেখায়, কতভাবে লিখলেন। বিশ্ববিবেক রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীকেও নাড়া দিয়েছিল সমাজের এই অনমানবিক, নিষ্ঠুর প্রথা। তাঁর জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লিখেছেন—

“আমি পন্নীতগামে দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমঃশূত্রদের ক্ষেতে অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে যে সহযোগিতা দাবি করিতে পার আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহার অযোগ্য বলিয়াছে, কিনা অপরাধে আমাদের ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুঃরূপে ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি।”

শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে অনেকটা অংশ জুড়েই রয়েছে ব্রাত্য মানুষের জন্য মানবিক পরিসর। ভারতবর্ষের মূল চালিকা শক্তি শূত্রের পাশে বসে তিনি নির্দিষ্ট ‘পত্রপুট’ (১৯০৬) কাব্যগ্রন্থের ১৫ নং কবিতায় নতুন আত্মপরিচয় উপস্থাপিত করলেন।

“আমি ব্রাত্য, আমি মস্তাইন  
দেবতার নৈবেদ্য পৌছিল না।  
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে  
তামসের পরপার হতে  
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।”

রবীন্দ্রনাথের এ কাব্যবাদী তো আজকের দলিত সাহিত্যের নিশ্চিত পূর্ব পদধ্বনি। কিন্তু আধুনিকতার এ চরম লগ্নেও আজকের লেখকদের মধ্যে (যারা প্রতিষ্ঠিত)

রবীন্দ্রনাথের এ ইশারার চর্চা কোথায়? ব্রাহ্মের রবীন্দ্রনাথ, উপেক্ষিতের রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষেই ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্যশ্রেণিতে উপেক্ষিত। উপেক্ষিত বলেই তাঁর বিশ্বভারতীতে এই শতকের প্রায় শুরুতেই দেখলাম 'জাতির নামে বজ্রাতি'। যার ফলে মৃত্যু আন্দোলনের প্রভাবে এখনও নির্মিত হচ্ছে এমন সব কবিতা—

“আমি চণ্ডাল আমি অস্পৃশ্য  
আমি শূদ্র আমি ব্রাহ্ম  
আমি নমো আমি উপেক্ষিত  
আমি দলিত আমি হীন  
আমি চাঁড়াল আমি পতিত

আমি দলিত মায়ের বিষর বিজ্ঞাপনে মোড়া চাঁদ  
ঘন ঘন কেঁপে ওঠা মার বুকের শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের দুলুনি  
যুদ্ধের নব তীর—  
মাকে মুখড়ে ফেলার জন্য পাড়াভূতো মাসীমা বহুর বগেছে,  
'তোমার নমো, তোমার ছেলে তই—'

নমোদের চাকুরী হতে নেই  
সমাজে থাকতে নেই  
গাড়ি, বাড়ি, ধর্মীয় স্বাধীনতা—কোনোটি নয়। তই তো মনুর  
সংবিধান বলেছে  
শূদ্রের এতো উন্নত হওয়া ভালো নয় ঈশ্বরের পৃথিবীতে  
শোষিত থাকটাই ভালো মানায়  
স্বয়ং ব্রহ্মও তই চান।  
সেজন্য তিনি আগেভাগেই পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—  
কর্ণবাদী ভারতবর্ষ চায় শূদ্রা চিরকাল উন্নত গাথা হয়ে থাক।

বহিরাগত মনুর হলুদ দনবের সামনে আমি ও মা শূদ্রদের মহাভে  
বেঁচে আছি যুদ্ধের আগুন।" (জীবনকুমার সরকার)  
(‘আমি, মা ও পাড়াপড়শি’ / মেথলা  
আকাশ (কাব্য সংকলন), সম্পাদক : এস.এম  
সিরাজুল ইসলাম, জেডব্ল্যাকারি, ২০১৩)

অনেকেই প্রকাশ করেছেন মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ। সমানভাবে আলোচনা করা সম্ভব  
নয়। বেশ বড়ো অলিকা। আশ্চর্য হবার মতো।

বাংলা কথাসাহিত্যেও রয়েছে মৃত্যু আন্দোলনের প্রভাব। মনোরঞ্জন ব্যাপারী, মহীতোষ বিশ্বাস, সুধাংশুশেখর বিশ্বাস, ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক, সমুদ্র বিশ্বাস, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র মজুমদার, সুখমা মৈত্র সরকার, নকুল মল্লিক, যতীন বাল্য, মনোহর মৌলী বিশ্বাস প্রমুখ কথাকারদের গল্প ও উপন্যাসে ভরে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের আঙিনা। আমার কাছে পাওয়া তথ্য অনুসারে কিছু উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের নাম তুলে ধরা সমীচীন মনে করলাম—

| লেখক                    | গ্রন্থ                                                                                                                                                                                                                                                                         | প্রকাশকাল                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। মহীতোষ বিশ্বাস       | ‘মাটি এক মায়া জানে’ (উপন্যাস)<br>‘পায়ে পায়ে পথ’ (উপন্যাস)<br>‘উচ্ছন্ন পরবাস’ (উপন্যাস)<br>‘কিন খগড়ে সংগ্রাম’<br>(আবেদনকারের জীবনীকেন্দ্রিক<br>বৃহৎ উপন্যাস)                                                                                                                | ১৯৭৪ খ্রি:<br>১৯৮৩ খ্রি:<br>১৯৯৫ খ্রি:<br>২০০৩ খ্রি:                                           |
| ২। ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক | ‘রক্তে রাজ্য রূপসী বাংলা’<br>(উপন্যাস) (১ম খণ্ড)<br>‘রক্তে রাজ্য রূপসী বাংলা (উপন্যাস) (২য় ও ৩য় খণ্ড)<br>‘এপার ওপার’ (উপন্যাস)<br>‘কলার মান্দাস’ (উপন্যাস)<br>‘কঁটা তারের বেড়া’ (উপন্যাস)<br>‘বিশ্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী’<br>(জীবনী কেন্দ্রিক উপন্যাস)<br>‘খেংরা’ (গল্পগ্রন্থ) | ১৯৮৮ খ্রি:<br>১৯৮৯ খ্রি:<br>১৯৯৮ খ্রি:<br>২০০১ খ্রি:<br>২০০২ খ্রি:<br>১৯৯৯ খ্রি:<br>১৯৯৭ খ্রি: |
| ৩। সুধাংশুশেখর বিশ্বাস  | ‘মালেঙ চরের গন্ধ’ (উপন্যাস)                                                                                                                                                                                                                                                    | ?                                                                                              |
| ৪। সুধীররঞ্জন হালদার    | ‘অরণ্যের অন্ধকারে’ (উপন্যাস)<br>‘আদরী’ (উপন্যাস)                                                                                                                                                                                                                               | ১৯৯৬ খ্রি:<br>১৯৯৮ খ্রি:                                                                       |
| ৫। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর      | ‘উজ্জ্বলতলীর উপকথা’<br>(উপন্যাস এবং ত্রিপুরা সরকারের<br>অধীত মন্ত্রবর্মা পুরস্কারপ্রাপ্ত)                                                                                                                                                                                      | ২০০০ খ্রি:                                                                                     |
| ৬। অশোক কুমার পাণ্ডে    | ‘কালপং কীদে’ (উপন্যাস)                                                                                                                                                                                                                                                         | ২০০০ খ্রি:                                                                                     |
| ৭। সমরেন্দ্র বৈদ্য      | ‘পিতৃপথ’ (উপন্যাস)                                                                                                                                                                                                                                                             | ১৯৯৮ খ্রি:                                                                                     |
| ৮। যতীন বাল্য           | ‘অমৃতের জীবনকথা’ (উপন্যাস)                                                                                                                                                                                                                                                     | ১৯৯৪ খ্রি:                                                                                     |

| লেখক                  | গ্রন্থ                               | প্রকাশকাল  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| ৯। শরৎচন্দ্র মজুমদার  | 'অসিত ঢালীর গড়' (উপন্যাস)           | ?          |
|                       | 'রাইচরণ চরিত' (উপন্যাস)              | ১৯৮৩ খ্রিঃ |
|                       | 'পত্র মুকুটিকা' (উপন্যাস)            | ১৯৮১ খ্রিঃ |
| ১০। সুব্রত মৈত্রসরকার | 'একে একে এক' (গল্পগ্রন্থ)            | ১৯৭০ খ্রিঃ |
| ১১। নকুল মল্লিক       | 'মহাসিঁধু' (গল্পগ্রন্থ)              | ১৯৯৪ খ্রিঃ |
|                       | 'নির্বাচিত গল্প'                     | ২০০০ খ্রিঃ |
| ১২। মনোহর বিশ্বাস     | 'কৃষ্ণ মৃত্তিকার মানুষ' (গল্পগ্রন্থ) | ১৯৮৮ খ্রিঃ |
| ১৩। গৌতম আলী          | 'জগৎগৃহের ছাই' (গল্পগ্রন্থ)          | ১৯৯৯ খ্রিঃ |
| ১৪। রাজু দাস          | 'ব্রাহ্মজ্ঞানের গল্প' (গল্পগ্রন্থ)   | ২০০০ খ্রিঃ |
| ১৫। অধীর বিশ্বাস      | 'গাও শালিকের বাস' (গল্পগ্রন্থ)       | ১৮৮৯ খ্রিঃ |
| ১৬। সমুদ্র বিশ্বাস    | 'জয়ডঙ্গা' (উপন্যাস)                 | ২০১২ খ্রিঃ |
|                       | বোকামেয়ে                            | ২০১২ খ্রিঃ |
| ১৭। মনোরঞ্জন ব্যাপারী | গল্প সংগ্রহ                          |            |

সাহিত্যে মতুরা আন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী ধারার নাম—প্রবন্ধ সাহিত্য। এই ধারাটি যে কত শক্তিশালী তা কল্পনা করাও কঠিন। ভারতবর্ষের আর কোনো মনীষীর জীবনকে কেন্দ্র করে এত প্রবন্ধের সৃজন উদ্ভূততা লক্ষ করা যায়নি। এই ধারার প্রাবন্ধিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ড. নন্দদুলাল মোহান্ত, ড. বিরাট বৈরাগ্য, নীতীশ বিশ্বাস, অনিল সরকার, ডাঃ জগদীশচন্দ্র হালদার, সুকৃতিরঞ্জন ঠাকুর, অনুপম হীরা মণ্ডল, সন্তোষকুমার বারুই, মনোহর মৌলি বিশ্বাস, ড. মনোরঞ্জন সরকার, সুনীলকুমার রায়, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, স্বতীন বালা, ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, পরিমল কুমার রায়, ড. চিত্ত মণ্ডল, ড. সুরঞ্জন মিশ্র, মীরা হালদার, ইন্দ্রমোহন মণ্ডল, উৎপল বিশ্বাস (বাংলাদেশ), কান্তি বিশ্বাস, অরুণকান্তি মহাপাত্র, সত্যরঞ্জন রায়, সদরনন্দ বিশ্বাস, বিমলেন্দু হালদার, নিত্যানন্দ হালদার, অসিতবরণ ঠাকুর, মণিমোহন বৈরাগী, নকুল মল্লিক, অমলকুমার মণ্ডল, মুঞ্জু বালা, দেবাশিস মণ্ডল, শিশির রায়, কল্যাণী ঠাকুর, ড. জীবনকুমার সরকার, ড. পুষ্প বৈরাগ্য, রাধী মণ্ডল, ড. তপন বাগচী (বাংলাদেশ), ড. স্বরোচিষ সরকার, সুবোধ বিশ্বাস, সমরেন্দ্রনাথ বৈদ্য প্রমুখ। এইসকল প্রাবন্ধিকদের কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলে পাঠকের কাছে সঠিক দৃষ্টিতে তুলে ধরা হবে বলে মনে করলাম—

| প্রাবন্ধিক                | গ্রন্থ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | প্রকাশকাল                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ১। মনোহরমৌলি বিশ্বাস      | ক. যুক্তিবাদী ভারতবর্ষ<br>একটি ঐতিহ্যের সন্ধান<br>খ. ভিন্ন চোখে প্রবন্ধ মাল্য<br>গ. দলিত সাহিত্যের রূপরেখা<br>ঘ. প্রবন্ধে প্রাক্তজন অথবা<br>অস্পৃশ্যের ডায়েরি<br>ঙ. শতবর্ষের বাংলা দলিত সাহিত্য<br>(সংকলন)<br>ক. মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ<br>(১ম-৭ম খণ্ড)<br>খ. মরিচকীপি নৈশকের অন্তরালে | ১৯৯৮ খ্রিঃ<br>২০০৩ খ্রিঃ<br>১৯৯২ খ্রিঃ<br>২০১০ খ্রিঃ<br>২০১১ খ্রিঃ |
| ২। জগদীশচন্দ্র            | ক. প্রসঙ্গ বাংলাদেশ সংখ্যালঘু<br>হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান হত্যার<br>ঐতিহাসিক দলিল<br>খ. মরিচকীপির গণহত্যা ও<br>জোড়ি বসু : একটি মনস্তাত্ত্বিক<br>পর্যালোচনা                                                                                                                                | ২০০৭ খ্রিঃ                                                         |
| ৩। ডাঃ জগদীশচন্দ্র হালদার | ক. গীতা রহস্য<br>খ. হরি-ওকডা<br>গ. সেকালের ভারতবর্ষ ও<br>আর্য আক্রমণ                                                                                                                                                                                                                   | ২০০৮ খ্রিঃ<br>২০০২ খ্রিঃ<br>১৯৯৬ খ্রিঃ                             |
| ৪। স্বপ্ন কুমার বিশ্বাস   | ক. মতুরাধর্ম এক ধর্ম বিপ্লব<br>খ. প্রসঙ্গ: দলিত মুক্তি আন্দোলন (১ম)<br>গ. প্রসঙ্গ: দলিত মুক্তি আন্দোলন (২য়)<br>ঘ. প্রসঙ্গ: দলিত মুক্তি আন্দোলন (৩য়)<br>ঙ. প্রসঙ্গ: পতিত মুক্তি আন্দোলন<br>মতুরাসের মহাসংগ্রাম                                                                        | ২০০৮ খ্রিঃ<br>১৯৯৭ খ্রিঃ<br>২০০৭ খ্রিঃ<br>২০০৭ খ্রিঃ<br>২০০৮ খ্রিঃ |
| ৫। সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস    | ক. মতুরা আন্দোলন ও দলিত জাগরণ<br>খ. শ্রীমৎ দায়িক পাগলের জীবন কথা                                                                                                                                                                                                                      | ২০০৪ খ্রিঃ<br>২০০৪ খ্রিঃ                                           |
| ৬। ড. নন্দদুলাল মোহান্ত   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| ৭। সন্তোষকুমার বারুই      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |

| প্রাবন্ধিক             | গ্রন্থ                                                                                              | প্রকাশকাল  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                        | খ. কবি মহানন্দের সাহিত্যের মূল্যায়ন                                                                | ২০১০ খ্রিঃ |
|                        | গ. ঠাকুর শ্রীশ্রী হরিচাঁদ মানব পুরস্কার :<br>অধ্যায় পুরুষ (সম্পাদনা)                               | ২০১১ খ্রিঃ |
| ৮। মীরা হালদার         | ক. শ্রীশ্রী হরিলীলা কথামৃত                                                                          | ২০১৩ খ্রিঃ |
| ৯। কপিলকৃষ্ণ বিশ্বাস   | ক. শ্রীধাম গুড়াকান্দি ঠাকুরনগর<br>ও মতুয়াসের নানা প্রসঙ্গ                                         | ২০১০ খ্রিঃ |
| ১০। সুনীলকুমার রায়    | ক. বঙ্গজন সভ্যতা নমোজাতির<br>আত্মপরিচয়                                                             | ২০১০ খ্রিঃ |
|                        | খ. 'নিম্নবর্গের' ফলিত ইতিহাসে<br>বাংলার 'নমশূদ্রার'                                                 | ২০১৫ খ্রিঃ |
| ১১। নকুল মন্টিক        | ক. ভাবনা চিন্তা                                                                                     | ১৯৯৩ খ্রিঃ |
|                        | খ. মুক্ত চিন্তা                                                                                     | ২০০৭ খ্রিঃ |
| ১২। দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস | ক. বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বরূপ                                                                 | ২০০৮ খ্রিঃ |
|                        | খ. এই সময় এই সমাজ                                                                                  | ২০১১ খ্রিঃ |
|                        | গ. শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত প্রসঙ্গ হরিচাঁদ<br>ঠাকুরের নিষেধাজ্ঞা                                        | ২০১৪ খ্রিঃ |
|                        | ঘ. প্রথাগত ধর্ম :<br>প্রসঙ্গ মানুষের মানবসত্তা                                                      | ২০১৫ খ্রিঃ |
| ১৩। অসিতবরণ ঠাকুর      | ক. উদ্বাস্ত মুক্তি ও মুক্ত সমাজ<br>খ. সর্বস্বরার নেতৃত্বে বাঙালি উদ্বাস্ত<br>এবং মুক্তির সমাজ দর্শন |            |
| ১৪। মণিমোহন বৈরাগী     | ক. হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম                                                                  |            |
| ১৫। অমলকুমার মণ্ডল     | ক. আমাদের কবি বিনয় মজুমদার<br>খ. বিনয় মজুমদার: অনুধ্যানে অনুভবে                                   |            |
| ১৬। যতীন বাল্য         | ক. দলিত সাহিত্য আন্দোলন                                                                             | ২০০২ খ্রিঃ |
|                        | খ. বঙ্গবাদী মতুয়া আন্দোলন                                                                          | ২০০২ খ্রিঃ |
|                        | গ. ইতিহাসের আলোকে<br>শ্রী হরি-গুরুচাঁদ ও মতুয়া আন্দোলন                                             | ২০১৩ খ্রিঃ |
| ১৭। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর    | ক. শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম                                                                  |            |

| প্রাবন্ধিক<br>(সাহিত্যিক)                 | গ্রন্থ<br>আন্দোলন (সম্পাদিত)                                                         | প্রকাশকাল<br>২০১২ খ্রিঃ |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ১৮। ড. প্রহ্লাদ রায় ও<br>জীবনকুমার সরকার | ক. বাংলার শিক্ষাবিদ ও সমাজ<br>সংস্কারক শ্রীশ্রী হরগুরুচাঁদ ঠাকুর<br>(যুগ্ম সম্পাদনা) | ২০১০ খ্রিঃ              |
| ১৯। জীবনকুমার সরকার                       | ক. মতুয়া দর্শনে নারী : মানবিকতার<br>উন্নত দিশা                                      | ২০১২ খ্রিঃ              |
| ২০। কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল                 | ক. মতুয়া ধর্ম প্রসঙ্গে (সম্পাদিত)                                                   | ২০১০ খ্রিঃ              |
| ২১। অরুণকান্তি মহাপাত্র                   | ক. মতুয়া মতাদর্শ: সামাজিক দিকের<br>কয়েকটি কথা আজকের প্রাসঙ্গিকতায়                 | ২০১২ খ্রিঃ              |
| ২২। ড. বিরাট বৈরাগ্য                      | ক. মতুয়া সাহিত্য পরিগ্রন্থ                                                          | ১৯৯৯ খ্রিঃ              |
| ২৩। সমুদ্র বিশ্বাস                        | ক. ইতিহাসের আলোয়<br>মতুয়া আন্দোলন                                                  | ২০১০ খ্রিঃ              |
|                                           | খ. গ্রাম বাংলা জাগরণে<br>মতুয়া আন্দোলন                                              | ২০১১ খ্রিঃ              |
|                                           | গ. মতুয়া আন্দোলনের গোড়ার কথা                                                       | ২০১২ খ্রিঃ              |
|                                           | ঘ. বাংলার উৎপাদক ও শ্রমজীবী সমাজ                                                     | ২০১৫ খ্রিঃ              |
| ২৪। মনোরঞ্জন ব্যাপারী                     | ক. ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন<br>খ. বাতাসে বারুনের গন্ধ<br>গ. অমানুষিক                    |                         |

পত্র-পত্রিকা ইতিহাসও কম দীর্ঘ নয়। বাংলা সাহিত্যে মতুয়া দর্শন কেন্দ্রিক পত্রিকার অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রাজর্ষি গুরুচাঁদ ঠাকুরের সময় থেকেই এই ধারার যাত্রা শুরু। শিক্ষা আন্দোলন, ধর্ম আন্দোলন, সমাজ আন্দোলন প্রভৃতি অনন্য সাধারণ কাজের পাশাপাশি হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ পার্বদরা সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁদের আগ্রহে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে এক নজিরবিহীন ঘটনা এবং সাংস্কৃতিক ভূমণ্ডলে উৎসারিত প্রদীপ্ত সূর্যের মতো আলো। কেমনা সমকালীন জীবনের প্রান্তিক ও হীন নিম্নবর্ণীয় জীবনচেতনা যেভাবে এই সকল পত্র-পত্রিকায় উঠে এসেছে, তা এক বিরল ঘটনা। তথাকথিত নাগরিক সংস্কৃতির বৌদ্ধিকবর্গের সকল সাহিত্য নির্মাতারা এবং পাঠকেরা এর হৃদিশ জানেন না। জানবারও আগ্রহ নেই। এ ইতিহাসের এক নির্মম বাস্তব-কৌতুক। মজ্জমুনির মতো বিশ্বাস! পৃথিবীর সমান উপেক্ষা। রাষ্ট্রনুকূল্য নেই, সমাদর

নেই। তবু মতুরা সংস্কৃতি, পত্র-পত্রিকা বাংলা সাহিত্য-জগতকে সম্ভাব্যের স্বাক্ষর মতো মাতৃকাল ভরিয়ে দিচ্ছে। সমালোচকদের লেখার জ্ঞান যাচ্ছে, মতুরা ভাবধারায় উদ্ভূত সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা নাকি দুই শতাধিক। এত বিপুল সংখ্যক পত্রিকার সবগুলো নাম আমার এই মুহুর্তে জ্ঞান নেই। তবে বাংলাদেশ-ভারত মিলিয়ে এতগুলো হওয়া অসম্ভাব্যিক নয়। এক্ষর কিছু সাময়িক পত্রিকার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা যাক—

| পত্রিকার নাম                                                        | সম্পাদক              | প্রকাশকাল         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| ১। নমঃশূর সুহৃদ<br>(পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং গুরুচাঁদ ঠাকুর) | সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর   | ?                 |
| ২। মতুরা সুহৃদ                                                      | অংশুপতি ঠাকুর        | ?                 |
| ৩। অনন্ত বিজয়                                                      | বিষ্ণুপদ বাগচী       | ?                 |
| ৪। মতুরা মহাসংঘ পত্রিকা                                             | স্বপ্নকুমার বিশ্বাস  | চতুর্মাসিক        |
| ৫। হরিসেবক                                                          | দেবেন্দ্রলাল বিশ্বাস | ?                 |
| ৬। মতুরা                                                            | অক্ষরকুমার মৌলিক     | ?                 |
| ৭। মতুরা দর্পণ                                                      | রঞ্জন রায়           | ?                 |
| ৮। মতুরা দর্পণ                                                      | সন্তোষকুমার বাকুই    | ?                 |
| ৯। হরিচাঁদ সেবাসংঘ পত্রিকা                                          | নিজিহাঁদ মণ্ডল       | ত্রৈমাসিক         |
| ১০। সেবা                                                            | গৌরগোপাল কাকভূষণ     | ?                 |
| ১১। সাপ্তাহিক জনমন                                                  | প্রমিলা বিশ্বাস      | ১৯৮৬<br>সাপ্তাহিক |
| ১২। জয়ডঙ্কা                                                        | ?                    | ?                 |
| ১৩। জাগরণ                                                           | ?                    | ?                 |
| ১৪। বিপ্লব বার্তা                                                   | ?                    | ?                 |
| ১৫। মতুরা বাঙ্কর                                                    | ?                    | ?                 |
| ১৬। গণমুক্তি (বাংলাদেশ)                                             | উৎপল বিশ্বাস         | ত্রৈমাসিক         |
| ১৭। নিখিল ভারত                                                      | কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর      | ত্রিমাসিক         |
| ১৮। মুক্তকণ্ঠ                                                       | ?                    | ?                 |
| ১৯। দলিত মুক্তি                                                     | ?                    | ?                 |
| ২০। নির্ভীক কণ্ঠ                                                    | রনজিত সিকদার         | সাপ্তাহিক         |
| ২১। চেতনা লহর                                                       | অনন্ত আচার্য         | ত্রৈমাসিক         |
| ২২। জনমন                                                            | সমুদ্র বিশ্বাস       | ত্রৈমাসিক         |
| ২৩। দলিত কণ্ঠ                                                       | নকুল মল্লিক          | ত্রৈমাসিক         |
| ২৪। চতুর্থ দুনিয়া                                                  | অমর বিশ্বাস          | ?                 |

| পত্রিকার নাম                 | সম্পাদক              | প্রকাশকাল |
|------------------------------|----------------------|-----------|
| ২৫। পথ সংকেত                 | ড. অসীম খালা         | মাসিক     |
| ২৬। অধিকার                   | গৌরঙ্গ সরকার         | মাসিক     |
| ২৭। একতান সংবাদ              | নীতীশ বিশ্বাস        | মাসিক     |
| ২৮। নীড়                     | কল্যাণী ঠাকুর        | ত্রৈমাসিক |
| ২৯। শব্দভাষ্য                | জীবনকুমার সরকার      | ত্রৈমাসিক |
| ৩০। শ্রীহরি যুগদিশা          | কেশবরঞ্জন সরকার      | ত্রৈমাসিক |
| ৩১। নীল আকাশ                 | সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস  | মাসিক     |
| ৩২। শূদ্র সমাচার             | মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য  | মাসিক     |
| ৩৩। Dalit Mirror             | মনোহরমৌলি বিশ্বাস    | ত্রিমাসিক |
| ৩৪। শ্রী হরিনন্দন (বাংলাদেশ) | প্রভাসচন্দ্র বিশ্বাস | ত্রৈমাসিক |

এইভাবে মতুরা আন্দোলনের প্রভাবে বিকশিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে বহুমুখী ধারা। বাংলার সবচেয়ে যে ধারাটি প্রবল শক্তিশালী এবং বিচিত্রধারার তা হলো লোকসাহিত্য। এই লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে হরি-গুরুচাঁদ প্রবর্তিত মতুরা আন্দোলন। যেমন— বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতিতে কবিগানের উদ্গাতা এবং ধারক-বাহক তো এরই (বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ জনগোষ্ঠী নমঃশূর)। আজও কবিগানের নানা গতিপথের মধ্যেও কবিগানকে তারাই সজীব ও সতেজতায় সর্বাধিকভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। এবং বাঁচিয়ে রেখেছে চিরায়ত বাংলার লৌকিক ধারার সকল ঐতিহ্যকে। লোককবি বিজয় সরকারের নাম কে না জানেন? বিশ্বকল্যাপী তাঁর প্রতাপ। সমগ্র বাংলা আজও তাঁর সুমধুর কণ্ঠে ভেসে যায়। আজকের বিশ্বসাহিত্যে লোকসংস্কৃতিকে, লৌক-ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার যে আশ্রয় চেষ্টা, তাতে একদিকে যেমন আশার আলো দেখতে পাই অন্যদিকে তেমনি অন্ধকার কিছু কম নয়। কেননা এ এক বিচিত্র সময়। বিশ্বায়নের মোহে সভ্য আর সভ্যতাকে গুলিয়ে ফেলছি সর্বত্র আমরা। আধিপত্যবাদীবর্ণের মানুষ আমাদের দলিত মানুষের, বহুজন মানবের শিল্প-সাহিত্যকে তাঁদের প্রচার মাধ্যম দিয়ে বন্দি করে ফেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাহিত্যের পাঠক্রমে নিম্নবর্ণীয় সাহিত্যচর্চার ও আলোচনার একটি বড়ো ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। বিশ্বটি তাত্ত্বিকদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেলেও সাধারণ বাঙালি পাঠক-গবেষকদের কাছে অধরই আছে। এই সাবলটার্ন স্টাডিজকেই দলিত বুদ্ধিবীরা 'দলিত সাহিত্য' অভিধায় ভূষিত করতে চাইছেন ভারতীয় সমাজজীবনের নিরিখে।

## শ্রদ্ধা বনাম শ্রাদ্ধ

অনন্ত আচার্য

উত্তম সরকার, বয়স ৪০, শিয়ালদহ ক্যানিং রেলপথে ঘুটিগাড়ি শরীফ স্টেশন থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে এক গ্রামের বাসিন্দা। সম্প্রতি তাঁর মাতৃ বিয়োগ হয়েছে। তিনি কোনো ধরনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেননি, বামুন পুরোহিত ডেকে ধর্মানুষ্ঠান, মাথা ন্যাড়া হওয়া। 'হবিসিস' বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান খাওয়া, বিশেষ ধরনের পোষাক পরা ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে দূরে থেকেছেন। [এই রচনায় এর পরে সংক্ষেপে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলা হবে, বাকি আচরণগুলি বুঝে নিতে হবে] উত্তম নিজেকে খাঁটি মতুরা বলতে দ্বিধা করেন না। হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ, আশ্বেদকরকে শিক্ষক হিসেবেই মানেন। মতুরা কবিগানের জগতে উত্তম একটি সুপরিচিত নাম। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে কেন তিনি প্রচলিত পদ্ধতির বিপক্ষে গেলেন? স্বভাব কবি উত্তম জানালেন :—

বোধবুদ্ধির দরজাতে তুমি যখনই দিলে তালা  
জেনে নাও হে এখন তোমার ঘরে পুরুত আসার পালা  
সারা জীবন যদি কর সন্তান-এর কর্তব্য পালন  
জেনে নাও হে তাই হবে আসল ধর্মাচরণ

আশ্বেদকরবাদী আন্দোলনের সুপরিচিত সংগঠক চিকিৎসক গুবধর বর্মণ-এর মৃত্যুর পর পুত্র শুভব্রত (লালু) প্রচলিত পদ্ধতি এড়িয়ে যান। বাগজোলা খালপাড়ের কলোনীর (দমদম) বাসিন্দা বিজয় হাজরা, গোপাল বর্মণ, কালিকাপুরের বিশ্বনাথ নন্দর স্বজন বিয়োগে কোনও ধরনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেননি। 'স্বরণসভার' দ্বিধাহীন কণ্ঠে তাঁরা জানান দেন যে পুরোহিতরা প্রতারক ছাড়া কিছুই না। মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে এরা রোজগার করে।

গৌতম, নবেন্দু, প্রদ্যুৎ প্রতিবাগানের বিজ্ঞান চেতনার সংগঠক। পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনে এদের ভূমিকা অনকণ্য। গৌতম, নবেন্দু, প্রদ্যুৎ তাঁদের বাবা-মা-এর মৃত্যুর পর কোন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেননি। প্রত্যেক বৎসরের বিজ্ঞান মেলায় মাধ্যমে ওরা যে ধরনের কুসংস্কার মুক্তির প্রচার চালান তাতে ওঁদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করারই স্বাভাবিক। ওদের প্রত্যেক দিনের জীবনচর্যা এরকমই যে ওদের আত্মীয়-

অনন্ত আচার্য

স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি ওদের এধরনের কাজে বিম্মিত হননি, প্রশংসা তোলেননি। ওদের শুভাকাঙ্ক্ষী রামবাবু কথা প্রসঙ্গে জানালেন, "ভুল করে একবার বলেছিলাম যে সমাজটা তেমন এগোয়নি, একটু সমঝোতা করলে হয় না? ওরা এমন সব যুক্তি তুলল যে আমি পালাবার পথ পাইনি। সংস্কৃত মন্ত্রের এমন বাংলা মানে করে দিল যেন এই কদিন আগে নবদ্বীপের টোল থেকে পড়ে এসেছে। ওই সব মন্ত্রে এতসব বাজে কথা আছে তাতো জানতামই না। কম বয়স্কদের কাছে তর্কে হারার লজ্জা বড় গুরুদার হয়।"

অমল রায়—একংক নাটক চর্চার দুনিয়ায় নাট্যকার হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তার রচিত নাটক মফস্বল-এর নাটকের দলকে প্রতিবাদী বিকল্প সংস্কৃতি চর্চায় সাহায্য করেছে। আমরা বরং অমল রায় তথা তপন দাশ-এর ব্যক্তিগত জীবনে একটু ছবিটা দিই। কলেজের প্রথম পর্যায়ে কিছুদিন হাংরি সাহিত্য চর্চার পর নকশালবাদী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন (তথ্যসূত্র : দিগন্ত বলয়, রচনা সুধাংশু সেনগুপ্ত, বর্ষ ৩১, সাল ২০০৩, পৃ-৮) দু-তিন বছর। তারপর কবি তুষার রায়-এর ভাষায় :—

"শান্তির মিছিলেতে ছিলে পুরোভাগে  
ধর পাকড়ের দিনে কেটেছে সব থেকে আগে"

এরপরে ফরোয়ার্ড ব্লক-এর সাথে যুক্ত হন (তথ্যসূত্র : দিগন্তবলয়, বর্ষ - ৩১, ২০০৩, পৃ-১১, রচনা—অপরাজিতা গোস্বামী)। "সুখী দুই গৃহস্থান বাজে গ্রামাফোন" জীবন যাপন করার সাথে সাথে শুরু করেন নাট্যকার জীবন। ৭৮ সালে মাতৃ বিয়োগ-এর পর সম্পূর্ণ ধর্মীয় নিয়মকানুন মেনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। ৮-এর দশকের শেষে পিতৃ বিয়োগের পর একই ধরনের অনুষ্ঠান পালন করেন। বিশ্বায়কের ঘটনা ঘটল এই শতাব্দীর প্রথম পর্বে। তার দুই ভাইপো যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁরা পিতৃবিয়োগে (তপন দাশ-এর দাদার মৃত্যুতে) স্বরণসভা ছাড়া আর কিছুই করবেন না, তপন দাশ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সব দায়িত্ব নিজেই পালন করলেন। 'অশৌচ' পালন, অর্ঘ্য পোষাক, পুরোহিতকে আহ্বান ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তপন দাশ-এর এক ভাইপো তাপস বস্তুবাদী দর্শনের অধ্যাপক প্রাবন্ধিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর কন্যা তাপসীর জীবনসঙ্গী। তাপসরা যখন স্বরণসভার আয়োজন করেছিলেন তখন তার কাকা 'বিপ্লবী' নাট্যকার অমল রায় পুরোহিততন্ত্রের বেড়াভাল কাটাতে পারলেন না।

দেবেশ রায় (প্রখ্যাত সাহিত্যিক) কৈশোর থেকে কমিউনিস্ট দলের সদস্য। মাতৃ বিয়োগের পর পরিচিত জনকে হতবাক করে 'ধরা চুড়া' পরলেন। বিখ্যাত প্রতিবেশী অনুরাগী যুবকের প্রশ্নে দেবেশবাবু আত্মপক্ষ সমর্থনের লজ্জাহীন প্রচেষ্টা—'আমার ঘরে যে গোয়ালিনী দুধ দিতে আসে, সে সহস্রাব্দ ঘরের কাজ করে তাদের মনে আখাত দেওয়ার অধিকার আমার নেই'।

রামপদ মণ্ডল, বয়স ৪৫ বছর, গোসাবা ২নং ব্লকের বাসিন্দা। কলেজজীবন থেকে একটি বামপন্থী দলের কর্মী সদস্য। বর্তমানে একটি স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পিতৃ বিয়োগে শ্রদ্ধা না করার গ্রামের প্রতিবেশীদের আত্মীয়-স্বজনের তরফ থেকে কোনো অসুবিধা ভোগ করেননি। কিন্তু নিজ কর্মস্থল স্কুল থেকে 'সাসপেন্ডেড' হলেন। বিখ্যাত রামপদ বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক এবং তাঁর নিজের দলের বিধায়ক-এর সাথে দেখা করে বিষয় এবং অভিযোগ জানান। বিধায়ক নেতার সরাসরি উত্তর—জনমত তোমার এই কাজের পক্ষে নেই। আমাদের তো মানুষজনকে নিয়ে কাজ কারবার। আর তা ছাড়া শুনলাম যে ক্যানিং বইমেলা থেকে তুমি রাহুল একজন ছরনামধারী নকশালের (রাহুল সংস্কৃতায়ন-লেখক) লেখা জ্ঞানিনের জীবনী কিনে এনে লোকজনকে পড়াচ্ছ। এরপর আমাদের দল তোমার পাশে থাকতে পারে না"। এরপর সুন্দরবন সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিজ্ঞান সংগঠনগুলির সহযোগিতা এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের একাংশের উদ্যোগে শিক্ষা দপ্তর এবং আদালতে দৌড়কাপ করে রামপদ 'সাসপেনশন' থেকে রেহাই পেল। স্থানীয় জনমত তাঁর বিপক্ষে গিয়েছিল এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। রামপদ এখন দলদাসত্ব থেকে মুক্ত।

নিতাই আনক, বয়স ৫৫, আমতলার (বিশুপুুর থানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) বাসিন্দা। ২০০৫ সালে তাঁর মাতৃ বিয়োগ হয়। একটি বামপন্থী দলের সদস্য এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত উপপ্রধান ছিলেন। কর্মসূত্রে একটি বৃহৎ জুতা প্রস্তুতকারক সংস্থার সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে সেখানকার কর্মী সংগঠনের মাধ্যমে ত্তরে নেতাও ছিলেন। মাতৃ বিয়োগে ধর্মীয় নির্দেশ না মানার কারণে তাঁর এক জ্যাঠামশাই, এলাকার জনৈক দলনেতা এবং তাঁর কর্মস্থলের ইউনিয়ন নেতাদের বিরোধভাজন হন। এরপর যা ঘটে তা হল পরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি দলের 'টিকিট' পান না এবং কর্মচারী ইউনিয়ন-এর পদটিও খোয়া যায়। নিতাইবাবুর অবশ্য এ কারণে কোন অনুতাপ হয়নি।

গৌতম, নবেশু, প্রদ্যুতরা বস্তুবাদী দর্শনচর্চা, পড়াশুনা এবং তা প্রতিমুহুর্তে প্রয়োগে বিশ্বাসী। নিকটজন বিয়োগে শোক পালনের এনারা প্রচারণা চান না। স্ব-অভিভাবক হওয়ার কারণে গোসাবার রামপদ বা আমতলার নিতাই-এর মতো এঁদের হারাবার কিছুই নেই। এদের জেতার জন্য আছে বিশ্বাস পালনের তৃপ্তি। রামপদ, নিতাই যা হারিয়েছিল তাতে তাঁরা নিঃস্থ হন।

ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক অনুশাসনের ধর্মগ্রন্থ ভিত্তিক বিষয়ে আলোচনার আগে উৎপল দত্ত রচিত, পরিচালিত দিন কালের পালা নাটকের সভ্য বন্দোপাধ্যায় অভিনীত চরিত্রটির একটি সংলাপ জানাই : কাল সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফেরার পথে গলি থেকে দুটো গুন্ডা আমার পেটে ছুরি ঠেকিয়ে কল, "খড়ি, আংটি, মানিবাগ দিয়ে দে নইলে জানে মেরে ফেলব। আমি তখন কললাম, জানে মারার পর কি আর তোমরা ঘড়ি, আংটি, মানিবাগ আমার কাছে রেখে যাবে?"

ভয় দেখিয়ে অর্থ সম্পদ লুট আইনগত অপরাধ। অথচ এই ধরনের বেআইনি কাজ ধর্মচরণের নামে চলছে কয়েক শতাব্দী জুড়ে। পুরোহিত দর্পণ-এ (পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত সতনারায়ণ লাইব্রেরি দ্বারা প্রকাশিত) সংকলন জনাঙ্কন (পৃ : ৪) যে বঙ্গীয়াদ ১২৯৮-এ (১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ) পুরোহিত দর্পণের প্রথম প্রচার। গবেষক মহল সুরেন্দ্রমোহন-এর সাল নির্ধারণের বিষয়ে দ্বিধা দ্বিত্ব থাকলেও এ বিষয়ে কোনও বিমত নেই যে ১৩১১ বঙ্গীয়াদ ১৩ আশ্বিন অনন্তপুর হইতে সংকলিত উক্ত পুরোহিত দর্পণ বঙ্গ সমাজে সারের গৃহীত। পুরোহিত দর্পণ-এর পৃষ্ঠা ৫৬৫ - পৃষ্ঠা ৭৭০ পর্যন্ত প্রতিটি বাক্যে 'অর্থ সম্পদ লুট'-এর নির্দেশ। দান সাগর বিধি : (পৃ ৭৬৮ - পৃ: ৭৭০) (১) দক্ষিণা, (২) আসন, (৩) জল, (৪) বস্ত্র, (৫) দীপ, (৬) অন্ন, (৭) তাম্বুল, (৮) ছত্র, (৯) গন্ধ, (১০) মালা, (১১) ফল, (১২), শয্যা, (১৩) পাদুকা, (১৪) গো, (১৫) কাঞ্চন ও (১৬) রক্ত।

উপরোক্ত দান সামগ্রীর মধ্যে কয়েকটি বাদে বাকিগুলির মুদ্রামূল্য নেহাত কম নয়। একজন ভালো দাবা খেলোয়াড় যেমন বুদ্ধিবৃত্ত 'চাল' দিয়ে তার ঘুটিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে তেমনি পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ মারফত দানসামগ্রী হস্তান্তরের পর মৃতজনকে প্রেতলোক থেকে দেবলোকে স্থানান্তরিত করেন।

জনলোক (পৃথিবী) থেকে তপলোক (দেবলোক)-এর দূরত্ব আট কোটি যোজন মাইল। মাঝপথে পড়ে বৈতরনী মহানদী। (সূত্র : গরুড় পুরাণ, উঃ খণ্ড, ৭৪ অধ্যায়)

সমস্ত ধরনের দান-এর মুদ্রামূল্য হিসাব করলে এই দীর্ঘ যাত্রা খরচ বেশ কম। [মঙ্গল গ্রহ অভিযান-এর অর্থ লক্ষিকারকণ এ বিষয়ে পুরোহিতদের পরামর্শ নিতে পারে]। "বৃষোৎসর্গ না করে গয়ায় পিণ্ড দিলেও কোনও ফল লাভ হয় না। তাতে প্রেতের কোনও উপকার হয় না। (গরুড় পুরাণ : উত্তর খণ্ড : ৭ অধ্যায়)। পুরোহিত দর্পণের ৪র্থ খণ্ডের ৫৬৪ পৃষ্ঠা থেকে ৭৭০ পৃষ্ঠায় মৃতকে ২৬৪ বার প্রেত আখ্যা নিয়ে তাঁর প্রেতত্বমুক্তির জন্য দানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণ : 'যার দেওয়া অন্ন দশজন ব্রাহ্মণ আনন্দে গ্রহণ করেন সে কখনও মনুষ্যত্বের ঘোণীতে জন্মগ্রহণ করে না। কোনও অধার্মিক যদি ১০ হাজার ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে তবে সে যতই অপরাধ করুক না কেন, তা থেকে মুক্তি পাবে' (ব্রহ্ম পুরাণ - ২১৮ অধ্যায়)

এইসব পুরোহিতকুলের আদ্য কি দেশের সার্বিক আর্থিক কেন্দ্রদের সাপে কোনওভাবে যুক্ত আছে? প্রত্যক্ষভাবে আছে তা বলা যাবে না। বড় রাস্তার কনস্টেবল-এর মামলার ভয় দেখিয়ে ট্রাক থেকে হাত বাড়িয়ে খুস নেওয়ার যেমন পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থদের দুর্নীতির পরিমাণ নজরে পড়ার মতো উদাহরণ বা স্থানীয় বিধায়কের 'ফুলে ফেঁপে ওঠা' যেমন বুঝিয়ে দেয় ধরা জেওয়ার বাইরে থাকা বিধায়কের দলের শীর্ষ নেতাদের ন্যায্য আয় বহির্ভূত। রোজগারের আনুমানিক হিসাব তেমনই পুরোহিততন্ত্র ভারতের মতো একটি প্রাক পুজিবাদী দেশের রাষ্ট্র কাঠামোর প্রাণ ভোমরা বা Blood Cell হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

পূর্বে আলোচিত তথ্যগুলি আগায়ের কয়েক ধরনের মানুষদের প্রতিনিধি স্থানীয়দের সাথে পরিচয় করিয়েছিল। (১) উভয়, শুভংকর, বিজ্ঞান, গোপাল, বিশ্বনাথ-এর মতো লোকজন অপ্রাক্ষণ আন্দোলনের ফসল। যা দক্ষিণ ভারতে পেরিয়ারের নেতৃত্বে সূচনা হয়েছিল। এরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরোধিতা পুরোহিত তন্ত্রকে অবজ্ঞা করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তাঁদের বিদ্যাব ভ্রমণ রচিত শ্রাব্য নয় শ্রদ্ধা (প্রকাশক-ইপকে), দিলীপ গায়ের রচিত মরণোত্তর শ্রদ্ধাঙ্গণন (প্রকাশক জনম) দু'টি বই যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছে। শেখের তর্কবাণীষদের সাথে এনারা কথাবার্তা চালালে হয়তো "বিতর্ক প্রতিযোগিতা"-র জিততে পারেন না কিন্তু ইংলোক পরলোক, স্বর্গ-নরক, ইহজন্ম-পরজন্ম সম্পর্কে সার কথা এনারা দলিত আন্দোলন থেকেই শিখে নিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের চোঁকর এদের বাস্তববাদী

পরিচয় :

ধর্মপট-আবেশনকর-৪

নরী-পেরিয়ার-৪৯

ভিরোজিরের পড়াশোনা-রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-৬৪

রবীন্দ্রনাথকে হাইজাক করতে চাইছে বর্ণাল সংখ্য-আশীষ লাহিড়ী-৭২

পশ্চিমবঙ্গের দলিত সমস্যা সমাধান কোন পথে?-মনোরঞ্জন ব্যাপারী-৮৩

কেবল 'কাদে' নয়

প্রাচীন ভারতে কান্তবেই সব ছিল নরেন্দ্র মেদীর বিজ্ঞান চর্চা-গুরুপ্রসাদ কর-১০১

মোদি সরকারের 'আচ্ছা সিন' কৃষ্ণ মালিন্যদের জন্য পৌষমাস, কিন্তু জনগণের জন্য সর্বনাশ-পলাশ রায়-১০৮

আমেরিকায় বিবেকানন্দ : একটি ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা-কবিতা চৌধুরী-১১৬

'নিম্ববর্ণের' ফলিত ইতিহাসে বাংলার 'নমঃশূন্যের' প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ-সুনীল কুমার রায়-১৫৮

বেনেদীস ও বাংলার মুসলমান সমাজ-শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়-১৭০

পরিচয়ের সংকট পরিচয়ের রাজনীতি-অর্কপ্রভ সান্যাল-১৯০

চুনী কেটাল যদি বেঁচে থাকতো-সোমনাথ ভট্টাচার্য-১৯৬

বাংলা ভাষার শত্রু-মিত্র-সমুদ্র বিশ্বাস-২০২

গল্প :

আদিবাসী রমণী ভূমি-প্রতিভা মণ্ডল-২৩৩

কালের মায় গৃহ-প্রবেশ-দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস-২৪৮

কবিতা :

হরিতরঙ্গিনী স্বরণে-উৎপল বিশ্বাস-২৫৩

শাসনে, পরিবর্তনে-সবুজচাঁচী গোস্বামী-২৫৪

লালবাজার-সবুজচাঁচী গোস্বামী-২৫৫

ভালবাসার ইতিহাস-সবুজচাঁচী গোস্বামী-২৫৬

অনুসংহিতার উল্লেখপূর্ব-সংক্রান্তি ভারতী-২৫৮

বনে বনে-চণ্ডালিনী-২৬১

নটিক :

দুর্গাদেবী-হর্ষবর্দ্ধন চৌধুরী-২৬৩

প্রবন্ধ :

সুন্দরবনের বিপন্ন শব্দ-শঙ্করকুমার প্রামাণিক-২৬৯

বাড়ির অন্ধন থেকে পথে-বাট শনিপুজার ভাষ্যপর্ব-বীরেন্দ্রনাথ বাক্স-২৮০

আগ্নিশতাবাদ ও সমাজতন্ত্র-মনোহর মৌলি বিশ্বাস-২৮৭

রাজকংশী সম্প্রদায়ের কাহিনী-সুশান্ত কুমার-২৯৪

গজলা সাহিত্যে মতুরা আন্দোলনের প্রভাব-জীকনকুমার সরকার-৩১২

শ্রদ্ধা কবিতা শ্রাব্য-অনন্ত আচার্য-৩৩০